অপলাপবাদ ও ভারত ইতিহাস

কোনরাড এলস্ট

Negationism in India

Concealing the record of Islam

Koenraad Elst.

অপলাপবাদ ও ভারত ইতিহাস

কোনরাড এলস্ট

অনুবাদ ও সম্পাদনা : রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়



অমৃত শরণ

প্রকাশক : আদিত্যরঞ্জন ঘটক
অমৃত শরণ প্রকাশন
বিদ্যাসাগর রোড, নবপল্লী
পিন - ৭৪৩২০৩
প্রথম প্রকাশ : গুরুপূর্ণিমা ১৪০৯

A Bengali translation of **Negationism in India,** Concealing the Record of Islam, by **Koenraad Elst,** First published in India in 1991

প্রাপ্তিস্থান: (১) দাসগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানী, ৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩
(২) বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩
(৩) দে বুক স্টোর, ১৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩
(৪) পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অক্ষর বিন্যাস : অনুবাদক

মুদ্রক : ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড,
গঙ্গানগর, উত্তর চব্বিশ পরগণা
ফোন ঃ ৫৩৮-৮৮৮০/৭০০৯

প্রচ্ছদ : প্রতাপলাল গাঙ্গুলী

মূল্য : তিরিশ টাকা
Rs. 30.00

ভূমিকা

সীতারাম গোয়েলের Hindu Temples : What Happened to Them, পুস্তকের দ্বিতীয় খন্ডের সমালোচনা করেছিলাম লুভেনের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়ো ও ইসলামী পঠন বিভাগের ওলন্দাজ ভাষার জর্ণাল Inforient এ। সমালোচনার শীর্ষনাম ছিল *অপলাপবাদের বিরুদ্ধে এক পৌত্তলিকের অবস্থান*। বর্তমান পুস্তকটি সেই সমালোচনারই বর্ধিত রূপ। আমার আগেকার *রাম জন্মভূমি বনাম বাবরী মসজিদ* এবং *অযোধ্যা ও তারপর* পুস্তকদ্বয়ের যা বিষযবস্তু, সেটারই বিকাশ। বিষয়বস্তু হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিহাস বিকৃতি। আরও বিশেষ করে বলতে গেলে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ইসলামী জেহাদের বীভৎস রূপ অস্বীকার।

অযোধ্যা বিতর্ক নিয়ে গবেষণা করার সময় দেখেছি, ইসলামকে চুনকাম করে ভারতের ইতিহাস পুনর্লিখনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ হচ্ছে অসুবিধাজনক তথ্য গোপন করা ও অস্বীকার করা। ইসলামের অপ্রীতিকর তথ্য গোপন করার প্রয়াসের সঙ্গে ইউরোপে নাৎসীদের গণহত্যার তথ্য গোপন করার পদ্ধতির সাদৃশ্য আমাকে অবাক করেছে। দুই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সমাজ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পার্থক্য থাকলেও উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি একই। ইউরোপে ইহুদী খান্ডব-দাহনের অপলাপবাদীরা সংখ্যায় অল্প, সেখানে ভদ্রলোকেরা তাদের এড়িয়ে চলেন। কিন্তু ভারতে জেহাদ-অপলাপবাদীরা নানা বিদ্বৎসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে; প্রচার মাধ্যমও তাদের হাতে।

আমি এই পুস্তক রাষ্ট্রসঙ্ঘের নতুন প্রেসিডেন্ট বুত্রোস ঘালিকে উৎসর্গ করতে চাই। একজন কপ্টি ক খ্রীষ্টান হিসাবে তিনি দেশের প্রশাসনে উচ্চপদ অধিকার করেছিলেন। নামেমাত্র ধর্মেতরবাদী একটি মুসলিম রাষ্ট্রে তাঁর এই উচ্চপদ প্রাপ্তি তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষদের উৎসাহিত করবে। মিশর ও ইস্রায়েলের মধ্যে ক্যাম্প ডেভিড শান্তি চুক্তিতে তাঁর ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই চুক্তির জন্য মিশরকে আরব লীগ থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং প্রেসিডেন্ট সাদাত নিহত হন মুসলিম মৌলবাদীদের দ্বারা। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি প্রমাণ করে একটি মুসলিম দেশ ঘৃণা ও ধ্বংসের নিখিল ইসলামবাদী ভ্রাতৃত্বের উপরে নিজের দেশের স্বার্থ ও পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে স্থান দিতে পারে। যুক্তিবাদ ইসলামকে পরাজিত করবেই।

কোনরাড এল্স্ট

লুভেন,
২৬শে নভেম্বর ১৯৯১

প্রথম অধ্যায়

অপলাপবাদ

অপলাপবাদ বা negationism শব্দটির অর্থ মানবিকতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধরাজিকে অস্বীকার।

এই অভিনব বৌদ্ধিক কৌশলকর্ম জানা তথ্যের নতুন ব্যাখ্যা নয়, জানা তথ্যসমূহকে অস্বীকার। হিটলারের নেতৃত্বাধীন নাৎসীদের দ্বারা ১৯৪১-৪৫ অব্দে সংঘটিত ব্যাপক অত্যাচার ও গণহত্যা অস্বীকার করার আন্দোলনকেই সর্বপ্রথম 'অপলাপবাদ' অভিধাতে অভিহিত করা হয়েছিল। ওই অত্যাচার ও গণহত্যা মহাভারতে বর্ণিত খান্ডব-দাহনের মত ব্যাপক ও সর্বাত্মক।

অপলাপবাদীরা নিজেদের 'সংশোধনবাদী' বলে প্রচার করেন। তাঁদের মতে তথ্য অস্বীকার করার কোনও ব্যাপার নেই। আজকে যেগুলি ইতিহাসের তথ্য বলে প্রচারিত, সেগুলি আসলে মনগড়া কাহিনী। ইতিহাসের সংশোধন হলেই এই সব কাহিনী অলীক বলে প্রমাণিত হবে। অনেক টীকাকারই অপলাপবাদের স্থলে সংশোধনবাদ বা সংশোধনবাদের পরিবর্তে অপলাপবাদ কথাটি ব্যবহার করেন। ফলে দুটি শব্দ এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সঠিক অর্থে সংশোধনবাদ ইতিহাসের যথাযথ কর্মধারা; ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর নতুন ব্যাখ্যা—যা বৈধ ও সঙ্গত। পক্ষান্তরে অপলাপবাদ নিতান্তই বৌদ্ধিক অপরাধ।

উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি দেশ যুদ্ধে জয়লাভ করে তখন তার সরকারী ঐতিহাসিকরা যুদ্ধের একটি ইতিহাস লেখেন। সেই ইতিহাস হয়তো সন-তারিখে সত্য; কিন্তু সমস্ত অঘটন ও বর্বরতার দায়-দায়িত্বটা চাপানো হয় পরাজিত প্রতিপক্ষের উপর। যথার্থ ঐতিহাসিকের দায়িত্ব হলো সমস্ত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে তার যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করা। এই ধরনের সংশোধন প্রায়ই বিতর্কমূলক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এতে কায়েমী স্বার্থের উপর আঘাত পড়ে। তবে সাধারণ ভাবে অনেক উত্তপ্ত বিতর্কের পর হয় সংশোধনবাদীদের মত একেবারে অগ্রাহ্য করা হয়, অথবা সরকারী ইতিহাসকেই কিঞ্চিত পরিবর্তন করা হয় সংশোধনবাদীদের সমালোচনার প্রভাবে।

যেহেতু 'সংশোধনবাদ' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক, আমরা ঐ শব্দটি ব্যবহার করবো না। আমরা একদিকে 'অপলাপবাদ' শব্দটি ব্যবহার করবো, অন্যদিকে ব্যবহার করবো 'ইতিহাসের নব-মূল্যায়ণ' শব্দ-যুগল। এতে যথার্থ মনোভাব প্রকাশ করা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ইতিহাসের যথার্থ পুনর্মূল্যায়ণ

অপলাপবাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার আগে লক্ষ্য করা যাক নাৎসীবাদ ও নাৎসী খান্ডব-দাহনের ইতিহাসের যথার্থ সংশোধনের ব্যাপারটি। তাতেই স্পষ্ট হবে অপলাপবাদের বৌদ্ধিক অপরাধত্ব। এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ হবে 'অপলাপবাদের' সঙ্গে 'ইতিহাসের নব-মূল্যায়ণের' পার্থক্যও। নাৎসীবাদের ইতিহাসটি অত্যন্ত জটিল! এই বিষয়ে কোনও বক্তব্যকেই আপ্তবাক্য বলে মেনে নেওয়া যায়না। কোনও ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নানা ঘটনা অস্বীকার করতে পারেন; কিন্তু নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকের কর্তব্য নির্লিপ্তভাবে সমস্ত ঘটনাবলী বিচার-বিশ্লেষণ করে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে আসা।

নাৎসীরা কতদূর ইচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ইহুদী গণহত্যায় মেতেছিল, বা নাৎসী খান্ডব-দাহন কত পরিমাণ পূর্বপরিকল্পিত, সেই নিয়ে পঞ্চাশের দশকের প্রথম থেকে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়ে গেছে। ইচ্ছাবাদ তত্ত্ব মতে ১৯২০ অব্দ থেকেই নাৎসী নেতৃবৃন্দ চিন্তা করেছিলেন সুযোগ পেলেই

গোটা ইহুদী জাতটিকেই দেশ থেকে উৎখাত করবেন। ক্রিয়াবাদ তত্ত্ব মতে আরম্ভটা সামান্য হলেও একের পর এক অপারেশন চলার সময় নিত্য নূতন কারিগরীর আশ্রয় নিতে থাকে নাৎসীরা। এইভাবে শেষ পর্যন্ত ইহুদী গণহত্যা ব্যাপক রূপ পেয়ে পরিণত হয় গ্যাস-চেম্বারের মধ্যে নৃশংস হত্যায়। গ্যাস চেম্বার আগে থাকতেই নাৎসীদের পরিকল্পনায় ছিলনা। এই তত্ত্বই আজকাল মেনে নেওয়া হয়, যদিও ইচ্ছাবাদীদের অবশিষ্টরা এর বিপরীতটাই দাবী করেন।

এই ধরনের ঘটনাবলীর আরম্ভ ইহুদী বিরোধী প্রচার থেকে। মাঝে আছে ১৯৩৫ অব্দে ইহুদীদের নাগরিকত্ব বাতিল, ১৯৩৮ অব্দে পেশাগত ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে ইহুদীদের বিচ্ছিন্ন করা, ইহুদীদের দেশান্তরী হতে প্ররোচনা দেওয়া, ইহুদীদের প্রতিষ্ঠানে নাৎসীদের সঙ্ঘবদ্ধ গুন্ডামী, রাজনৈতিক অপরাধীদের সঙ্গে ইহুদীদেরও শ্রমশিবিরে বন্দী করা, স্থানীয় গুন্ডাদের দ্বারা ইহুদীদের উপর অত্যাচার ও নববিজিত দেশসমূহে জার্মান ইহুদী ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের অভিবাসন (কারণ, জার্মান জনসাধারণ এই ধরনের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের দৃশ্য সহ্য করতে অপারগ)। এই সমস্ত বন্দীদের মাঝে মাঝেই হত্যা করা হতো, বা, অত্যাচারের পরিণামে এদের মৃত্যু ঘটতো।

ব্যাপক গণহত্যার অভিমুখে আর এক ধরনের ঘটনামালা হলো বংশজ রোগগ্রস্তদের ব্যাপক হারে বন্ধ্যাকরণ। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ অব্দের মধ্যে কৃপা-হত্যার দ্বারা ৭০০০ প্রতিবন্ধী ও উন্মাদদের হত্যা করা হয়। এই অপকর্মগুলি করা হয়েছিল 'জাতি বিশুদ্ধকরণের' উদ্দেশ্যে। জার্মান জনমত ও খ্রীষ্টীয় ধর্মমন্ডলীর চাপে শেষপর্যন্ত এই দুষ্কর্মগুলি বন্ধ করেছিল নাৎসীরা। কিন্তু এইসব ঘটনাবলী একদিকে নাৎসীদের মনে যেমন বৃহদায়তন হত্যাকান্ডের স্বাদ এনে দিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনই তাদের সংকেত দিয়েছিল যে যুদ্ধকালীন সমাজে এই ধরনের নিষ্ঠুর কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য যথেষ্ট গোপনীয়তা প্রয়োজন।

ইহুদী সমস্যার চুড়ান্ত সমাধান অর্থাৎ ইহুদী গণহত্যার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন হারমন গোয়েরিং, ১৯৪১ অব্দের ৩১ শে জুলাই। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল ১৯৪২ অব্দের ২০ শে ফেব্রুয়ারী ওয়ানসী সম্মেলনে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত বিশের দশকের বা ত্রিশের দশকের ফসল নয়। সন্দেহ নেই যে জার্মানরা নাৎসীদের ভোট দিয়েছিল ইহুদী বিরোধিতার জন্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সমগ্র জার্মান জাতি ইহুদী গণহত্যা চাইছিল। এইটাই ক্রিয়াবাদী ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণের ফলাফল। ইচ্ছাবাদী ঐতিহাসিকদের যা বক্তব্য--নাৎসীরা গোড়া থেকেই ইহুদী নিধনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল--তা নিছক জার্মান-বিদ্বেষ ছাড়া কিছুই নয়।

অন্য একটি প্রশ্নকে ঘিরে নাৎসীবাদ ও ইহুদী খান্ডব-দাহনের পুর্নমূল্যায়ণ আজকাল চলছে। প্রশ্নটি হলো এই গণহত্যার স্থান ইতিহাসে 'অভিনব' কিনা?

১৯৮৬ অব্দে আর্নেস্ট নোলকে প্রথম এই অভিনবত্বের প্রশ্ন তোলেন। তারপর থেকে ব্যাপারটি নিয়ে জার্মান ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক চলছে। এই অভিনবত্বের প্রশ্নের দুটি দিক আছে। প্রথমটি হলো নাৎসীদের অপরাধের সঙ্গে স্টালিনবাদের অপরাধের তুলনা করা--বামপন্থী বুদ্ধিজীবিরা এই ধরনের তুলনার বিরোধী। তাঁরা এই ধরনের ক্রিয়াকান্ডকে নাৎসীদের অপরাধকে হাল্কা ও তুচ্ছ করার একটি প্রচেষ্টা বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে নোলকে থেকে আরম্ভ করে অন্য মতের ঐতিহাসিকরা মনে করেন এই ধরনের তুলনা অতি সঙ্গত। স্টালিনকৃত কুলাক, সন্দেহভাজন রাজনৈতিক বিরুদ্ধপক্ষ এবং তাদের পরিবার, পোল, এস্টোনিও প্রভৃতি অধিকৃত জাতিসমূহের শিক্ষিত মানুষ ইত্যাদি হত্যার ঘটনাগুলি সুপরিকল্পিত। স্টালিনের বলির সংখ্যা হিটলারের বলির সংখ্যা থেকে বেশী। এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, স্টালিনের গণহত্যার বেশীভাগই হিটলারের গণহত্যার পূর্বেই সংঘটিত। শুধুমাত্র ত্রিশের দশকেই দেড় থেকে দু কোটি মানুষ খুন হয়েছিল। এক

দশকে এতো বেশী সংখ্যক মানুষের হত্যা ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সোভিয়েট বন্দী শিবির ও অন্যত্র দলন-মারণের বিতর্কে যোগ দিয়ে সার্ত্রে ও মার্লোপন্টির মত বামপন্থী বুদ্ধিজীবিও স্বীকার করেন যে হিটলারের অনেক কিছুই স্টালিনের কাছ থেকে শেখা। স্টালিনের গণহত্যার মডেলটি হিটলারকে প্ররোচিত করেছিল স্টালিনকে ছাড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টা চালাতে। অবশ্য নাৎসীদের অপরাধ শুধুমাত্র লেনিন-স্টালিনের অপরাধের প্রতিক্রিয়া বা অনুবর্তন বললে ব্যাপারটা অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে। তবে সংঘটিত গণহত্যার যে দিক স্টালিন উন্মোচন করেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে ইহুদী খান্ডব-দাহনের চিন্তা-ভাবনার জনক। স্টালিনীয় গণহত্যা কমিউনিজম সম্পর্কে জনমানসে এক বীভৎস ভীতি উৎপাদন করেছিল, যা পরিবর্তিত হয়েছিল বলশেভীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক সংগ্রামবোধে। সেই বোধই কালক্রমে প্ররোচিত করেছিল যা কিছু কমিউনিজমের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণে । যেমন, কার্ল মার্ক্স ইহুদী ছিলেন বলে ইহুদীরাও কমিউনিজমের অনুসারী বলে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। স্টালিনের এই বীভৎস কার্যকলাপের ফলে নাৎসীদের কম ক্ষতিকর বিবেচনা করে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন বহু ইউরোপীয় মানুষ।

এই অভিনবত্ব তত্ত্বের দ্বিতীয় একটি দিক আছে, যা বিগত শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গীটি অবশ্য ইহুদীদেরই সৃষ্টি; অপ্রচলিত ইচ্ছাবাদী তত্ত্বেরই একটি রকমফের। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক এলি উইজেলের মত কিছু ইহুদীদের বক্তব্য ইহুদী গণহত্যা অভিনব, অভূতপূর্ব, অনির্বচনীয়, অতুলনীয় এবং অবিশ্লেষণযোগ্য ঘটনা। অন্যান্য গণহত্যার সঙ্গে ইহুদী গণহত্যার পার্থক্য হলো এর অভিনবত্ব: এইসব ঘটনাবলীর অন্তরালে ক্রিয়াশীল এক অনবদ্য পৈশাচিক ইচ্ছাশক্তি। ইহুদীদের ধ্বংস করার যুগপ্রাচীন আকাঙ্খারই প্রতিফলন নাৎসীবাদ। অন্য যে কোনও গণহত্যার ব্যাখ্যা করার জন্য যেসব সমাজ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বা সাংস্কৃতিক কারণ নির্দেশ করা হয়, ইহুদী গণহত্যার ক্ষেত্রে এগুলি একেবারেই অচল। ইহুদী খান্ডব-দাহন একটি নগ্ন শয়তানী ছাড়া কিছু নয়।

ওল্ড টেস্টামেন্টে ঈশ্বর যিহোভা ইহুদীদের আপনজন বিবেচনায় কানান প্রদেশের সর্বময় অধিকারী নির্বাচিত করেছিলেন। ইহুদী দুর্দশার এই অভিনবত্ব তত্ত্ব ঈশ্বরের আপনজন তত্ত্ব-মুদ্রার উল্টো পিঠ ছাড়া কিছুই নয়।

আসলে জগতের ধর্মেতরবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইস্রায়েল-বহির্ভূত ইহুদীদের ধর্মীয় নির্যাস যখন স্বাভাবিকভাবে কমে যাচ্ছে তখন পবিত্র ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তে খান্ডব-দাহনের স্মৃতি তাদের কাছে ইহুদী সত্তার পরিচয়-চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ইস্রায়েলের উপর আন্তর্জাতিক সমবেদনা ধীরে ধীরে অপসৃয়মান। এই পরিপ্রেক্ষিতে খান্ডব-দাহনের অভিনবত্ব ইহুদীদের নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে মেষ পরিণত হলো নেকড়েতে যখন ১৯৬৭ অব্দের ছ দিনের যুদ্ধে ইস্রায়েল শুধু যে এক বিশাল অঞ্চল দখল করলো তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এক শক্তিশালী যোদ্ধারূপে দখলীকৃত অঞ্চলে নিজের অধিকার কায়েম রাখতেও সক্ষম হলো। এরপর ১৯৭৩ অব্দে ইয়ম কিপুর যুদ্ধের ফলে জন-জগতের সহানুভূতি কমতে থাকলো ইস্রায়েলের উপর। সঙ্গে সঙ্গে আরব তৈল-শক্তিগুলি পশ্চিমী সরকারগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের বাধ্য করলো ইস্রায়েল সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করতে। ইস্রায়েলের লেবানন অভিযান ও ফিলিস্তিনীয়দের বিক্ষোভ দমন ইস্রায়েলের উপর আন্তর্জাতিক সহানুভূতি ক্ষয় করেই চললো। ফলে ইহুদীদের প্রতি জনসমর্থন হ্রাসের সমহারে খান্ডব-দাহনের এই অভিনবত্ব তত্ত্ব জোরদার করতে হলো ইস্রায়েলের যাবতীয় কর্মকান্ডের যথার্থতা প্রতিপন্ন করার তাগিদে। এই ধরনের তৎপরতার আরও একটি কারণ

হলো, ইস্রায়েলী সমাজের নূতন-পুরাতন অন্তনির্হিত দ্বন্দ্ব। যেখানে গঠনোন্মুখ ও আধুনিক ইস্রায়েলী মানসিকতা প্রতিস্থাপিত হয়েছে গণহত্যার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা পরম্পরাগত ইহুদী মানসিকতার দ্বারা। এই পটভূমিতে খান্ডব-দাহনের যথার্থ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টাকে ধিক্কার জানানো হলো। বলা হলো, ব্যাপারটা খান্ডব-দাহনের বলি ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের অসম্মান প্রদর্শন ছাড়া কিছু নয়। অন্য কোনও গণহত্যায় অভিনবত্ব থাকতে পারে, কিন্তু আউসউইজ বন্দী শিবিরে গ্যাস চেম্বারের গণহত্যার মত নিরবচ্ছিন্ন পৈশাচিকতা তাদের মধ্যে কোথায়? আউসউইজ ইতিহাসের এক দিকচিহ্ন--যা মানুষ সম্বন্ধে আমাদের নীতিবোধ ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তিত হতে বাধ্য করেছে। সার্ত্রে শুধালেন, আউসউইজের পরেও কি আমরা কবিতা লিখতে পারি? লিওটার্ড বললেন, এর পরে আর কিছুর দার্শনিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। আউসউইজ ইতিহাসের কোনও ঘটনা নয়, এক ধরনের দার্শনিক ও ধর্মীয় ঘটনা--শয়তানির এক বীভৎস প্রকাশ। ইহুদী পুরোহিত এমিল ফ্যাকেনহিয়েমের মতে, ইহুদী খান্ডব-দাহন চরম শয়তানির এক বীভৎস উদাহরণ। কিন্তু কোনও মোহমুক্ত ঐতিহাসিক ইহুদী লেখকদের উপরোক্ত বক্তব্য সমূহের অংশীদার হতে পারেন না। ইহুদী খান্ডব-দাহন মানব ইতিহাসের অগণিত গণহত্যার একটি মাত্র। এই গণহত্যাকে কে অস্বীকার না করে মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অন্যান্য অপরাধরাজির পরিপ্রেক্ষিতে এটির বিচার করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই সত্যও স্বীকার করা দরকার যে যাঁরা নিজেরাই দুর্দশার শিকার তাদের পক্ষে অন্য কারুর দুর্দশার কথা চিন্তা করার মানসিকতা থাকেনা। নিজেদের কষ্টভোগকেই তারা বেশী মূল্য দিয়ে থাকে।

এখন আমরা কয়েক পঙ্‌ক্তি ব্যয় করছি অতি সংক্ষেপে সারা বিশ্বের গণহত্যার ইতিহাস বর্ণনা করার জন্য। কলম্বাসের আগমনের এক শতাব্দীর মধ্যে কারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ৮০ লক্ষ অধিবাসীদের সমূলে বিনাশ করা হয়। ১৪৯২ অব্দে ল্যাটিন আমেরিকার জনসংখ্যা ছিল ৯ কোটি। উপনিবেশীকরণের এক শতাব্দীর মধ্যে সেই জনসংখ্যা নেমে গিয়ে দাঁড়ালো ১ কোটি ২০ লক্ষে।এ কথা অনস্বীকার্য যে উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে নিয়ে আসা নতুন নতুন রোগজীবাণুই বহু দ্বীপবাসীর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। এছাড়া বহু মানুষই মারা গিয়েছিল ক্রীতদাসত্বের কঠিন পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরেই। এতৎসত্ত্বেও আক্ষরিক অর্থে গণহত্যার বলির সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ। উত্তর আমেরিকাতেও আদিম অধিবাসীদের অধিকাংশকেই হত্যা করা হয়েছিল নবাগত ঔপনিবেশিকদের বাসভূমির জন্য। ওই একই তাগিদে দুশো বছর আগে সমূলে বিনাশ করা হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগনিয়ার ২০ লক্ষ অধিবাসীদের। একটিমাত্র অভিযানে হত্যা করা হয়েছিল টাসম্যানিয়া দ্বীপের তাবৎ অধিবাসীদের। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ঔপনিবেশিক আগন্তুকদের বাসস্থানের তাগিদে ওই একই ভাবে বিনষ্ট করা হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রেই গণহত্যা ছিল পূর্বপরিকল্পিত।

দাস ব্যবসার যুগে এবং ঔপনিবেশিক অভিযানের সময় নিহত আফ্রিকাবাসীদের সংখ্যাও ৫ কোটির কম নয় বলে মনে করা হয়। ইহুদী গণহত্যা ইউরোপীয়দের কাছে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ বলে প্রতিভাত হলো; কারণ, যে সব অমানুষিক কার্যাবলী কালো মানুষদের উপর সংঘটনের সময় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল, সেইসব ভয়ঙ্কর কার্যকলাপ এখন সংঘটিত হলো সাদা চামড়ার ইউরোপীয়দের উপর। কিন্তু আমেরিকা ও আফ্রিকায় যে মানসিকতা কাজ করছিল, সেই একই মানসিকতা কাজ করলো ইহুদীদের ক্ষেত্রেও: নীচু শ্রেণীর মানুষ উঁচু শ্রেণীর মানুষের সমৃদ্ধ জীবনযাপনের জন্য জায়গা খালি করে দেবে। ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ অব্দের মধ্যে তুর্কীরা ১৫ লক্ষ খ্রীষ্টান আর্মেনীয়দের হত্যা করেছিল। এরা ছিল পশ্চিম আর্মেনিয়ার মোট জনসংখ্যার বা মোট আর্মেনীয়দের অর্ধাংশ। অটোম্যান সাম্রাজ্যের সময়মত পতনের জন্য আরও দশ লক্ষ আর্মেনীয় বিতাড়নের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তুর্কীদের উদ্দেশ্য ছিল আর্মেনীয়দের সবংশে নিধন করা।

আর্মেনীয়দের জনসংখ্যার আনুপাতিকে বিচার করলে এই গণহত্যা হিটলারের ইহুদী-নিধনের চেয়েও ব্যাপক। নাৎসী গণহত্যার প্রসঙ্গে শুধুমাত্র ইহুদী হত্যার কথাই শোনা যায়। কিন্তু হিটলারী গণহত্যার বলি শুধুমাত্র ইহুদীরাই নয়, ইহুদীদের সঙ্গে প্রায় চার লক্ষ জিপসীদেরও হত্যা করা হয়েছিল নাৎসী বন্দী শিবিরে। আরও কিছু জিপসীকে হত্যা করা হয়েছিল নাৎসী বন্দী শিবিরের বাইরে। মোট ১৫ লক্ষ জিপসীদের এক-চতুর্থাংশের বেশী নিধন হয়েছিল নাৎসীদের দ্বারা। এছাড়া নাৎসী শিবিরে নিহত হয়েছিল ষাট লক্ষ রুশও।

দেখা যাচ্ছে, ইহুদী গণহত্যার উপর মনোযোগটা বেশী পড়েছে। এতে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু এই অতিরিক্ত মনোযোগের সিদ্ধান্ত, 'সাবধান এ রকম আর যেন না হয়' খান্ডব-দাহনের অভিনবত্ব তত্ত্বের অনুসারী নয়। কারণ, মানুষের স্বাভাবিক রিপুসমূহই দুরন্তভাবে বৃদ্ধি পেয়ে গণহত্যার রূপ নেয়, গণহত্যা কোনও অলৌকিক ঘটনা নয়। ইহুদী খান্ডব-দাহন নিতান্তই লৌকিক গণহত্যা। সুতরাং আমরা যদি আকাঙ্খা করি আর কোনও গণহত্যা হতে দেবনা, তবে ইতিহাসের অন্য সমস্ত গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে আউসউইজ বন্দী শিবিরের গণহত্যার বিচার করতে হবে। আউসউইজ যদি মনুষ্যজাতির নিয়ন্ত্রণবিহীন অভিনব ঘটনা হয়, তাহলে এর আর পুনরাবৃত্তির সম্ভবনা থাকেনা। ইহুদী জাতির কাছে যদিও ব্যাপারটা অপ্রীতিকর, তবুও এটা অমোঘ ও অবিতর্কিত সত্য যে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন গণহত্যার বিবরণ লিখিত আছে ইহুদীদেরই নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ তেনাখে--যা আমাদের কাছে ওল্ড টেস্টামেন্ট নামে পরিচিত। ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে ঈশ্বর যিহোভার নির্দেশে ঈশ্বরের আপনজন ইহুদীদের জন্য ইহুদী পয়গম্বর মুসা ও তার ভৃত্য যূশা কর্তৃক প্রতিশ্রুতভূমি কানান প্রদেশ জয়ের বিবরণ।

হিব্রু বাইবেলের ডিউটেরোনমি, নিউমেরী ও যূশা খন্ডে আমরা দেখি কীভাবে মুসা ও তাঁর উত্তরসুরী যূশা যিহোভার আদেশ পেয়ে প্রতিশ্রুতভূমি কানান প্রদেশের যাবতীয় নরনারী গবাদি পশু সমেত ধ্বংস করেছিলেন। এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রদেশে পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল সেই সমস্ত প্রদেশস্থ শহরগুলিকে ধ্বংস করেছিলেন অত্যন্ত নির্মমতার সঙ্গে। কানান প্রদেশের বহিস্থ নগরগুলিকে আক্রমণ করে তাঁরা সমস্ত পুরুষ অধিবাসীদের হত্যা করেছিলেন। লুণ্ঠন করেছিলেন যাবতীয় সম্পদ ও নারী। যিহোভার আদেশে মিডিয়াবাসীদের কুমারী নারী ব্যতীত শিশুপুত্র সমেত যাবতীয় অধিবাসীদের হত্যা করা হয়েছিল। কুমারীদের বিতরণ করা হয়েছিল ইহুদীদের মধ্যে। কিন্তু প্রতিশ্রুতভূমি কানান প্রদেশের মধ্যে ইহুদীদের কোনও রকম বিচার বিবেচনার অবকাশ ছিলনা। যূশা খন্ডে বিবৃত আছে কীভাবে জেরিকো, আই, ম্যাকেডা, লিবনা, ল্যাকিস, এগলন, হেব্রন, ডেবির ও অন্যান্য উপনগরীগুলিতে ব্যাপক হত্যালীলা চালিয়ে অধিবাসীদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। এইভাবে ঈশ্বরের সাহায্যে যূশা ঈশ্বরের আপনজন ইহুদীদের বসবাসের জন্য এক বিশাল প্রতিশ্রুতভূমি দখল করেছিলেন।

বাইবেলের গবেষকদের মতে ইহুদী পুরাণের এই অংশ অতিবর্ণনা। হিব্রু বাইবেল সম্পাদিত হবার প্রায় সাতশো বছর আগে ইহুদীরা কানান প্রদেশ অধিকার করেছিল। বাইবেল সম্পাদনার সমকালে ইহুদী জনসাধারণের ও পুরোহিতদের আদর্শগত প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঐ ধরনের অতিবর্ণনা। সম্ভবতঃ অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে সহাবস্থান করেই মুসাকে তাঁর দলবল সমেত কানান প্রদেশে বাস করতে হয়েছিল। পরে ধীরে ধীরে কানান প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রসারলাভ করেছিল যিহোভার উপাসনা। এই যিহোভা উপাসনাই সমস্ত ইস্রায়েলী জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে। এতৎসত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে আক্ষরিক অর্থে বাইবেলের কাহিনীতে গণহত্যার তত্ত্বই পরিবেশিত হয়েছে। বাইবেলের অন্য অংশে যতই উচ্চ নৈতিক আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতা পরিবেশিত হোক না

কেন, এই নির্মম সত্য অস্বীকার করা যায়না এবং এই বাইবেল ঐশ্বরিক সৃষ্টি বলে পৃথিবীতে সম্মানিত।

কিন্তু এই ইহুদী ধর্মগ্রন্থে যে মানবিকতাবিরোধী তত্ত্বই পরিবেশিত হোক না কেন, আজকের ইহুদী সম্প্রদায়কে এই গণহত্যার তত্ত্বে বিশ্বাসী বলে প্রচার করা নিতান্ত অন্যায় হবে। অধিকৃত অঞ্চলে ইস্রায়েলী দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যদি ইস্রায়েলী অধিকারকে 'নয়া নাৎসীবাদ' বলে ধিক্কার দেন (যেমন কিছু কিছু মুসলিম নেতারা দিচ্ছেন) বা ইহুদীবাদ একটি 'নয়া জাতিদ্বন্দ্ববাদ' বলেন (যেমন রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে) তাহলে সেটা ঠিক সততার পরিচয় বলে গ্রাহ্য হবেনা। আজকের ইস্রায়েল পশ্চিম এশিয়ার সবচেয়ে গণতান্ত্রিক, মানবিক ও সহনশীল সমাজ। তার প্রতিরক্ষণযোগ্য সীমানা ও বাসস্থানের দাবী নিতান্তই ধর্মেতর; বিশেষতঃ যখন তার বিপরীত প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা করা যায়। বিপরীতে আছে পশ্চাদপদ, ধর্মান্ধ ও স্বৈরাচারী শক্তি--যারা ইস্রায়েলকে সমূলে বিনাশ করতে চায়। নানাবিধ নির্মম অভিযানের ফসল আজকের আরব জাতি--যার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে কুর্দ, অ্যাসিরীয় ও বর্বর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ব্যাপক বিনাশের দ্বারাই। সুতরাং ইস্রায়েলকে সমালোচনা করার কোনও নৈতিক অধিকার এই আরব জাতির নেই।

যদিও আজকের ইহুদী সম্প্রদায় মুসা ও যুশা কৃত সেই ঈশ্বর নির্দেশিত গণহত্যার তত্ত্বের দ্বারা কখনও পরিচালিত হয়নি, তবুও এই বাইবেলী কাহিনী বিশ্ব ইতিহাসে এক ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করেছে। পৌত্তলিকদের হত্যা করার এই বাইবেলী বিধান খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্ররোচিত করেছে বিশ্বজুড়ে পৌত্তলিকদের হত্যা করে খ্রীষ্টানীর প্রসারণ ঘটাতে। আমেরিকা ও ওশিয়ানিয়ার আদিম অধিবাসীরা পৌত্তলিক ছিল বলেই তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার একটা বীভৎস মাত্রায় পৌঁছেছিল। এই আদিবাসীরা পৌত্তলিক না হলে মাত্রাটা এত ব্যাপক হতোনা। খ্রীষ্টানদের নিজেদের মধ্যে হানাহানি কদাচ এত ব্যাপক হয়নি। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে রাজনীতির ধর্মেতরায়ণের পূর্বে মূল ইউরোপের ব্যাপকতম যুদ্ধসমূহ পৌত্তলিক বা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধেই সংঘটিত হয়েছে। বাল্টিক পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে টিউটনিক নাইটদের যুদ্ধের ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পৌত্তলিকতা ইউরোপ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১২০৯-১২১২ অব্দ কালে ম্যানিকীয় কাথার ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ নিছক গণহত্যা ছাড়া কিছুই নয়। ১৬১০-৪৮ অব্দে সংঘটিত ক্যাথলিক-প্রটেস্টান্ট যুদ্ধে ১৫ লক্ষ জার্মানবাসীর এক-তৃতীয়াংশ বিনষ্ট হয়। মুসার গণহত্যার এক অত্যুৎসাহী উত্তরাধিকারী হলো ইসলাম। যাবতীয় পৌত্তলিক জনসংখ্যা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের প্রেরণা ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই বিশ্বাসে যে, যে ঈশ্বরের আদেশে মুসা পৌত্তলিকতা ধ্বংস করেছিলেন, সেই ঈশ্বরই মুসলমানদের আদেশ দিয়েছেন পৌত্তলিকতা ধ্বংস করতে। এই বিশ্বাসই ইসলামী জেহাদীদের বিবেকের সমস্ত সংশয়কে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

ইহুদী-বিদ্বেষীরা তাদের অনসৃত নীতি ও মানসিকতার সমর্থনে ওল্ড টেস্টামেন্টের গণহত্যাকে নজির হিসাবে উল্লেখ করেন। সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো, ক্রোয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট ফ্রাকে টুর্জম্যানের লেখা ওয়েস্টল্যান্ড : হিস্টোরিকাল ট্রুথ নামক পুস্তক। ক্রোয়েশিয়া সরকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রচুর ইহুদী-হত্যা করেছিল। সেইসব হত্যাকান্ডের সমর্থনে ১৯৮৯ অব্দে প্রকাশিত এই পুস্তকে টুর্জম্যান লিখেছেন, "গণহত্যার ঘটনা ইহুদীদের কাছে স্বাভাবিক। এটা যে শুধু মান্য করার বিষয় তাই নয়, এটা নির্দেশিতও বটে।"

এই সমস্ত কথা ফিলিস্তিনীয় সমর্থকদের সহানুভূতি যোগালেও এ সবের কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। মুসা ও যুশা যেভাবে প্রতিশ্রুতভূমি দখল করেছিলেন তার সঙ্গে বহুশতাব্দীব্যাপী ইহুদী বিদ্বেষের কোনও সম্পর্ক নেই--বিশেষতঃ নাৎসীরা ও ক্রোয়েশিয়রা যা করেছেন। মুসার ইহুদীধর্মের বস্তুগত ও

বিশ্বাসগত পরিবর্তন ঘটেছে। ইহুদীরা বহু শতাব্দী ধরেই 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও' নীতিতে বিশ্বাসী। বহু শতাব্দী ধরেই ইহুদীরা তাদের আশ্রয়দাতা দেশকে অর্থনৈতিক এবং বৌদ্ধিক সম্পদে সমৃদ্ধ করেছে।

কোনও জাতির কাছেই গণহত্যা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মানুষের রক্ত, বংশধারা বা জাতীয়তা কখনই তাদের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেনা। মানুষের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মানসিকতা। গণহত্যা নিতান্তই তত্ত্বের সন্তান। এই সন্তান মুসার ইস্রায়েল বা হিটলারের জার্মানী বা খলিফার তুরস্ক উৎপাদন করতে পারে। কারণ, তারা বিশ্বাস করে উচ্চতর কোনও লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য গণহত্যার প্রয়োজন। প্রত্যেকটি গণহত্যার প্রবর্তনকারীরা বিশ্বাস করে তারাই মনোনীতজন-- যারা পৃথিবীর কোনও একটি অংশে একচ্ছত্র রাজত্ব করার জন্য (যেমন হিটলার ও মুসা) বা গোটা বিশ্বজুড়ে রাজত্ব করার জন্য (যেমন, খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম, উপনিবেশবাদ ও সাম্যবাদ) মনোনীত।

পদ্ধতি বা পরিমাণগত পার্থক্য ছাড়া নাৎসী খান্ডব-দাহনের সঙ্গে অন্য গণহত্যার কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। সুতরাং হিটলার ও স্টালিনের গণহত্যা ইহুদী, রেড ইন্ডিয়ান, আফ্রিকাবাসী, টাসমেনিয়ো, আর্মেনীয়, জিপসী ইত্যাদিদের গণহত্যার তুলনামূলক আলোচনায় বিদ্বৎজনের অধিকার অত্যন্ত সঙ্গত।

নাৎসী খান্ডব-দাহন অস্বীকার

ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর পুনঃব্যাখ্যা এক ব্যাপার আর ঐসব ঐতিহাসিক তথ্যাবলী অস্বীকার করা আর এক ব্যাপার। নাৎসী জার্মানীর দ্বারা সংঘটিত ১৯৪১-১৯৪৫ অব্দ জুড়ে ইহুদী ও জিপসীদের ব্যাপক হত্যাকান্ডের ব্যাপারে ইউরোপে একগুচ্ছ অপলাপবাদীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এইসব অপলাপবাদীরা দাবী করেন, নাৎসীদের খান্ডব-দাহনের ব্যাপারটা নির্জলা মিথ্যা। নানাজন বর্ণিত মৃত্যুশিবিরের ঘটনাবলী নিছক চক্রান্ত ছাড়া কিছুই নয়। এইসব অপলাপবাদীদের বক্তব্য, এই উদ্দেশ্যমূলক রটনার পিছনে আছে কমিউনিস্ট ও ইহুদীরা। নিজেদের ভয়াবহ রাজত্বকে নীতিসঙ্গত করা জন্য ফ্যাসীবাদকে মূর্তিমান ত্রাসরূপে চিত্রিত করা কমিউনিস্টদের নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেজন্য তারা ফ্যাসিবাদী শব্দটি প্রয়োগ করে যত্রতত্র। আলেকজান্ডার সোলঝনিৎসিন থেকে দালাই লামা--পৃথিবীর তাবৎ সুভদ্র লোক, যিনিই কমিউনিজমের পথের অন্তরায় হোন না কেন, চিহ্নিত হন ফ্যাসিবাদী বলে।

অপলাপবাদীদের মতে প্রতিটি কমিউনিস্টকেই ফ্যাসিবাদের অপরাধের এক ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত করতে হয়, যাতে ফ্যাসিবিরোধিতা মহিমান্বিত হয় এবং যাতে ফ্যাসীবাদকে গালাগালের হুলটি যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক হয়।উদাহরণস্বরূপ অপলাপবাদীরা একটি গণহত্যার কথা উল্লেখ করে থাকেন: কার্টিনের গণহত্যা। এই গণহত্যার বলি পোলরা। রুশরা গণহত্যার দায়টা এতোদিন নাৎসীদের উপরই চাপিয়ে দিয়ে আসছিল। যার ফলে ব্রিটেনের পররাষ্ট্র দপ্তর ১৯৮৯ অব্দ পর্যন্ত এ ব্যাপারে রাশিয়ার দায় অস্বীকার করতো। কিন্তু আজ জানা যাচ্ছে গণহত্যাটি স্টালিনের আদেশেই ঘটেছিল।

অপলাপবাদীদের বক্তব্য: কার্টিন গণহত্যার দায়িত্ব যদি কমিউনিস্টরা নাৎসীদের উপর চাপিয়ে দিয়ে থাকে, তবে আউসউইজ গণহত্যাই বা নয় কেন?

অপলাপবাদীদের মতে, ইহুদী খান্ডব-দাহনের মিথ্যা ঘটনা উদ্ভাবনের জন্য কমিউনিস্টরা যত না দায়ী, তার থেকে বেশী দায়ী ইহুদীরা। কারণ, খান্ডব-দাহনের মিথ্যা রটনার অব্যবহিত ফসল হচ্ছে ১৯৪৮ অব্দে জাতিপুঞ্জ কর্তৃক ইস্রায়েল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। নতুন রাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থও পেয়েছিল। আজ ইহুদী খান্ডব-দাহনের স্মৃতির বলে বলবান

হয়েছে বলেই ইস্রায়েলের রাজনৈতিক দাবী হলো, নিরাপদ প্রতিরোধযোগ্য সীমান্ত। যার নিগদিত অর্থ হলো, অধিকৃত আরব অঞ্চলের উপর প্রভুত্ব স্বীকার। এ ছাড়া গত দু দশকে ইস্রায়েলের প্রতি ঢালাও পশ্চিমী সমর্থন কমে আসছে। সেই হারানো সমর্থনের ফিরে পাবার জন্যও খান্ডব-দাহনের স্মৃতিকে পুনর্জাগরিত করা হচ্ছে খান্ডব-দাহন সম্পর্কে রচিত পুস্তক ও চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে।

সুতরাং অপলাপবাদীদের মতে যাদের অত্যাচারের বলি বলে বর্ণনা করা হচ্ছে তারাই আসল অত্যাচারী। জাল ফটোগ্রাফ আর শেখানো পড়ানো তথাকথিত প্রত্যক্ষদর্শীর মিথ্যা সাক্ষ্যের দ্বারা ইহুদীরা নাৎসীদের বিরুদ্ধে কোনও কালে না ঘটা বিশাল বীভৎস গণহত্যার অভিযোগ সাজিয়েছে। ১৯৩৯ অব্দে ইংলন্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ইহুদীদের চক্রান্তেই। কারণ, ইহুদীরা ঐসব দেশের অর্থনীতি (সুতরাং রাজনীতিও) নিয়ন্ত্রণ করতো। এবং ইহুদী নেতা ডঃ চেম উইজম্যান যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়েছিলেন, যুদ্ধে ইহুদীরা ইংলন্ড ও ফ্রান্সের পক্ষেই থাকবে। সুতরাং ইহুদীরাই জার্মানদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল এবং জার্মানদের রক্ত শোষণ করার জন্য ইহুদীদের পরবর্তী চক্রান্ত হলো খান্ডব-দাহনের মিথ্যা গল্প প্রচার করা। সংক্ষেপে এই হলো অপলাপবাদীদের বক্তব্য।

অপলাপবাদীদের বক্তব্য খুব বেশী লোক গ্রহণ করেনি। তারা এইসব কর্মকান্ড ইতিহাসের বিকৃতিসাধন বলে বিরক্তি প্রকাশ করে এসেছে। ফ্রান্স ও জার্মানীতে অপলাপবাদী পুস্তকাদি প্রকাশ করা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ।

অপলাপবাদীদের দলে অল্প কয়েকজন বিদ্বান আছেন। যদিও অধিকাংশ বিদ্বানই এদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেন। অনেকেই এদের বক্তব্য যুক্তি সহকারে অস্বীকার করে পুস্তকাদিও রচনা করেছেন।

অপলাপবাদীদের প্রকাশনার অধিকাংশই নিম্নমানের পুস্তিকা। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস পুনর্মুল্যায়ণের জন্য কয়েকটি বিদ্বৎসভা গোছের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ক্যালিফোর্ণিয়ার ইন্সিটিউট অফ হিস্টরিক্যাল রিভিউ। এবং এদের মধ্যে কয়েকজন অপলাপবাদী বিদ্বান আছেন, যাঁরা আসলে চতুর বিতর্কবাদী এবং তাদের অপলাপবাদী রচনাবলী কিছুটা সম্ভ্রম আদায় করে নিতে সক্ষম। অপলাপবাদীদের অবলম্বিত পদ্ধতি সর্বদাই আপত্তিকর। যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করা সর্বদা নিষিদ্ধ বলে চিহ্নিত, তারা অবলম্বন করে সেইগুলিই। যেমন, অপ্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা। এইভাবে বাক্যের অর্থও অনেক সময় পরিবর্তন করা সম্ভব। বিরুদ্ধ পক্ষ হয়তো একটি দীর্ঘ তথ্যনিষ্ঠ বিবরণের মধ্যে এক জায়গায় লিখলেন, "পূর্বতন বন্দী ক এর সাক্ষ্যে স্ববিরোধিতা আছে" বা "খ বন্দী শিবিরের কোনও নথী এখন আর পাওয়া যায়না।" অপলাপবাদীরা উপরোক্ত দুটি বাক্যাংশ উৎকলিত করে সিদ্ধান্ত জানালেন, "নব আবিস্কৃত তথ্যের আলোকে বিরুদ্ধপক্ষ তাদের মত পরিবর্তন করেছেন।"

উদাহরণস্বরূপ তারা জার্মান ঐতিহাসিক মার্টিন ব্রোজার্টের উক্তি উৎকলিত করে বলেন, "ব্রোজার্ট বলেছেন, জার্মান রাজত্বের কোনও বন্দী শিবিরেই গ্যাস চেম্বার ছিলনা।"

কিন্তু অপলাপবাদীরা ব্রোজার্টের পরবর্তী বাক্যগুলি উৎকলিত করেন না, যেখানে ব্রোজার্ট বলেছেন, "বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা ইহুদীদের বৃহদায়তন হত্যাকান্ডগুলি ঘটানো হয়েছিল অধিকৃত অঞ্চলের বন্দী শিবিরগুলিতেই।"

অপলাপবাদীদের পুস্তিকাগুলি নিলর্জ্জভাবে ঘোষণা করে, ইতিহাস রচনা তাদের উদ্দেশ্য নয়। তারা শুধু নাৎসী গণহত্যার অভিযোগগুলিই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে চান। তাদের এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রকাশনাগুলির মধ্যে অনেক সময় একগাদা উদ্ধৃতি ও তথ্যসূত্র থাকে--যার বেশী ভাগই অন্য অপলাপবাদীদের পুস্তক থেকে বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে আউসউইজ বা অন্যান্য বন্দী শিবিরের

সাক্ষ্য বা তথ্য থেকে উদ্ধৃত। সেখানে হয় কে নয় করা হয়েছে, বা নিতান্তই নির্জলা মিথ্যা উদ্ধৃতি--যে গুলির সত্য নিরুপণ করা পাঠকের পক্ষে সচরাচর সম্ভব নয়। এই ইতিহাস বিকৃতকারীরা যে কোনও ধরনের নথি থেকে তাদের প্রয়োজনের বাক্যটি বেছে নিতে অতি পারঙ্গম। যখন কোনও বিচারক অপলাপবাদের জন্য তাদের দন্ডিত করেন তখন তারা বলে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে বিচার করা বিচার ব্যবস্থার এক্তিয়ার বহির্ভূত। আবার যখন কোনও বিচারক ওই সমস্ত বিষয়ে রায়দান যুক্তিযুক্ত মনে করেন না তখন তারা রটনা করে যে বিচারক তাদের বক্তব্য গ্রহণ করেছেন।

যেমন, যখন ফরাসী অপলাপবাদী অধ্যাপক মরিসন জাতি বিদ্বেষ ও মিথ্যা কলঙ্ক রটনার দায়ে দন্ডিত হন, তখন তিনি ঘোষণা করেন আমার ইতিহাস চর্চা সম্পর্কে বিচারকের কোনও বক্তব্য নেই। সুতরাং এখন ঘোষণা করা যেতে পারে, গ্যাস চেম্বার জাতীয় কোনও বস্তুর অস্তিত্ব কোনও কালে ছিলনা।

অপলাপবাদীদের প্রতারণার মূল কৌশল ইহুদী গণহত্যার সমস্ত তথ্য পাঠকের কাছে গোপন রাখা বা ব্যাপক গণহত্যাটিকে বেমালুম অস্বীকার করা। এই গণহত্যার অসংখ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ, যেগুলি বন্দী শিবিরের থেকে বেঁচে আসা দুর্ভাগারা বা অনুতাপতাড়িত নাৎসী অফিসাররা যুদ্ধকালে সভ্যজগতের কাছে প্রকাশ করেছেন--সেগুলি বেমালুম গোপন করা হয়। এবং কেবলমাত্র সেই সেই সাক্ষ্যগুলিই উৎকলিত করা হয়, যেগুলির মধ্যে স্ববিরোধিতা বা ভুল আছে। এর ফলে অপলাপবাদীরা এমনই এক ধারণা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে যে ইহুদী খান্ডব-দাহনের গোটা ব্যাপারটা একটা জ্বলন্ত মিথ্যা মাত্র।

এই অপলাপবাদীরা নানারকম তঞ্চকতা ও চমকের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৭৯ অব্দে ইন্সিটিউট অফ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ পঞ্চাশ হাজার ডলারের এক পুরস্কার ঘোষণা করে বলে যে, কেউ যদি নাৎসীদের কৃত গ্যাস চেম্বারে মৃত্যুর ঘটনা প্রমাণ করতে পারে তবে তাকে ঐ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে ছোট অক্ষরে লেখে, গ্যাস প্রয়োগে মৃত্যুর ঘটনা পুরস্কারপ্রার্থীকে সচক্ষে দেখতে হবে, পেশ করতে হবে ময়না তদন্তের প্রতিবেদন ও গ্যাস চেম্বারের গঠন সংক্রান্ত নথিও। এর একবছর পরে ঘোষণা করা হলো, গ্যাস চেম্বারে মৃত্যুর ঘটনা প্রমাণ করার জন্য কোনও লোকই পুরস্কার নিতে উপস্থিত হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে ইন্সিটিউটের দাবী করা প্রমাণাবলী জোগাড় করা সম্ভব এমন কোনও লোকই পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য উপস্থিত হয়নি। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ঐতিহাসিকেরা অপলাপবাদীদের বয়কট করারই সিদ্ধান্ত করেন। কারণ এই ধরনের একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা অপলাপবাদীদের প্রচারের মাত্রা বৃদ্ধি করবে মাত্র। তাছাড়া সমস্ত প্রার্থিত তথ্য সোভিয়েট ও পোল কর্তৃপক্ষের কাছেই লভ্য ছিল তখন।

কয়েকটি ঘটনায় জনগণের মন অপলাপবাদীদের দিকে কিঞ্চিৎ আকর্ষিত হয়েছিল তখন। প্রথমতঃ খান্ডব-দাহন নিয়ে অত্যধিক আলোচনা ইহুদীদের আত্মপ্রচার ও ইস্রায়েলের যাবতীয় কর্মকে যুক্তিযুক্ত প্রতিপন্ন করতে সাহায্য করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর একটি ধারণা যে ইহুদী নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রসমূহ জিপসী ও কোটি কোটি পোল, রুশ ও ইউক্রেনীয় বলিদের বাদ দিয়ে শুধু মাত্র ইহুদীদের কথাই প্রচার করছে। এছাড়া মিত্র পক্ষের অত্যাচারের বলি সম্পর্কেও নীরব থাকছে এইসব সংবাদ মাধ্যমগুলি। খান্ডব-দাহনের এই ধরনের অত্যধিক প্রচার কিঞ্চিত ইহুদী-বিদ্বেষীদের বিদ্বেষ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করলো। ফলে সুবিধা হয়ে গেল অপলাপবাদীদেরই।

এছাড়া অপলাপবাদীদের এক ধরনের শহীদত্বও রেখাপাত করলো জনমানসে। নেতৃস্থানীয় অপলাপবাদী ফনিসনকে একদা একদল ইহুদী ছোকরা এমনই প্রহার করলো যে সে ভদ্রলোককে

বেশ কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে বাস করতে হলো।

একজনের এ ধরনের নিগ্রহ কোনও মতবাদকে মহান করে তোলেনা ঠিকই। কিন্তু যখন এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটে তখন অবশ্যই কিছু ফল হয়।এছাড়া প্রচার মাধ্যম ও বিচার বিভাগ অপলাপবাদীদের সঙ্গে সুব্যবহার করেনি। যেমন, ফরাসী দক্ষিণ পন্থী নেতা জ্যাঁ ম্যারী লে পেন কে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল এক টিভি সাক্ষাৎকারে গ্যাস চেম্বারে মৃত্যু খান্ডব-দাহনের ইতিহাসে এক তুচ্ছ ঘটনা বলায়।যদিও পরে তিনি বিস্তারিত ভাবে বলেছিলেন গ্যাস চেম্বার বলতে তিনি হত্যার পদ্ধতিটিকেই বুঝিয়েছিলেন--যা বিভিন্ন উপায়ে বিরাট সংখ্যক ইহুদী নিধনের তুলনায় সামান্যই বলতে হবে। অবশ্য অন্যান্য অনেক বিষয়ে নানা দ্ব্যর্থবোধক কথা বলেছিলেন জ্যাঁ ম্যারী লে পেন। যাই হোক, এই ঘটনার ফলে ফরাসী অপলাপবাদীরা জ্যাঁ ম্যারীকে তাদের মতবাদের বীর প্রবক্তারূপে বরণ করেছিল। এছাড়া তারা নানাভাবে ইহুদীদের প্ররোচিত করেছিল তাদের উপর অত্যাচার করার জন্য--যাতে ইহুদীদের অত্যাচারীরূপে অভিক্ষেপ করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ ইহুদী খান্ডব-দাহনের সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্যেও কিছু গলদ আছে। প্রথমতঃ সাক্ষ্য প্রমাণের পরিমাণ খুবই অল্প। বেশী ভাগ শিবিরের ক্ষেত্রেই নাৎসীরা সোভিয়েট বা ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির আগমনের আগেই যাবতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ বিনষ্ট করে দিয়েছে। যেহেতু গণহত্যার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গুপ্ত রাখা হয়েছিল, সেহেতু এর যাবতীয় কার্যাবলী সাংকেতিক ভাষাতেই চলতো। বিষবাষ্প দিয়ে ইহুদীদের হত্যা করা হয়েছিল, এ কথা নাৎসীদের কোনও দলিলেই বলা নেই। এতৎসত্ত্বেও অন্য অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ যা পাওয়া গেছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। শিবিরের রক্ষাকর্মী ও নাৎসী অফিসারদের সাক্ষ্য--যেগুলি বিচার চলাকালীন প্রকাশিত হয়েছিল, বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদত্ত হয়েছিল, নানা ধরনের যান-বাহনের কর্মচারী, রাসায়নিক ইঞ্জিনীয়ার, অন্যান্য কর্মচারী যারা খান্ডব-দাহনের কর্মকান্ডের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য, বন্দীদের ডায়েরী, শিবির থেকে ছাড়া পাওয়া অত্যাচারিত মানুষজনের সাক্ষ্য এবং অন্য বহুবিধ দলিল এই খান্ডব-দাহনের আকার ও প্রকার সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। এ ছাড়া ধরাপড়া নাৎসী অফিসাররা সংকেতলিপি পাঠোদ্ধারের সূত্র প্রকাশ করে দেওয়ায় অনেক নাৎসী দলিলও পাঠ করা সম্ভব হয়েছে।

তৃতীয়তঃ সাক্ষ্যপ্রমাণে দ্বিতীয় ধরনের গলদ হলো, শিবির থেকে ফিরে আসা অত্যাচারিতদের বিবৃতির মধ্যে যথেষ্ট স্ববিরোধিতা ও ভ্রান্তি আছে।যেমন, কেউ কেউ বলেছেন তাঁদের সহবন্দীদের গ্যাস চেম্বারে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। পরে প্রমাণিত হয়েছে ঐ শিবিরে কোনও গ্যাস চেম্বার ছিলনা।

কোথাও কোথাও জবানবন্দীর সঙ্গে ডায়েরীতে লেখা বক্তব্যের লক্ষ্যনীয় অমিল দেখা গেছে। এইসব অসঙ্গতি বাদ দিয়েও সমগ্র সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনা করলে উপলব্ধ হবে যে প্রত্যক্ষদর্শীরা এই ধরনের ভয়াবহ ঘটনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরে ঘটনাবলী বাড়িয়ে বলে। বিশেষতঃ একদল যখন বেশী নিগ্রহের কথা বলে মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করে তখন অন্যদল বেশী সহানুভূতির প্রত্যাশায় নিজেদের নিগ্রহের পরিমাণ বাড়ায়।এ সবই মনুষ্য-মনের বিচিত্র কিন্তু স্বীকৃত ধর্ম। সামান্য একটি পথ-দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যদিও পথ-দুর্ঘটনাটি অবশ্যই বাস্তব।

কয়েকজনের বক্তব্যে অসঙ্গতি দেখিয়ে গোটা ব্যাপারটা মিথ্যা বলে ঘোষণা করা এক ধরনের নিরাপদ চাতুরী। একটা বড় বিবরণের মধ্যে সামান্য অংশ মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে গোটা ব্যাপারটাই মিথ্যা হয়ে যায়না। কিন্তু সেইটাই বলা হয়। এইভাবে চাতুর্যের সঙ্গে গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটা মিথ্যা ও বিকৃত ধারণা দেওয়া হয়।

বামপন্থী অপলাপবাদ

সত্তরের দশকে অপলাপবাদীরা এক অপ্রত্যাশিত বন্ধু পেয়ে গেল। যখন পিয়েরী গাইলাম এবং তাঁর সংস্থা লা ভাইলি টাউপ কে কেন্দ্র করে সমবেত হলেন একদল ফরাসী বুদ্ধিজীবি এবং তাঁরা ওকালতি করতে লাগলেন অপলাপবাদীদের হয়ে। ফরাসী বামপন্থীদের মধ্যে এই উপদলটি একেবারে গুরুত্বহীন; কিন্তু অপলাপবাদীদের সমর্থনের ক্ষেত্রে এদের যুক্তি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

এই বামপন্থীদের অপলাপবাদীদের সমর্থনের প্রাথমিক কারণ তৎকালীন আরব-ইস্রায়েলী সংঘাতের সময় ফিলিস্তিনীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে স্বীকৃতি। খান্ডব-দাহনকে কেন্দ্র করে ইস্রায়েলী রাষ্ট্রের স্বীকৃতির সমান্তরালে প্রবাহিত হতে থাকে খান্ডব-দাহনকে অস্বীকার করে ইস্রায়েল-বিরোধী ক্রিয়াকান্ডকে জোরদার করার প্রচেষ্টা। অপলাপবাদীদের বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে মৃত ইহুদীদের সংখ্যা নতুন করে অনুমান করতে আরম্ভ করে এই কট্টর বামপন্থীরা। তাঁদের মতে মৃত ইহুদীদের সংখ্যা ষাট লক্ষের বেশী নয়।

গ্লাসনস্তের পরে পোল্যান্ডের কর্তা ব্যক্তিরা বলতে থাকেন আউসউইজে বিনষ্টের সংখ্যা পনেরো লক্ষ মাত্র; এদের মধ্যে অর্ধেক ছিল ইহুদী। আগেকার সরকারী সংখ্যাগুলি ছিল চল্লিশ লক্ষ ও কুড়ি লক্ষ। ফলে ব্যাপারটা এমনই দাঁড়াচ্ছে যে পোল কর্তৃপক্ষ যদি সঠিক সংখ্যা উচ্চারণ করে থাকেন তবে খান্ডব-দাহনে মোট মৃতের সংখ্যা ষাট লক্ষেরও কমে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, কেউই সংখ্যাটা ষাট লক্ষের নীচে নামিয়ে আনতে সাহস পাচ্ছেন না, পাছে অপলাপবাদী বলে চিহ্নিত হয়ে যান। সলিডেয়ার নামক বেলজিয়ামের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পত্রিকাতেই আমি প্রথম পড়ি, নাৎসীরা ৫১ লক্ষ ইহুদীদের হত্যা করেছে।

কিন্তু আমরা এখানে নিছক সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে বসিনি। আমাদের মূল বক্তব্য ইহুদী খান্ডব-দাহনকে অস্বীকার করা নিয়ে। ফিলিস্তিনীয়দের সমর্থন করতে গিয়ে উপরোক্ত বামপন্থী দলটি গোটা গণহত্যাকেই অস্বীকার করে বসে।

বামপন্থী অপলাপবাদের মূলীভূত কারণ হলো মার্ক্সবাদ দিয়ে নাৎসী-ইহুদী বিবাদের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়না। অবশ্য বিভিন্ন পুঁজিবাদী শক্তির অভ্যন্তরীণ বিবাদ--যেমন ইহুদী বনাম জার্মান পুঁজিবাদী বা জার্মান বনাম ইঙ্গ-ফরাসী পুঁজিবাদীদের বিবাদ মার্ক্সীয় তত্ত্বের বহির্ভূত নয়। কিন্তু নাৎসীদের পরিকল্পিত ইহুদী জাতির সমূহ বিনাশ মার্ক্সীয় তত্ত্বের পুরোপুরি বাইরের ব্যাপার। মার্ক্সবাদীরা ফ্যাসীবাদকে পুঁজিবাদের চরম প্রকাশ বলে বর্ণনা করেন; যেমন রাজতন্ত্র ও উপনিবেশবাদকে বর্ণনা করেন পুঁজিবাদের বিভিন্ন পর্যায় রূপে। ইতিমধ্যে ১৯৫৩ অব্দে কিছু কিছু ট্রটস্কীপন্থী বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে খান্ডব-দাহনের সমালোচনা করে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদ 'যমজ ভ্রাতা' ফ্যাসীবাদ থেকে নিজেদের পৃথক করে ফেলেছে। পুঁজিবাদীরা জনগণকে বোঝাতে পেরেছে যে গণতন্ত্র ও ফ্যাসীবাদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য প্রচুর। ফ্যাসীবাদ সৃষ্টি করেছে খান্ডব-দাহন আর গণতন্ত্র বিরোধিতা করেছে সেই ফ্যাসীবাদের; এবং সেই ভয়াবহ খান্ডব-দাহনের অবসান ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। এর ফলে অচল হয়ে উঠেছে 'যমজ-ভ্রাতা' তত্ত্ব: ফ্যাসীবাদ ও গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদ একই রাক্ষসের দুটি মুখ। এখন জনগণের যুদ্ধ ফ্যাসীবাদী পর্যায়ের পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে না চলে, চলুক তথাকথিত গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই। ইঙ্গ-মার্কিণ বা জার্মান-ইটালী পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন নেই। ফ্যাসীবাদের বিরোধিতা করতে গেলে গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের সমর্থন হয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। মার্ক্সবাদ দিয়ে নাৎসী খান্ডব-দাহন ব্যাখ্যা করা যায়না, লা ভাইল টাউপ উপদলটির এই অনুধাবনে যথার্থতা আছে। সুতরাং গোটা ব্যাপারটিকেই অস্বীকার করতে হবে।

অস্বীকার করার জন্য এই বামপন্থী অপলাপবাদীরা পূর্বপ্রচলিত বলির পাঁঠা তত্ত্বকেই নতুন ভাবে প্রচলিত করলেন। তাঁরা বললেন, ১৯৪৫ অব্দ পর্যন্ত জনগণের অসন্তোষ অন্যপথে চালিত করার জন্য ইহুদীদের বলির পাঁঠা করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৫ অব্দে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। এবার বলির পাঁঠা হলো বিপরীত শক্তি--ফ্যাসীবাদীরা। সুতরাং পুঁজিবাদীরাই আসল অপরাধী। তারা সর্বহারাদের পুঁজিবাদবিরোধী মানসিকতাকে প্রশমিত করতেই ফ্যাসীবাদীদের ঘাড়ে সবকিছু দোষ চাপিয়ে নিজেরা সাধু সাজছে।

এ ধরনের সিদ্ধান্তের পরিবর্তনের কারণ হলো, ফ্যাসীবাদ দমিত হয়েছে: ফ্যাসীবাদ থেকে আর ভয় পাবার কিছু নেই। কিন্তু ফ্যাসীবাদ দমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবলতর হয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদ। সুতরাং তাদের বলতে হলো, ফ্যাসীবাদ হলো পুঁজিবাদের সৃষ্টি করা এক কাকতাড়ুয়া, যা সমাজবাদ থেকে মানুষের মন ফিরিয়ে নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদ সমর্থনকে এক মহান রূপ প্রদান করেছে।

খান্ডব-দাহন অস্বীকারের এই প্রণালী আপাতদৃষ্টিতে পূর্বতন বলির পাঁঠা তত্ত্বের থেকে দূরবর্তী। এই বামপন্থীদের বক্তব্যের ভিত্তি যুদ্ধোত্তর কালের কিছু সাক্ষ্য। বিশেষতঃ নাৎসী যন্ত্রণা শিবির থেকে বিকলাঙ্গ হয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত লেখক পল রাসিনিয়ারের বই। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার মানুষটি খান্ডব-দাহনকে একটি প্রচারধর্মী আষাঢ়ে গল্প বলে রায় দিয়েছেন। নাৎসী অত্যাচারের শিকার এবং যথার্থই বামপন্থী হিসাবে তিনি অপলাপবাদীদের বক্তব্যের যথাযথ সাক্ষী। কিন্তু যাঁরা সমস্ত পরিপ্রেক্ষিত বিচার করবেন, তাঁরা অবশ্যই রায় দেবেন যে পল রাসিনিয়ার বুকেনওয়ার্ল্ড নাৎসী শিবিরের অভিজ্ঞতাকেই সমস্ত নাৎসী শিবিরের অভিজ্ঞতা বলে প্রচার করেছেন। বুকেনওয়ার্ল্ড নাৎসী শিবিরে সত্য সত্যই কোনও ইহুদীকে বিষবাষ্প দিয়ে মারা হয়নি। পল রাসিনিয়ারের মত মানুষের সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করা সমীচীন নয়। কারণ, এই মানুষটি বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন। কিন্তু শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে যেসব ঐতিহাসিকরা পল রাসিনিয়ারের পুস্তক থেকে পছন্দমত বক্তব্যসমূহ উৎকলিত করেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ও সততা সম্বন্ধে সহজেই সন্দেহ প্রকাশ করা যায়। ইতিহাসকে বিকৃত করার সহজ উপায় হলো পর্বতপরিমাণ সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে অল্প কয়েকটি গ্রহণ করা।

এ ছাড়া বাম অপলাপবাদীদের বক্তব্য স্ববিরোধ ও কুযুক্তির দীর্ঘ ও করুণাকর তালিকা ছাড়া কিছুই নয়। উদাহরণ স্বরূপ ভিন্সেন্ট মন্টিলের কথাই ধার যাক। উনি লিখেছেন, "বৃহদায়তন গণহত্যা গ্যাস চেম্বার ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং কোনও গণহত্যাই ঘটেনি।"

আমরা যদি ধরেও নিই, গ্যাস চেম্বার ব্যাপারটা গল্প; তাহলেও কেউ যদি ধারণা করেন যাঁরা গণহত্যা করতে চান তাঁরা গ্যাস চেম্বার ছাড়া অন্য কোনও পদ্ধতি খুঁজে পাবেন না, তাহলে তাদের গর্দভ ছাড়া অন্য কিছু বলা যাবেনা। কারণ, ইতিহাস বলে, গ্যাস চেম্বার ছাড়াই বহু গণহত্যা ঘটেছে সারা বিশ্বে।

কমিউনিস্ট জমানায় সংঘটিত অপরাধ সম্বন্ধে বামপন্থীরা যত অপলাপ প্রচার করে, তার তুলনায় নাৎসী খান্ডব-দাহন অপলাপ-সিন্ধুতে বিন্দু মাত্র। কত বিদ্বজ্জন সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ করে এলেন, তাঁরা খারাপ জিনিষের সামনে বন্ধ করে রাখলেন চোখজোড়া। তারপর গাইড যেমন দেখালেন, যেমন যেমন বললেন, সেই অনুযায়ী দেখে ও শুনে স্টালিনের সাহসী পদক্ষেপগুলি সম্বন্ধে একটি সোনালী প্রচার ছড়িয়ে দিলেন স্বদেশের বাতাসে। এই ধরনের সোভিয়েটগ্রস্তদের সবচেয়ে বড় উদাহরণ অবশ্যই পন্ডিত জওহরলাল নেহরু। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা মাঝে মাঝেই মস্কোতে যেতেন পরামর্শের জন্য, স্বদেশে কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী সঙ্ঘ

গড়ে তুলতেন; ঐ জমানার সঠিক চিত্রটি জনসাধারণের কাছে অভিক্ষেপ করার জন্য। স্বদেশের গরীব মানুষদের পিঠে ছুরি মারার জন্য আজও তাঁরা অনুতপ্ত নন। কাটিন গণহত্যার দায়িত্ব সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ স্টালিনের উপর বর্তালেও স্বদেশের সোভিয়েট সমর্থকেরা নিজেদের মিথ্যা প্রচারের জন্য স্বদেশের জনসাধারণের কাছে আজও ক্ষমা প্রার্থনা করেননি।

কমিউনিস্ট অপলাপবাদীদের একটি মামলা বিচারের জন্য একদা জজের এজলাসে উঠেছিল। মামলাটি হচ্ছে ক্লাভচেঙ্কোর। ১৯৪৪ অব্দে ভিক্টর ক্লাভচেঙ্কো সোভিয়েট রাশিয়া থেকে পালিয়ে যান এবং আমি স্বাধীনতা বেছে নিলাম বলে একটি বই লিখে স্টালিনী আমলের দমন-পীড়নের বর্ণনা দেন। ফরাসী কমিউনিস্টরা তাঁর বক্তব্যকে CIA র চক্রান্ত বলে তকমা দেন। ফলে এইসব কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা ঠোকেন ক্লাভচেঙ্কো। মামলায় গুলাগ শিবিরের কিছু অত্যাচারীরা ক্লাভচেঙ্কোর হয়ে সাক্ষী দেন। কিছু গুলাগবাসী আবার ক্লাভচেঙ্কোর বক্তব্য অস্বীকার করেন। এইসব গুলাগবাসীরা বলেন তাদের বক্তব্য অস্বীকার করা ঠান্ডা যুদ্ধের প্রচার ছাড়া অন্য কিছুই নয়। মামলায় অবশ্য শেষ পর্যন্ত ক্লাভচেঙ্কোই জেতেন।

নাৎসী বন্দী শিবির থেকে মুক্ত ডেভিড রুজেট ১৯৪৪ অব্দে অন্যান্য বন্দীশিবির থেকে মুক্ত মানুষদের আহ্বান করে বলেন, সোভিয়েট বন্দী শিবিরের অবস্থা তদন্ত করে দেখা দরকার। এরপর যখন তিনি সোভিয়েট বাধ্যতামূলক শ্রমের নিয়ম শীর্ষক একটি পুস্তক প্রকাশ করলেন, তখন তিনি একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলেন কমিউনিস্টদের কাছে। তারা অভিযোগ করলো, রুজেটের সমস্ত তথ্য জাল। রুজেট মানহানির মামলা করলেন, এবং জিতলেনও।

ফ্লেমিশ বিদ্বান গাইভ্যান ডেন বার্থে তাঁর অপলাপবাদ বিষয়ক পুস্তক Des Vitbuting Van de Holocaust এ রুজেটের মামলা সম্পর্কে লিখেছেন, পর্বত-প্রমাণ তথ্যও গুলাগ অবিশ্বাসীদের নিরুৎসাহ করতে পারেনি। বর্তমানকালের অপলাপবাদীরা যে অস্ত্র ব্যবহার করে তারাও তাই করলো। শিবির পলাতকদের বক্তব্য তারা নাকচ করে দিয়েছিল রহস্যময়তার অভিযোগে এবং নিজেরা যেহেতু গুলাগ বন্দী-শিবির দেখেনি, অতএব তাদের মতে গুলাগ বন্দী শিবিরের কোনও অস্তিত্ব ছিলনা। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, যখন তারা গুলাগ বন্দী শিবিরের অস্তিত্ব নাকচ করে দিচ্ছিল তখনও সেই শিবিরে চলছিল একই ধরনের দমন-পীড়ন।

রুজেট মামলাকে কেন্দ্র করে বিতর্কে যোগ দিলেন বামপন্থী বুদ্ধিজীবি জাঁ পল সার্ত্রে ও মরিস মার্লোপন্টি।তাঁরা স্বীকার করলেন, স্টালিনের বন্দী শিবির হিটলারকে উৎসাহিত করেছিল, গ্যাস চেম্বারটি শুধু হিটলারের অতিরিক্ত উদ্ভাবন। এতৎসত্ত্বেও এই দুই বুদ্ধিজীবি সোভিয়েট শিবিরের উৎপীড়নকে নিন্দা করতে রাজী হননি। কারণ, সোভিয়েট সরকার সরল বিশ্বাসে এসব অপকর্ম করেছিলেন। সেই কারণে, এইসব অপরাধগুলি সন্দেহের অবকাশে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য। এবং এইসব অপরাধ সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমিতে প্রতিবিপ্লবের চেয়ে কম আতঙ্ককর। তাঁরা রুজেটকে 'ঘৃণায় অন্ধ' ও 'ঠান্ডা যুদ্ধ উসকে দেওয়ার প্রচারক' বলে নিন্দা করলেন।

সার্ত্রের অবস্থানভূমি প্রদর্শন করে পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধগুলিকে ন্যায্য বলে মনে করেন। সার্ত্রের এই অবস্থান অটুট ছিল যখন মার্লোপন্টি কমিউনিজম থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন এবং সার্ত্রে নিজেও সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন পার্টির সঙ্গে। যাদের কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী থাকে তাদের কাছে এটা অপ্রত্যাশিত নয়। সার্ত্রে বলতেন, প্রতিটি কমিউনিস্ট বিরোধীই এক একটি কুকুর। আজও গোঁড়া কমিউনিস্টরা স্টালিন, মাও সে তুং এবং পল পটের গণহত্যা সমর্থন করেন। প্রায়শই তাঁরা এইসব অপরাধের সঙ্গে অল্প স্বল্প অপলাপবাদ যোগ করে বলেন, ব্যাপারটা কিছুটা ঘটেছিল বটে, তবে যতটা বলছে ততোটা নয়। তাছাড়া এর

পিছনে CIAর চক্রান্ত আছে। যেমন ক্ষুদ্রাকার বেলজিয়ান মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলের লুডো মার্টিন গরবাচেভের বিপ্লবের উপর লেখা তাঁর বইতে বলেছেন, স্টালিনের অপরাধ কিছুটা অপ্রতিরোধ্য ভুল, কিছুটা পশ্চিমী গালগল্প ও কল্পনা আর কিছুটা ন্যায্য। এই অনুশোচনাহীন স্টালিনবাদীদের মতে কুলাকদের বিরুদ্ধে স্টালিনের অভিযান প্রয়োজনীয় ও যথাযথ শ্রেণী সংগ্রাম।

এটা মনে রাখা দরকার যে ১৯১৭ থেকে ১৯৮৫ অব্দে সোভিয়েট রাজত্বে খুন হওয়া মানুষের সংখ্যা সরকারী মতে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ এবং আলেকজান্ডার সোলঝনিৎসিনের মতে ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ। মাও সে তুঙের আমলে চীনে খুন হওয়া মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি। এই ৩ কোটি মানুষের রক্ত বিন্যস্ত কমিউনিস্ট অধিগ্রহণ, লং মার্চ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে। সোভিয়েট গুলাগ দ্বীপপুঞ্জের বন্দীশিবিরের মত আজও চীনের বন্দীশিবির আছে অধিকৃত তিব্বতে, পূর্ব-তুর্কিস্থানে ও অন্তঃমঙ্গোলিয়ায়। ১০ লক্ষ তিব্বতী মারা গেছে গণহত্যায়, সুপরিকল্পিত দুর্ভিক্ষে। বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাকরণ চলছে পুরা মাত্রায়, যদিও বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাকরণকে ১৯৪৮ অব্দের গণহত্যা সংক্রান্ত সমাবেশে জাতিসঙ্ঘ ঠান্ডা মাথায় গণহত্যা বলে রায় দিয়েছে। কিন্তু এ সমস্তই চীনা কর্তৃপক্ষ ও তার বিদেশী সমর্থকদের দ্বারা প্রচন্ডভাবে অস্বীকার করা হয়, বা, উড়িয়ে দেওয়া হয় অতিকথন বলে। খান্ডব-দাহন অপলাপবাদীদের মত কমিউনিস্ট অপলাপবাদীরাও মূল বক্তব্যের গুরুত্ব বিনষ্ট করার অভিলাষী। এর মধ্যে তারা অত্যাচারিতদের বক্তব্যের মধ্যে ফাঁক খুঁজে বের করে সেই দিকে জনগণের মন আকর্ষণের প্রচেষ্টা চালায়। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করে কি করে আগ্রাসীদের ভূমিকাকেই উল্টে গৌরবজনক বলে প্রতিপন্ন করা যায়। তাদের মতে তিব্বতীদের সমাজ ও ধর্মতন্ত্র ছিল আধা সামন্ততান্ত্রিক, সেকেলে, এমনকি নরমাংসভোজী ধর্মযুক্ত। মাওবাদে দীক্ষিত হওয়া তিব্বতীদের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ। কমিউনিস্টদের বর্ণনা অনুযায়ী তিব্বতের পূর্ব ইতিহাস নীরস ব্যঙ্গচিত্র মাত্র (A.T.Grounfeld এর The Making of Modern Tibet এই ধরনের বর্ণনার প্রতিনিধিস্থানীয়)। এটা ঠিকই যে তিব্বতীদের সমাজ ও অর্থনীতির আধুনিকীকরণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এর জন্য ওই দেশটি অধিকার অত্যাবশ্যক ছিলনা। কোনও উপনিবেশবাদীদের দ্বারা অধিকৃত না হয়েও যে একটা জাতির উন্নতি সম্ভব তার উদাহরণ তো জাপান। উপনিবেশহীন জাপানের আধুনিকীকরণ যে কোনও ঔপনিবেশিক দেশের চেয়ে দ্রুতগতির। তিব্বতের ক্ষেত্রে ত্রয়োদশ দালাই লামা যে আধুনিকীকরণ আরম্ভ করেছিলেন, প্রতিবছরই তা ত্বরিত হচ্ছিল এবং শেষ পর্যন্ত কোনও অধিগ্রহণ ছাড়াই তিব্বত উন্নত দেশে পরিণত হতো। যাই হোক, এসব কোনও কথাই চীনা আগ্রাসনকারীদের দ্বারা সংঘটিত ধীরগতির গণহত্যাকে সমর্থন করতে পারেনা।

নাৎসী খান্ডব-দাহনের অপরাধীদের মত আমাদের এই কমিউনিস্ট অপলাপবাদীরাও যথেষ্ট উদ্ভাবনা-শক্তিসম্পন্ন। বিশেষতঃ যখন অস্বস্তিকর তথ্য ব্যাখ্যার দায় এদের উপর পড়ে যায়। ১৯৮৯ অব্দে তিব্বত প্রেমিক সাংবাদিক ফ্রানজ বোয়েন্ডার্স যখন লাসার হোটেলে বসে শোনা বহুক্ষণব্যাপী গুলিচালনার বর্ণনা লিখলেন এক প্রতিবেদনে, তখন বেলজিয়াম-চীনা মৈত্রী সঙ্ঘের সভাপতি ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, মিঃ বোয়েন্ডার্স তো তিব্বতী সংস্কৃতি জানেন না। ওটা একটি তিব্বতী উৎসব উপলক্ষে বাজী পোড়ানোর ঘটনা।

কয়েককমাস পরে একজন পলাতক চীনা অফিসার জানালেন, ১৯৮৯ অব্দে তিব্বতে চীনা দমন পীড়ন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। ১৯৮৯ অব্দের এপ্রিলে একটি মাত্র অপারেশনেই খতম করা হয়েছিল ৪৬০ জন তিব্বতীকে।

সোভিয়েট রাশিয়ার বিশাল পতন আজ পর্যন্ত কোনও সোভিয়েট সমর্থকের বিবেককে দংশন করতে পারেনি। মার্ক্সীয় গোঁড়ামীতে অভ্যস্ত অল্প কিছু লোক মনে করেন, এমন কোনও ঘটনাই

ঘটে নি, যার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা প্রয়োজন। একদা কমিউনিজমে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু গোরবাচভের আগেই কমিউনিজম থেকে সরে এসেছেন, এমন কিছু মানুষ তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এই দুর্বৃত্ত পদ্ধতিকে। কিন্তু যাঁরা কমিউনিজমের সঙ্গে বরাবর ছিলেন, সদ্য ঘটে যাওয়া মহাপতন তাদের বিশ্বাসের ভিত নড়িয়ে দিলেও তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অবলম্বন করেছেন এক মধ্যপন্থা, যা মার্ক্সের অচিন্তনীয় ছিল। তাঁরা মার্ক্সবাদ বিরোধী যে কোনও মন্তব্য এড়িয়েই চলেন। যাঁরা বরাবরই মৃদু বামপন্থী, সোভিয়েট রাশিয়ার পতনের পর তাঁরাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করেন। যেমন সাম্যবাদী খ্রীষ্টান ও মুক্তচিন্তার তত্ত্ববিদরা। তাঁরা এখনও ব্যক্তিসম্পত্তির অবসানের জন্য মাঝে মাঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত করেন শান্তিবিক্ষোভ। ভাবখানা এমন, তাঁরা যেন কোনও দিন লি পেং বা সাদ্দাম হোসেনের নাম শোনেননি। তাঁরা অবশ্য খোলাখুলিভাবে ঐতিহাসিক তথ্যাবলী অস্বীকার করেন না। তাঁদের কৌশল হলো এসব ব্যাপার উপেক্ষা করা। তাঁরা আগেই মতই সোভিয়েট পদ্ধতিতে আস্থাবান। তাদের সহধর্মীদের প্রতি সোভিয়েট তাড়নাকে তারা ছোটখাটো বিচ্যুতি ছাড়া বেশী কিছু ভাবতে রাজী নন। কয়েক দশকব্যাপী সোভিয়েট তাড়নাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাদের নেই। সমগ্র কমিউনিস্ট বিরোধী বক্তব্যকে তাঁরা আজও প্রতিক্রিয়াশীল ও ঠাণ্ডাযুদ্ধের বুকনী বলে উড়িয়ে দিতে তৎপর।

বহুবছর ধরে অসমালোচিত প্রচার শুনে যে সমস্ত অলস প্রকৃতির মানুষ বামপন্থী হয়েছে তাদের চিন্তার কোনও পরিবর্তন ঘটবে না--যতদিন না কমিউনিজমের গায়ে ফ্যাসীবাদের তকমা লাগবে।

ইসলামী অপলাপবাদ

কোনও ফিলিস্তিনীয় সংস্থা সরকারী ভাবে নাৎসী খাণ্ডব-দাহন সম্পর্কে অপলাপবাদ প্রচার করে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু বিদেশে কিছু ফিলিস্তিনীয়দের সঙ্গে কথাবার্তায় তাদের অপলাপবাদী মানসিকতা সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। সিরিয়া ও ইরাকের বাথ পার্টি গড়ে উঠেছিল মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট পার্টির আদলেই। স্যার মুহাম্মদ ইকবাল মুসোলিনীরপ্রশংসা করে একটা কবিতাও লিখেছিলেন। যুগোশ্লাভিয়ার মুসলমানরা হাত মিলিয়েছিল ক্রোয়েশিয়ার ফ্যাসীবাদী রাজের সঙ্গে। তাদের প্রধান মুফতি ফ্যাসীবাদী উসতানা সৈন্যদলে যোগদান করতে বাধ্য করেছিল তাদের। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন মুসলিম জাতি (তাতার, চেচেন, কালমুঘ, ইংগুজ ইত্যাদি) ফ্যাসীবাদীদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ চালিয়েছিল রুশ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে। জেরুজালেমেরপ্রধান মুফতি হিটলারের সঙ্গে এক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কারণ, তিনিও চেয়েছিলেন ইহুদীদের হাত থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে। ধরা যাক, এ সবই ঘটেছিল নাৎসীবাদের প্রকৃতি ও পরিণতি সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতার জন্য। অথবা, যারা বিশ্বাস করে যে উপনিবেশবাদী শক্তি চিরকাল গণহত্যা চালিয়ে এসেছে তাদের ফ্যাসীবিরোধীতায় বিশ্বাস করার কোনও হেতু নেই, এই বিবেচনায়। তা হলেও দেখা যায় যুদ্ধোত্তর ইসলাম জগতে ইহুদীদের বিরুদ্ধে নাৎসীসুলভ প্রচার যথেষ্টই পুনঃপ্রচারিত হচ্ছে এবং এর কোনও ওজর নেই।

করাচী ভিত্তিকইসলামিক অর্ডার পত্রিকার ১৯৮৯ অব্দের প্রথম সংখ্যায় আওসাফ সৈদ ওয়াস্তি একটি প্রবন্ধ লিখেছেনঃ সতর্ক হও, সতর্ক হও আরাফত। রচনাটি দিল্লীর রেডিয়ান্স পত্রিকার সৌজন্যে প্রকাশিত। যার অর্থ, অন্ততঃ দুটি ইংরেজী ভাষার ইসলামী পত্রিকায় প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে। মুসলিম জনসাধারণের নিকট পরিবেশনের জন্য এটি নিশ্চয় একমাত্র প্রবন্ধ নয়। জনাব ওয়াস্তির মতে ইহুদীবাদের সূত্র দুটি গ্রন্থঃ তালমুদ এবং দি প্রোটোকল অফ দি সেজেস অফ জিয়ন।

তালমুদ অবশ্যই ইহুদীদের একটি প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এটি তেনাখ বা ওল্ড টেস্টামেন্টের ব্যাখ্যা ও

টীকা। তালমুদকে কেন্দ্র করেই বর্তমান ইহুদীধর্ম গড়ে উঠেছে। তালমুদ ওল্ড টেস্টামেন্টের বহুত্ববাদী ব্যাখ্যা। এই একাধিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও স্বীকার করা হয়েছে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধির করার জন্য কোনও ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয়। এই ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে আছে আক্ষরিক, রূপক, রহস্যবাহী ইত্যাদি। তালমুদের মধ্য দিয়ে উগ্র ইহুদীধর্ম তার সংকীর্ণ পরাকরণমনস্কতার খোলস (সে খোলস কুড়িয়ে নিয়ে গেছে খ্রীষ্টধর্ম আর ইসলাম) পরিত্যাগ করে যুক্তি ও মানবতাবাদী হয়ে উঠেছে। খুলে গেছে ইহুদীধর্মকে ব্যাখ্যা করার বৌদ্ধিক অধিকারের পথ। অপরপক্ষে ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম ওল্ড টেস্টামেন্টের পরাকরণমনস্কতাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছে সংকীর্ণ পরাকরণপ্রবণতা। তাদের কাছে স্ব স্ব ধর্মই শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র সত্য। অন্য সব ধর্ম মিথ্যা ও ধ্বংসযোগ্য।

জনাব ওয়াস্তির নিবন্ধের চমকপ্রদ দিক হলো তিনি প্রোটেকল অফ দি সেজেস অফ জিয়ন কে যাবতীয় ইহুদী ক্রিয়াকর্মের সূত্র বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু প্রোটোকল অফ দি সেজেস অফ জিয়ন ইহুদীদের দুনিয়া দখলের চক্রান্তকারী রূপে প্রতিপন্ন করার জন্য জারের গুপ্ত পুলিশের দ্বারা রচিত একটি জাল পুস্তক বলে এখন প্রমাণিত । এই সত্য অস্বীকার করে জনাব ওয়াস্তি ইহুদীদের চক্রান্তকারীরূপে প্রতিপন্ন করার জন্য ভুরি ভুরি উদ্ধৃতি দিয়েছেন ওই পুস্তক থেকে। যেমনঃ আমাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ অজস্র--উচ্চাকাঙ্খা, জ্বলন্ত লোভ, নির্দয় প্রতিশোধ, ঘৃণা আর বিদ্বেষঃ আমাদের কাছ থেকে সর্বদা নির্গত হয় সর্বগ্রাসী সন্ত্রাস.....এইসব কর্মের দ্বারা সব দেশ অত্যাচারিত হয়। যতক্ষণ না আমাদের আন্তর্জাতিক সুপার গভর্ণমেন্টকে সবাই হাটু গেড়ে স্বীকৃতি জানায়, ততোক্ষণ আমরা কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবনা।

বিদেশ থেকে ইহুদীদের তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাবলীর একটি তালিকা দিয়েছেন জনাব ওয়াস্তি। শেষে প্রশ্ন তুলেছেন, এসব ঘটনাগুলি ঘটেছিল কেন?

এরপর তিনি মদিনাতে ঘটে যাওয়া হজরত মুহাম্মদের সঙ্গে ইহুদীদের সংঘর্ষের কথা স্মরণ করে বলেছেন, এগুলিই প্রমাণ করে ইহুদীরা অত্যন্ত পাজী। এবং তারা বরাবরই এই ধরনের বদমাস। তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের বিপ্লব, যার ফলে পৃথিবীতে খলিফাপদের অবসান ঘটেছিল, সেটা ইহুদী ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি বলশেভিক বিপ্লবও ইহুদীদের মস্তিষ্কপ্রসূত।

এইসব চমকপ্রদ অভিযোগমালা নিছক ইহুদী বিদ্বেষের পরিচয় ছাড়া অন্য কিছুই নয়। খান্ডবদাহনের অপরাধ ছাড়া অন্য এক ধরনের আগ্রাসী অপলাপবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে মুসলমানরা। এটির সঙ্গে ইসলাম সরাসরি যুক্ত। তুরস্কের ছোট বড় সব মুসলমানই প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন আর্মেনীয় গণহত্যাকে অস্বীকার করে। শেষ খলিফার জেহাদ ঘোষণার ফসল এই গণহত্যা। ১৯৭৪ অব্দে জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট থেকে আর্মেনীয় গণহত্যার পরিচ্ছেদটি বাদ দেওয়ার দাবী তোলেন তুরস্কের প্রতিনিধি। তুরস্ক তখন ছিল উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (NATO) অন্তর্ভুক্ত দেশ। সুতরাং পশ্চিমী দেশসমূহ কোনও আপত্তি তুললেন না এ ব্যাপারে। পরিচ্ছেদটি বাদ চলে গেল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে জাতিসঙ্ঘ এবং ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট আর্মেনীয় গণহত্যাকে নিন্দা করে আবার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। আর তুরস্কের সরকার সেই গণহত্যা কে অস্বীকার করে চলেছে।

পরে অধ্যায়ে আমরা দেখবো আর্মেনীয় গণহত্যাই মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত একমাত্র ইসলামী গণহত্যা নয়। ইসলামী অপলাপবাদীরা একটিমাত্র গণহত্যা অস্বীকার করছে না। তারা অস্বীকার করছে অন্যান্য অনেক গণহত্যার কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতে অপলাপবাদ

নাৎসীদের অপরাধ সংক্রান্ত অপলাপবাদ এখন সারা বিশ্ব জুড়ে আলোচিত। আর্মেনীয় গণহত্যা সংক্রান্ত তুর্কী অপলাপবাদ এখন নজর কেড়েছে অনেকের। ভারতের নিজস্ব অপলাপবাদের কথা কিন্তুপৃথিবীর অল্প লোকই জানে।

সহস্র বৎসরব্যাপী হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করে নতুন করে ভারতের ইতিহাস লেখার প্রবণতা ১৯২০ অব্দ থেকেই চলেছে। আজকাল বেশীভাগ রাজনীতিবিদ ও ইংরেজী জানা বুদ্ধিজীবিরা এই সুদীর্ঘ ও যন্ত্রণাকর দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কিছু উল্লেখমাত্র দারুণভাবে ক্ষেপে ওঠেন। হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে 'সাম্প্রদায়িক সৌভ্রাত্রের' মায়া-ইতিহাস সৃষ্টি করার জন্য তাঁরা যে কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত।

হিন্দু বনাম মুসলিম

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক সৌভ্রাত্রযুক্ত ইতিহাস জনসাধারণকে বোঝানো খুব কঠিন ব্যাপার। মুসলমানদের দ্বারা তাড়িত হিন্দুদের সংখ্যা নাৎসীদের দ্বারা বিনষ্ট মানুষের সংখ্যার চেয়ে কম নয়। যদিও ইসলামী জেহাদের দ্বারা নিহত মানুষের সঠিক সংখ্যা আজ পর্যন্ত কেউ নির্ণয় করেন নি। কিশোরী শরণ লাল Indian Muslims, Who are they? পুস্তকে ইসলামী সূত্র থেকে কয়েকটি গণহত্যার বলির সংখ্যা তালিকাভুক্ত করেছেন। এই বলির সংখ্যার সম সংখ্যক ছিল ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের সংখ্যা--যারা মুসলিম হারেম বা ক্রীতদাসের হাটে স্থান পেয়েছিল। এছাড়া আছে বহু শতাব্দী ব্যাপী পীড়ন ও সংস্কৃতির ধ্বংস সাধন। মার্কিণ ঐতিহাসিক উইল ডুরান্টের ভাষায়, "ইসলামের ভারত বিজয় ইতিহাসের রক্তাক্ততম অধ্যায়। এ এক হতাশাব্যঞ্জক কাহিনী, যে কাহিনীর নিগদিত সার হচ্ছে সভ্যতা এক মহামূল্যবান বস্তু, যার শান্তি, শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির পেলব পরিমন্ডল এক মুহূর্তের মধ্যে বহিরাগত বা অন্তস্থিত বর্ধমান বর্বরদের আক্রমণের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।"

ইসলামী তাড়না মাঝে মাঝে গণহত্যায় পৌঁছে গেলেও এই তাড়নার ভৌগলিক ও কালের মাত্রা নাৎসী গণহত্যার চেয়েও ব্যাপকতর। মাত্র কয়েক বছরের নাৎসী বর্বরতায় নাৎসী দলের অধিকাংশ সদস্য সমেত সমগ্র জার্মান জাতি সন্ত্রস্ত্র হয়ে উঠেছিল। নাৎসীদের কাছে Gott mit uns (ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন) ছিল নিতান্তই একটি ধ্বনি মাত্র। কিন্তু মুসলমানদের কাছে ওই একই বাক্য একটি দৃঢ় ধর্মীয় প্রত্যয়। এবং এই প্রত্যয় মুসলমানদের বিবেককে বহুশতাব্দী ধরে পরিষ্কার করে রেখেছে। আমরা মানবতার বিরুদ্ধে নাৎসী ও ইসলামী অপরাধের মধ্যে নানা সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখবো। কিন্তু মূল বৈসাদৃশ্য অবশ্যই ইসলামী কর্মকান্ডের স্থায়ীত্ব--যার বলে চোদ্দশো বছর ধরে ইসলামী নিপীড়ন পৃথিবীর বুকে চলে আসছে। এর কারণ ইসলামী নিপীড়নের মানসিক শক্তি--ইসলাম বিশ্বাসীদের উপর সুদৃঢ় মানসিক আধিপত্য। নাৎসীবাদ সে তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ। ইসলামী অভিযানের তাত্ত্বিক ভিত্তি নাৎসীবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির সমতুল। মুসলিম আক্রমণকারীরা পৃথিবীর তাবৎ মানুষকে তিনটি বর্গে বিভক্ত করেছে। প্রথম বর্গের মানুষ অবশ্যই মুসলিমরা। তারা হচ্ছে herrenvolk অর্থাৎ মনিব-জাতি। যাদের আল্লাহ্ গোটা পৃথিবী অর্পণ করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে খ্রীষ্টান ও ইহুদীরা। তারা দ্বিতীয় বর্গের নাগরিক হিসাবে মুসলিম দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে পারে। হিটলারের রাজত্বে স্লাভদের Untermenschen (হীন জাতি) হিসাবে দ্বিতীয় বর্গের বলে গণ্য করা হতো। তৃতীয় বর্গে আছে মালাউন (অভিশপ্ত) পৌত্তলিকরা--পৃথিবীর বুক থেকে যাদের

অস্তিত্ব মুছে ফেলা দরকার।

নাৎসীদের শিকারের মৃত্যু ছাড়া গতি থাকতো না। কিন্তু ইসলামের শিকারের একটা গতি আছে--তারা ইসলামায়িত হয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ প্রায়ই পায়। হজরত মুহাম্মদ চাইতেন শেষ পয়গম্বর হিসাবে তাঁর স্বীকৃতি। সেজন্য ইসলামায়িত হয়ে তাঁকে সেই স্বীকৃতি দিলেই শান্তিতে বসবাস করা যেত। তাঁকে অস্বীকৃতির পরিণাম ছিল মৃত্যু। তবুও বহু সময় ইসলামায়িত হবার আগেই জুটতো ক্রীতদাসত্ব। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্টালিনের সঙ্গে মুহাম্মদের একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। দুজনেই মানুষ খুন করতেন তাদের জাতিত্বের জন্য নয়, তাদের অভিমতের জন্য। হিটলার খুন করতেন শুধু মাত্র ইহুদী বা জিপসী হওয়ার অপরাধে। তবে এক স্বৈরাচারী থেকে অন্য স্বৈরাচারীকে পৃথক করা অপ্রয়োজনীয়।

ইসলামের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী সৈন্যদের ঝটিকা আক্রমণ বিশাল সাফল্য লাভ করে। তার কারণ, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় পৌত্তলিকদের ইসলাম গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনও গতি ছিলনা। নব ইসলামায়িতদের মধ্যে যত ক্ষোভই থাকুক না কেন, তাদের সন্ততিরা মুসলিম মানসিকতা নিয়েই বড় হতে লাগলো। ইসলামের সত্তার সঙ্গে মিশে যেতে লাগলো তাদের নিজস্ব জাতি সত্তা। কয়েক পুরুষের মধ্যে তারা ভুলে গেল ইসলামায়নের জন্য সেই বলপ্রয়োগের ঘটনা। এবং সেই সব অঞ্চল হয়ে গেল heidenfrei (পৌত্তলিকতাশূন্য), যেমন হিটলার চেয়েছিলেন জার্মানী হোক Judenfrei (ইহুদীশূন্য)। ভারতের ঘটনাবলী অবশ্য অতদূর অগ্রসর হলোনা। কারণ, মুসলমানরা পাঁচশো বছর চেষ্টা করে ভারতের কিছু অংশ মাত্র অধিকার করতে পেরেছিল। সে কাজে তাদের সন্মুখীন হতে হয়েছিল অজস্র প্রতিরোধের। এবং বহুক্ষেত্রেই তাদের সন্ধি স্বীকার করার প্রয়োজন ঘটতো। ১৬০০ অব্দ পর্যন্ত মুসলিম বিজয় হিন্দুদের কাছে জীবন-মরণ যুদ্ধ ছিল। মুসলিম আক্রমণে পুরো শহর পুড়িয়ে দিয়ে সমস্ত অধিবাসীদের হত্যা করা হতো। প্রতিটি অভিযানে শয়ে শয়ে লোক মরতো। সমসংখ্যক লোককে ক্রীতদাস করে চালান দেওয়া হতো অন্যত্র। প্রতি আক্রমণকারী আক্ষরিক অর্থেই হিন্দুদের মাথার খুলি দিয়ে পর্বত বানাতো। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্থানে মুসলিম আক্রমণের ফলে সমস্ত হিন্দুরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ওই অঞ্চল আজও হিন্দুকুশ নামে পরিচিত। হিন্দুকুশ শব্দের অর্থ হিন্দু হত্যাকারী। মধ্য ভারতের বাহমনী সুলতানরাও বছরে এক লক্ষ হিন্দু হত্যার নিয়ম করেছিল। ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুর লঙ একদিনেই হত্যা করেছিল এক লক্ষ বন্দীকে।১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্য অধিকারের ফলে কর্ণাটকের বিশাল অঞ্চল জনশূন্য হয়ে যায়। এমনই সব অজস্র ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ভারতীয় পৌত্তলিকদের সংখ্যাও যেমন অগুন্তি তেমনই তারা অদম্য।

অনেকের মতে ভারতের ইতিহাসে মুসলিম যুগ বলতে যা বোঝায় তা হলো বিদেশী মুসলিম শাসকবর্গের বিরুদ্ধে স্বদেশীয়দের অবিরাম যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মুসলিমরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরাজিত হয়। এই অদম্য পৌত্তলিকদের সম্পূর্ণ বিরোধিতা না করে মুসলিম শাসকেরা একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। সেই মধ্যপন্থা হলো হানাফী স্মৃতিশাস্ত্র অবলম্বন। হানাফী স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে পৌত্তলিকরা জিজিয়া করের বিনিময়ে জিম্মি হিসাবে কুড়ি রকম হেনস্তার মধ্যে ইসলামী রাজ্যে বাস করতে পারে। এই সুবিধা আগে শুধুমাত্র ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত ছিল (যদিও হানাবলী স্মৃতিশাস্ত্রে বিশ্বাসী মুসলমানরা এই ব্যবস্থারও বিরুদ্ধাচরণ করে)। এই সুবিধার জন্যই কোনও কোনও ইসলামী দেশে আজও কিছু ইহুদী বা খ্রীষ্টান দেখা যায়। কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাক্ষাৎ একেবারেই মেলেনা।

জিজিয়া করের শর্তে কিছু কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দু মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হয়ে যায়।ফলে একটা কাজ চলা গোছের ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এতৎসত্ত্বেও কেবলমাত্র আলোকপ্রাপ্ত

সম্রাট আকবর জিজিয়া ও আপত্তিকর প্রথাসমূহ বাতিল করে দেওয়ার পরই মুঘল আমলে রাজপুত ও নবাবী আমলে কায়স্থদের সঙ্গে মুসলিম শাসকদের কাজকর্ম অনায়াসসাধ্য হয়।

এই হানাফী আইনের জন্য বহু মুসলমান ভারতে গণহত্যা চালানোর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পান। যদিও এর জন্য তাঁদের ঘন ঘন গালাগাল খেতে হয়েছিল মৌলবাদীদের কাছ থেকে। এছাড়া তুরানী ও আফগান আক্রমণকারীরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে দিয়েছে বহুক্ষেত্রে। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে অভিশপ্ত কাফেরদের সাহায্য নিয়ে কাঁচিয়ে দিয়েছে স্বধর্মী শত্রুর পাকা ঘুঁটি। এ ছাড়া শস্যশ্যামলা উপমহাদেশে রাজ্য অধিকারের পরে জেহাদী আক্রমণের ধার কমে গেছে সর্বদা। পৌত্তলিকদের ধ্বংস করার পরিবর্তে সম্পদশালী দেশে পৌত্তলিকদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করে সুখে রাজত্ব করাটাকে বেশী সুবিধাজনক ও আকর্ষণীয় মনে করেছে মুসলিম শাসকেরা। এইসব সাম্রাজ্যবাদী মুসলিম শাসকদের প্রচেষ্টা সীমিত ছিল ইসলামায়নের জন্য নানারকম জাগতিক লোভ দেখানো এবং মোল্লা ও সুফিদের পৃষ্ঠপোষণার মধ্যে। আবার কেউ কেউ ইসলামায়নে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। কারণ, তার ফলে জিজিয়া করের বিলোপ হতো এবং তাতে কমে যেত রাজস্ব আদায়। মুসলিমদের বিধ্বংসী রূপ প্রদর্শিত হতো অসংখ্য বিদ্রোহ দমনের সময়, মন্দির ধ্বংসের ক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার ও অপমান করার সময় এবং বিচ্ছিন্নভাবে ছোট খাটো মুসলিম লুটেরা দলের অত্যাচারের মধ্যে। এইসব লুটেরা দলের অত্যাচারের জন্যই উত্তর ভারতের হিন্দুরা বিয়ের সময় পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে রাতের বেলা বিয়ের অনুষ্ঠান করে। কারণ, দিনের বেলা কনে তুলে নিয়ে যাওয়া মুসলমানদের একটা ক্রীড়া হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ শাসন ভারতের মাটিতে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ভারতের মাটিতে শেষ জেহাদ করেছিলেন টিপু সুলতান। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহে প্রায় অচল মুসলিম রাজবংশসমূহ বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করার জন্য হিন্দু প্রজা ও প্রতিবেশীদের সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা চালায়। উদাহরণ স্বরূপ অযোধ্যার নবাব হিন্দুদের মুসলমান-বিরোধিতা প্রশমিত করে দুজনের সমশত্রু ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের রাম জন্মভূমি-বাবরী মসজিদ প্রাঙ্গন ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ভারতের আধুনিক ইতিহাসে এই একটিবার মাত্র মুসলমানরা হিন্দুদের কিছু ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছিল। এর পর থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার তাগিদে যা কিছু ত্যাগ স্বীকার তা করেছে হিন্দুরাই।

১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পরে ভারতের মুসলমানরা হতাশার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। এর সঙ্গে ছিল তাদের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরাগজনিত পশ্চাদমুখীনতা ও অতীতের স্মৃতিপরায়ণতা। শিক্ষিত হিন্দুরা যখন ধর্মেতর জাতীয়তাবাদ আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছে, মুসলমানরা তখন সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নিজেদের নিবদ্ধ রেখেছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভারসাম্য রচনার উদ্দেশ্যে ব্রিটীশরা যখনই তাদের রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে টেনে নিয়ে এলো (১৯০৬ অব্দে মুসলিম লীগের সৃষ্টি হলো), তখনই তারা বিভিন্ন ক্ষতিকর দাবী জানাতে আরম্ভ করলো হিন্দুদের বিরুদ্ধে। যেমন, খুশীমত গোহত্যা করার অধিকার। সঙ্গে সঙ্গে তারা আরম্ভ করলো বিচ্ছিন্নতার রাজনীতিও। প্রথমে তারা হস্তগত করলো পৃথক নির্বাচকমন্ডলী--যেখানে মুসলমান প্রার্থীরা শুধুমাত্র মুসলমান ভোটারদের ভোটেই নির্বাচিত হবে। পরে তারা ভারতভূমি থেকে পৃথক করলো এক মুসলিম রাষ্ট্র।

বিশের দশক থেকে তারা দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য ও অত্যাচার করার জন্য ব্যাপকভাবে পেশী শক্তি ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। হিন্দুরা যখন প্রত্যাঘাত করতো তখন ব্যাপারটা তাদের কাছে লাভজনক হয়ে উঠতো। কারণ, তখন তারা সাধারণ মুসলমান, যারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী,

তাদের কাছে প্রতিরোধটাকেই আক্রমণ বলে অভিক্ষেপিত করতো।

এইভাবে দাঙ্গা বাঁধিয়ে তার প্রত্যাঘাতে হননক্রিয়া আহ্বান করে মুসলিম লীগ বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে তাদের সমর্থক বানিয়ে দেশবিভাগ করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তান নামক ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য দেশবিভাগ সমেত মোটামুটি ৬০০,০০০ মানুষের জীবন মূল্য হিসাবে প্রদান করতে প্রস্তুত হয় মুসলিম লীগ। যদিও দাঙ্গায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি হিন্দু ও মুসলমান তাদের বাড়াবাড়ির জন্য দায়ী, তবুও এই ব্যাপক নর-হত্যার সামগ্রিক দায়টা অবশ্যই মুসলিম নেতাদের।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও কাশ্মীরে হিন্দুদের তাড়না করার ঘটনা সমানে চলছে। সেই সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত ভাবে আলোচনার স্থান অন্যত্র। যদিও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলি এইসব ব্যাপার এড়িয়েই চলে। তবে কয়েক কথায় ঘটনাগুলির পরিচয় দেবার জন্য ওইসব ইসলামী দেশ থেকে হিন্দু বিতাড়নের চিত্রগুলি দেওয়া যেতে পারে। ১৯৪৮ অব্দে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দু জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ। ১৯৭১ অব্দে ওই অঙ্ক নেমে দাঁড়ায় ১৫ শতাংশে, আর এখন ১০ শতাংশ।

কোনও সাংবাদিক বা মানবাধিকার সংস্থা বাংলাদেশের হিন্দুদের গিয়ে শুধায় না তারা মুসলিম কর্তৃপক্ষ বা মুসলমানদের কাছ থেকে সাধারণভাবে কেমন ব্যবহার পাচ্ছে। ১৯৯০ অব্দের প্রথম কয়েক মাসে কাশ্মীরের সমস্ত হিন্দুদের (প্রায় আড়াই লক্ষ) কাশ্মীর থেকে বিতাড়ন করা হয়। সেখানকার মুসলিম সংবাদপত্রসমূহ ও মসজিদের মাইক থেকে পরামর্শ দেওয়া হয় হিন্দুদের বুলেট অথবা দেশত্যাগ, যে কোনও একটি বেছে নিতে।

এখন এটা স্পষ্ট যে ইসলাম সম্পর্কে হিন্দুদের মনে কোনও ভাল অনুভূতি নেই। অপলাপবাদের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য এই ব্যাপারে কিছু একটা করা।

অপলাপবাদ ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

অপলাপবাদের পথে প্রথম পা দেওয়ার রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত অবশ্যই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। এই আন্দোলনের প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার অনৈক্য দূর করা প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়েছিল। ১৯১৯-২৩ অব্দের মধ্যে ঘটেছিল খেলাফৎ আন্দোলন। ঐ সময় অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ইসলামের পবিত্র তীর্থসমূহ ব্রিটীশ অধিগ্রহণ করে। খেলাফত আন্দোলনকারীরা দাবী করে ঐ সমস্ত স্থানের উপর খলিফার পুনরাধিকার। কংগ্রেস স্থির করে ওই সুযোগে মুসলমানদের ব্রিটীশ বিরোধী করে জাতীয় আন্দোলনে যূথবদ্ধ করবে।

এটা একটা বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্ত। মৌলবাদী খেলাফৎ আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সত্তাই দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল। মুসলিম মানসে যথারীতি বিবর্জিত ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। এই আন্দোলনের ফলে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ ও পাকিস্তান তত্ত্বই বেশী বিকাশলাভ করেছিল। কিন্তু ১৯২৩ অব্দে তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক খলিফার পদটিই তুলে দিলেন। সুতরাং খেলাফৎ আন্দোলনের কারণই বিনষ্ট হয়ে গেল এবং আন্দোলন রূপান্তরিত হলো হিন্দু বিরোধিতায়। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কংগ্রেসীদের প্রত্যাশা ছিল অসীম। তারা হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছিন্নতা নির্মূল করার জন্য যে কোনও কিছু উদ্ভাবন করতে প্রয়াসী ছিল। যেমন, 'হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বহুশতাব্দীব্যাপী মিত্রতা'। ঐ সময় কংগ্রেসের নেতারা নতুন করে ইতিহাস রচনা করার প্রচেষ্টা চালাননি। তাঁরা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের কুৎসিত ইতিহাস অবজ্ঞা করেই ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু ১৯৩১ অব্দের কানপুর দাঙ্গার পর কংগ্রেসের এক রিপোর্টে প্রস্তাব করা হলো হিন্দু-মুসলিম শত্রুতার ঘটনাকে গোপন করে দিয়ে নতুন করে ইতিহাস রচনা করতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদের পরবর্তী প্রজন্ম, বিশেষ করে বামপন্থীরা,

যারা কংগ্রেসকে তিরিশের দশক থেকে প্রভাবিত করতে আরম্ভ করেছিল এবং পঞ্চাশের দশকে কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে, তারা প্রবলভাবে আশ্রয় করে অপলাপবাদ। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন যে ইসলাম মানুষের মধ্যকার পার্থক্য দূর করে ও সাম্য আনার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক মিশন পূর্ণ করেছেন। এবং এর জন্যই ইসলামকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ভারতের নিম্নবর্ণের মানুষেরা। যদি আদৌ কোনও বলপ্রয়োগ হয়ে থাকে তা প্রগতিশীল শক্তি ও প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে শ্রেণীযুদ্ধ। এখানে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বোঝানো হচ্ছে।

এটা হচ্ছে একটা মিথ্যা ধারণা, যা সত্য বলে বহুল প্রচারিত। এটার উৎস জাতিবিভাগের একটা অসত্য ও বিবর্ণ চিত্র। আধুনিক শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বকে পিছনে টেনে নিয়ে গিয়ে সমসাময়িক ইসলামী অপলাপবাদীদের বাক্যকে হুবহু সত্য ধরে নিয়ে তার সঙ্গে কিছু সমাজবাদী তত্ত্ব মিশেল করে এক বিবর্ণ চিত্র নির্মিত হয়েছে। নিম্নবর্ণের মানুষেরা ইসলামকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এরকম কোনও তথ্য কোথাও পাওয়া যায়না। মুসলিম সেনানায়কদের মনে সাধারণ মানুষদের প্রতি ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছু ছিলনা। এ কথা যেমন আরবের মরুভূমির ক্ষেত্রে সত্য তেমনই সত্য এই পৌত্তলিকদের দেশেও। এখানকার সাধারণ মানুষেরা অভিশপ্ত মুশরিক পৌত্তলিক। মুসলমানরা কোনও দিন ধনী পৌত্তলিক আর গরীব পৌত্তলিকদের পৃথক করেনি। কোরানে আল্লাহ্ সমস্ত পৌত্তলিকদের ক্ষেত্রে একই বিধান দিয়েছেন।

পরন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এইসব সাধারণ মানুষেরা বিদ্রোহ করেছে শুধুমাত্র ভূমি রাজস্বের (আলাউদ্দিন খলজী, যাঁকে কিনা আজকালকার সমাজতন্ত্রবাদীরা সমাজতন্ত্রের বীজপুরুষ বলে ঘোষণা করে, তাঁর আমলে ভূমিরাজস্ব ছিল উৎপাদনের অর্ধাংশ) বা ভূমি দখলের বিরুদ্ধে নয়। বিদ্রোহ করেছে তাদের শিশুদের ধরে ধরে ক্রীতদাস বানানোর জন্য, স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণ করার জন্য এবং আরাধ্য দেবতার মূর্ত্তি ভাঙ্গার জন্যও। এইসব কুকর্মের বিস্তৃত বিবরণ সমসাময়িক সভা-ইতিহাসকাররা সগৌরবে বর্ণনা করে গেছেন। আর সেই সব রচনার মধ্যে কোথাও গরীব ও ধনী হিন্দুদের মধ্যে, উচ্চশ্রেণীর কাফের ও নিম্নশ্রেণীর কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করার কথা নেই। এমনকি উচ্চশ্রেণীর মানুষরা যখন শাসকদের তাঁবেদারী করছে, তখন নিম্ন শ্রেণীর মানুষরাই জঙ্গলের আড়াল থেকে অতর্কিতভাবে গেরিলা কায়দায় আঘাত হেনে মুসলিম শাসকদের ব্যতিব্যস্ত করেছে। তাদের কদাচ শান্তিতে থাকতে দেয়নি। নিম্নবর্গের মানুষদের ইসলামায়ন তখনই সম্ভব হয়েছে যখন শাসকেরা মোটামুটি শঙ্কাহীন হতে পেরেছে। নানারকম পুরস্কার কর মকুব, মামলা-মকদ্দমায় সুবিধা এবং চাপ প্রয়োগ এ সমস্তই ছিল ইসলামায়নের পদ্ধতি। এতৎসত্ত্বেও মানবেন্দ্র নাথ রায় প্রচারিত মিথ্যা ধারণা এখনও বেশ প্রচলিত।

কংগ্রেসী অপলাপবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক অবশ্যই পন্ডিত জওহরলাল নেহরু। ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি প্রায় অশিক্ষিতই ছিলেন বলা যায়। সুতরাং তাঁর স্তাবকেরা সন্দেহের অবকাশে তাঁর মুক্তির দাবী তুলবেন। যে কোনও বিচারই বলে তাঁর ইতিহাস-চর্চা হচ্ছে মুসলিম অত্যাচারীদের মহীয়ান করে তোলার এবং তাদের মানবিকতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধগুলি অস্বীকার বা গোপন করার কতকগুলি কাঁচা বর্ণনা। গজনীর মাহমুদের সভা ইতিহাসকার উথবী লিখেছেন, মাহমুদ মন্দির নগরী মথুরার প্রশস্তি গাইলেন এবং পরক্ষণেই সেই মন্দির নগরী ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। নেহরু উথবীর রচনার নিষ্ঠুর ব্যঞ্জনা লক্ষ্য না করে ভাবলেন ধ্বংসকারী গজনীর মাহমুদ মন্দির নগরীর প্রশস্তিই গেয়েছেন। নেহরু লিখলেন:

"সৌধসমূহ মাহমুদকে আকৃষ্ট করতো। মথুরা শহর দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। মথুরা

সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বিশ্বাসীদের দৃঢ় বিশ্বাসের মত এখানে আছে সহস্র সুদৃঢ় অট্টালিকা। শহরের এই সুদৃশ্য অবস্থায় উপনীত হতে নিশ্চয় বহু কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। দুশো বছরের আগে এমন একটা শহর নির্মাণ করা সম্ভব হবেনা।"

জওহরলাল অস্বীকার করলেন যে মাহমুদের বিধ্বংসী আক্রমণের পিছনে কোনও ধর্মীয় মানসিকতা কাজ করেছে। তিনি লিখলেন, মাহমুদ কোনও ধার্মিক ব্যক্তি নন, ঘটনাক্রমে তিনি একজন মুসলমান। তিনি প্রথমতঃ একজন যোদ্ধা এবং একজন বীর যোদ্ধা।

কিন্তু মাহমুদ সচেতনভাবেই একজন ধার্মিক ব্যক্তি। সমকালে মাহমুদের ভারত আক্রমণের ধর্মীয় লক্ষ্য সম্বন্ধে উথবী লিখেছেন, নিজের আত্মার কল্যাণের জন্য প্রতিদিন রাতে কোরান কপি করতেন তিনি। পৌত্তলিকদের ত্রস্ত ও অপমানিত করার জন্য লুণ্ঠন করার মত কিছু নেই এমন মন্দিরও তিনি আক্রমণ করতে গিয়ে বহুবার নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলেন।পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে প্রতিটি অভিযানের সময় তিনি কোরান থেকে যথাযথ উদ্ধৃতি দিতেন। ভারতের সাধারণ মুসলমানরা তাঁকে ইসলামের বীর যোদ্ধারূপে বর্ণনা করেন এবং তাতে ইতিহাসের প্রতি সুবিচারই হয়।সাধারণ মুসলমানরা জওহরলালের মত অপলাপবাদী নন।

আলিগড় মতধারা

ইসলামী অপলাপবাদের দ্বিতীয় সূত্র হলো শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে পশ্চিমী ধ্যান ধারণার অনুপ্রবেশ। এই শিক্ষিত মুসলমানদের অভ্যুদয় মোটামুটি দুটি শিক্ষায়তনকে কেন্দ্র করে। দুটির একটি প্রথাগত ইসলামী শিক্ষার, অন্যটি পশ্চিমী শিক্ষার। একটি দেওবন্দের ইসলামী তত্ত্ব শিক্ষাকেন্দ্র, অন্যটি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।

দেওবন্দের দার-উল-উলুম-দীন গোঁড়া ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র। এই ধারা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ইত্যাদি আধুনিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করেনা। এই ধারার মতে ভারতবর্ষ একদা দার-উল-ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র ছিল। সুতরাং এটিকে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অমুসলমান, এই সত্যে এদের কিছু যায় আসে না। কারণ, মধ্যযুগীয় মুসলমান শাসনেও মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলনা। তাছাড়া বিভিন্ন উপায়ে ইসলামায়ন করে সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠীবে সংখ্যাগরিষ্ঠ করাও যেতে পারে।

দেওবন্দ মতধারার উজ্জ্বল তারকা মৌলানা মাওদুদি: আধুনিক ইসলামী মৌলবাদের মূল প্রবক্তা। তিনি পাকিস্তান তত্ত্বের বিরোধিতা করে দাবী করেছিলেন সমস্ত ব্রিটীশ ভারতের ইসলামায়ন। দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তানে বসবাস করতে থাকেন এবং সমস্ত সরকারী পদ্ধতির ইসলামায়ন দাবী করেন। ১৯৭৯ অব্দে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর দাবীর অনেকটাই পূরণ হয় যখন জেনারেল জিয়া পাকিস্তানী রাষ্ট্রের পূর্ণ ইসলামায়ন করেন।

বিদেশীরা জেনে আশ্চর্য হবেন যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, যিনি বহুবছর ধরে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, এবং স্বাধীন ভারতে অসঙ্গতভাবে শিক্ষামন্ত্রীও ছিলেন, তিনিও এই মতধারার মুসলমান ছিলেন। এই আজাদকে অসঙ্গতভাবে মধ্যপন্থী ও জাতীয়তাবাদী রূপে বর্ণনা করা হয়। তিনি ভারত বিভাগের বিরোধিতা করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু কখনই তা মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের বিরোধিতা করার জন্য নয়। তাঁর আকাঙ্খা ছিল কালক্রমে গোটা ভারতের ইসলামায়ন।

গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ভারত বিভাগ যখন অনিবার্য বলে প্রতিভাত হলো তখন আজাদ ভারতের অখন্ডতা রক্ষার জন্য তৎপর হলেন। কিন্তু কীভাবে? তিনি বললেন, ভারতের পার্লামেন্টের এবং সরকারের অর্ধাংশ থাকুক মুসলমানরা (তখন জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ)। বাকী অর্ধেক ভাগ হয়ে যাক হিন্দু, খ্রীষ্টান, আম্বেদকরপন্থী এবং অন্যান্যদের মধ্যে। এককথায়, ভারত শাসন করবে

মুসলমানরা এবং অমুসলমানরা নির্বাচক হিসাবে ও রাজনৈতিকভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে মুসলমানদের তাঁবে থাকবে।

মুসলিম জনগণের প্রতি ব্রিটিশের শেষ উৎকোচ রূপে চিহ্নিত ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের স্তরে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সাম্য দেখানো হলো, আবার মুসলিমদের ভেটো দেওয়ার অধিকারও দেওয়া হলো যে কোনও প্রস্তাবে। গাঁধিজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের অগোচরে মৌলানা ইংরেজ মধ্যস্থতাকারীদের বললেন যে, তিনি পরিকল্পনাটি কংগ্রেসকে দিয়ে গ্রহণ করাবেন। যখন ব্যাপারটা ধরা পড়লো যে তিনি মহাত্মার অগোচরে এসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তখন যেসব সহজমতির হিন্দুরা তাঁকে মধ্যপন্থী বলে জানতেন তাঁদের কাছেও তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা কিছুটা নষ্ট হলো। কিন্তু নেহরুর মন্ত্রীসভায় তাঁর স্থান বজায় থাকলো এবং তিনি ভারতের অন্তিম ইসলামায়নের জন্য তাঁর কর্মসূচী চালিয়ে যেতে লাগলেন।

মৌলানা আজাদের হিন্দু মুসলিম সহযোগিতার নিগদিত তত্ত্ব মুসলমানদের কাছে স্বচ্ছ, কিন্তু জেগে ঘুমিয়ে থাকা অমুসলিমদের কাছে, বিশেষ করে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের কাছে অতীব রহস্যময়। আজাদ ঘোষণা করেছিলেন হিন্দু মুসলিম সহযোগিতা পয়গম্বরের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, পয়গম্বর মদিনার ইহুদীদের সঙ্গে একত্রে বসবাসের চুক্তি করেছিলেন। ঘটনাটা ওই পর্যন্ত সত্য। কিন্তু পরের ঘটনা হলো, ঐ চুক্তির পর যখন মুহাম্মদ যথেষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন হলেন তখন মদিনার ইহুদীদের তিনটি গোষ্ঠির মধ্যে দুটিকে মদিনা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো, তৃতীয়টিকে সবংশে নির্বংশ করা হলো। দ্বিতীয় গোষ্ঠিটি প্রাণে বেঁচেছিল মদিনার কিছু ভদ্রলোকের হস্তক্ষেপে। নতুবা মুহাম্মদ তাদের খুন করতেই চেয়েছিলেন। মৌলানা আজাদ হিন্দুদের এই গল্পের অর্ধেকটা শুনিয়েছিলেন। কারণ, হিন্দুরা পুরা গল্প কোনও দিনই জানেনি এবং জানবেও না। এবং যাঁরা জানেন তাঁরাও ইসলাম ও পয়গম্বর সম্পর্কে কোনও রকম আলোচনা করা উচিত নয় বলেই মনে করেন।

যে সমস্ত হিন্দু ও প্রতীচ্যবাসী মনে করেন ইসলামের কোনও রকম সংস্কার সম্ভব, মৌলানা আজাদ সম্পর্কে এই ধরনের আলোচনা তাদের মোহভঙ্গ করতে কিছু সাহায্য করতে পারে। দেওবন্দের মৌলবাদের চেহারা মৌলানা আজাদের মুখের মত বা মাওদুদির হৃদয়ের মত।এর মুখপাত্রদের ইসলামী ইতিহাসের বীভৎসতা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই।ইসলামী ইতিহাস তারা নতুন করে লিখতেও চায়না। আল্লাহ্র ইচ্ছামত গোটা বিশ্ব জুড়ে দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যই হিন্দুদের তাড়না ও হত্যা করেছে মুসলমানরা। মুহাম্মদ ইকবাল লিখেছিলেন, মুসলিম হ্যায় হম্ ওতন্ হ্যায় সারা জহাঁ হমার (আমরা মুসলমান, গোটা বিশ্বই আমাদের দেশ)। মৌলানা আজাদের ইতিহাসবীক্ষাও ওই একই ধরনের। তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের সহনশীল রাজত্বকে ভারতীয় ইসলামের প্রায়-আত্মহত্যা বলেই গালি দিয়েছেন। তিনি প্রশংসা করেছেন আকবর বিরোধী মৌলবাদী শেখ আহমদ শিরহিন্দীর। এই শিরহিন্দী আকবরের সহনশীল নীতির বিরোধিতা করে মুঘল সামাজ্যকে আবার হিন্দু দলনের ভূমিকাতে নিয়ে আসেন।

যা কিছু সনাতন দেওবন্দ তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে চিরকাল, আলিগড়ী ধারা আবার চেষ্টা করেছে আধুনিকতার সঙ্গে ইসলামকে মেশাতে। আলিগড়ী ধারা বুঝেছে, আধুনিক গণতন্ত্রে যতক্ষণ মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয়ে থাকবে, ততোক্ষণ ভারতে ইসলামী রাজত্ব সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের পদ্ধতিগত অসুবিধা বিবেচনা করে তাত্ত্বিকভাবে গণতন্ত্রের বিরোধিতা করলেন মুহাম্মদ ইকবাল। তিনি বললেন, গণতন্ত্রে মানষের মাথা গুনতি করা হয়, মাথার বুদ্ধি ওজন করা হয়না। তবুও ইকবাল বুঝেছিলেন গণতন্ত্রই হচ্ছে যুগের হাওয়া এবং অন্যান্য অনেক শিক্ষিত মুসলমানদের মতই

উপলব্ধি করেছিলেন যে উপস্থিত মুসলমানদের ভারতের শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করার স্বপ্ন পরিত্যাগ করতে হবে। তার পরিবর্তে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে ভারতের মধ্যেই গড়ে তুলতে হবে একটা আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র। পাকিস্তানের তত্ত্ব ইকবাল উদ্ভাবন করেছিলেন ১৯৩০ অব্দে, আর ১৯৪০ অব্দে তা হলো মুসলিম লীগের অন্তিম উদ্দেশ্য। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে এই জন্য পাকিস্তান চিন্তার দোলনা বলা হয়।

আধুনিক সংস্কৃতি সম্পর্কে অধিকতর ধীমান হওয়ার জন্য আলিগড়ী চিন্তাবিদরা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা সম্পর্কে আধুনিক সংস্কার স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু এই সংস্কার উপনিবেশোত্তর একটি দেশে হিন্দুদের সঙ্গে সহাবস্থান করে বাস করার জন্য নয়, অতীতে ইসলাম ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার যে কলঙ্কময় নিদর্শ সৃষ্টি করেছে সেই ব্যাপারে কিছু একটা করার জন্য। ১৯২০ অব্দ নাগাদ আলিগড়ী ঐতিহাসিক মুহাম্মদ হাবিব স্থির করলেন ভারতের ধর্মীয় দ্বন্দ্বের ইতিহাস পুনর্লিখন করবেন। তাঁর উদ্ভাবিত ইতিহাসের মূল বক্তব্য হলো:

প্রথমতঃ যাঁরা ভারতের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেছেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে ইসলামী ইতিহাসকাররা (এঁদের মধ্যে আছেন কয়েকজন নৃপতি, যাঁরা নিজেদের আমলের ইতিহাস লিখেছেন, যেমন বাবর, তৈমুর) উচ্ছাসের সঙ্গে হিন্দুদের হত্যা করা, তাদের স্ত্রী ও শিশুদের বাজেয়াপ্ত করা ও তাদের উপাসনাস্থল ধ্বংস করার বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু সভা-ইতিহাসকাররা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের আনন্দ প্রদানের জন্য এইজাতীয় অতিশয়োক্তি করেছিলেন। এগুলি বাস্তব ঘটনা নয়।

কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন ওঠে, হিন্দু দলনের এই ধরনের 'মিথ্যা' ঘটনার রক্তাক্ত বিবরণ, যা কিনা মুসলিম ইতিহাসকাররা আমাদের জন্য রেখেছেন, তা শুনে ইসলামী নৃপতিরা আনন্দ পেতেন কী করে? যাই হোক, মুহাম্মদ হাবিব এই ধরনের একটি ঘটনার উদাহরণ দিয়েও নিজের উদ্ভট তত্ত্ব আমাদের কাছে প্রমাণ করেননি।

দ্বিতীয়তঃ হিন্দুদের উপর যেসব হত্যা ও অত্যাচারের ঘটনা মুহাম্মদ হাবিব স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন, সেগুলির কারণ, ইসলাম একথা তিনি স্বীকার করতে রাজী নন ।

তার মতে এইসব ঘটনার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য। হিন্দুরা তাদের যাবতীয় সম্পদ মন্দিরগুলিতে সঞ্চিত করতো। সেই জন্যই মুসলমান সৈন্যরা আক্রমণ করতো মন্দিরগুলি।

তৃতীয়তঃ এই সমস্ত ঘটনার অন্তরালে এক ধরনের জাতিতাত্ত্বিক কারণও ক্রিয়াশীল ছিল। মুসলিম আক্রমণকারীরা মূলতঃ তুর্কী। তারা স্তেপভূমির বর্বর অশ্বারোহী জাতি ইসলামের স্বাস্থ্যকর প্রভাবে যাদের সভ্য হবার জন্য কয়েক শতাব্দী সময়ের প্রয়োজন ছিল। তাদের সহজাত বর্বরতাকে ইসলামী তত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করাটা ঠিক নয়।

শেষতঃ ভারতবর্ষে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ইসলামী যোদ্ধাদের বীভৎসতার ভূমিকা নিতান্তই নগন্য। যা ঘটেছিল তাকে জয় করা বলেনা, তা জনসাধারণের মানসিক পরিবর্তন। শহরে শ্রমজীবি মানুষরা যখনই ইসলামের কথা শুনলো এবং উপলব্ধি করলো যে হিন্দু স্মৃতি আর ইসলামী শরিয়তের মধ্যে একটাকে বেছে নেওয়া যেতে পারে, তখন তারা শরিয়তকেই বেছে নিল।

মুহাম্মদ হাবিবের নতুন করে ইতিহাস লেখার কসরৎ কোনও সমালোচনামূলক পরীক্ষার চাপ সহ্য করতে সক্ষম নয়। আমরা গজনীর মাহমুদের ইতিহাস আলোচনা করেই হাবিবের তত্ত্বের অসারত্ব প্রমাণ করতে পারি। মাহমুদ গজনীর (৯৯৭-১০৩০ অব্দ) কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি সিন্ধু, গুজরাট ও পাঞ্জাবে অনেকবার বীভৎস আক্রমণ হানেন। নিঃসন্দেহে তিনি একজন তুর্কী ছিলেন।কিন্তু তিনি বর্বর ছিলেন একথা সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নয়। কারণ, হিন্দুদের উপর তাঁর আক্রমণ বর্বরতার নিদর্শন হলেও তিনি ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের সমঝদার পৃষ্ঠপোষক। তিনি পৃষ্ঠপোষণা

করেছিলেন শাহনামার রচয়িতা ফেরদৌস ও ঐতিহাসিক অল বিরুণীর। তিনি নিজেই ছিলেন এক সুন্দর লিপিকার। হিন্দুদের প্রতি বীভৎস অত্যাচারের জন্য কখনই তাঁর তুর্কী রক্তকে দায়ী করা যায়না। তাঁর হিন্দু গণহত্যা ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ ৭১২-১৫ অব্দের মুহাম্মদ-বিন-কাশিমের সিন্ধু জয়েরই অনুবর্তন। ঐহিক লাভের জন্য তিনি খুব বেশী ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি ধনসম্পদযুক্ত মসজিদসমূহ অক্ষত রেখেছিলেন। কিন্তু সম্পদহীন ও সম্পদযুক্ত, উভয় শ্রেণীর মন্দির ধ্বংস করেছিলেন সমান তৎপরতায়। পরে প্রচুর অর্থের বিনিময়েও তিনি প্রতিমা ধ্বংস থেকে বিরত হননি। বলেছিলেন, কেয়ামতের দিন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে একজন মূর্ত্তি ধ্বংসকারী হিসাবেই উপস্থিত হবেন, মূর্ত্তি বিক্রয়কারী হিসাবে নয়। এই একটিমাত্র কথায় মাহমুদের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায়। ইসলামের অনুগত হওয়ার জন্যই মাহমুদ হিন্দুদের প্রতি বীভৎস আচরণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর জাতিসত্তার কোনও ভূমিকা নেই।

শহুরে শ্রমিকের দল হিন্দু সামাজিক পদ্ধতির উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ইসলামকে মুক্তিদাতা হিসাবে দেখেছিল, এমন ঘটনা কোনও ইতিহাসে লেখা নেই। অপরপক্ষে অল বিরুণীর বর্ণনায় আছে, সমস্ত হিন্দুরা মুসলমানদের ঘৃণার চোখেই দেখতো।

আর একজন মুসলিম শাসক ফিরোজ শাহ তুঘলক নিজেই নিজেকে সমর্থন করে লিখেছেন যে তিনি পৌত্তলিকদের মন্দির ধ্বংস করেছেন ধর্মের কারণে, লোভের বশে নয়। তিনি লিখেছেন: হিন্দুরা জিজিয়া কর দিয়ে জিম্মি রূপে নিরাপত্তা পেয়েছে। কিন্তু এখন তারা পয়গম্বরের পবিত্র আদেশের বিরুদ্ধে মন্দির তৈরী করতে আরম্ভ করেছে শহরের মধ্যে। পবিত্র ধর্মের নেতা হিসাবে আমি মন্দিরগুলি ধ্বংস করেছি, হত্যা করেছি পৌত্তলিক নেতাদের আর সাধারণ হিন্দুদের মারধোর করেছি, যাতে এই ধরনের ক্রিয়াকর্ম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়।

পৌত্তলিক হিন্দুরা কোনও উৎসব পালন করছে শুনলে ফিরোজ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: আমার ধর্মীয় বোধ এই ধরনের কেলেঙ্কারী দমন করতে প্রবুদ্ধ করতো। এটা ইসলামের প্রতি অপমান। উৎসবের দিনে আমি নিজেই উপস্থিত হতাম ঘটনাস্থলে। এই ঘৃণ্য অনুষ্ঠান করার জন্য পালনকারীদের ও নেতাদের কোতল করার আদেশ দিতাম। তাদের প্রতিমার মন্দিরগুলি ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করতাম সেই জায়গায়।

হিন্দুরা তাদের যাবতীয় সম্পদ মন্দিরে সঞ্চয় করতো এটা নিতান্তই একটা মনগড়া তত্ত্ব। যদিও কিছু কিছু মন্দিরে সোনার প্রতিমা থাকতো (বা আজও থাকে)। কিন্তু সেটা একান্তই মন্দিরের সম্পত্তি। এটা হচ্ছে সুবিধাজনক ভাবে খাড়া করা হাবিবের অন্যতম এক তত্ত্ব, যা তাঁর বক্তব্যকে দুর্ভেদ্যভাবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দিয়েছে। সব মিলিয়ে হাবিব এক বিশাল চক্রান্তের কথা বললেন, যে চক্রান্তের মধ্যে আছেন শত শত ইসলামী ইতিহাসকার, যাঁরা বলছেন, তাঁদের বর্ণিত যুদ্ধগুলি কাফেরদের বিরুদ্ধে ইসলাম-বিশ্বাসীদের যুদ্ধ। এই চক্রান্তকারীরা সবাই একত্রিত হয়েছেন এক বিশাল প্রতারণার চিত্রনাট্য রচনার জন্য।

এসব কথা বলার অর্থ এই নয় যে এইসব মুসলিম ইতিহাসকাররা যা বলে গেছেন তার সবটাই গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ মাহমুদ গজনীর সমকালীন ঐতিহাসিক উথবীর বক্তব্য মাহমুদের হিন্দুস্থান দখল ফুটবলের ওয়াকওভারের মত একটা বাধাহীন ব্যাপার। এই সমস্ত ইতিহাস খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায় মুসলমানদের ভারত দখল নির্বিঘ্নে ঘটেনি। হিন্দুদের প্রাণপণ বাধাপ্রদান ও মুসলিম শাসকেরা যে বেশ শঙ্কাজনক অবস্থায় দিন অতিবাহিত করতেন তার আবছা সংকেত শুধুমাত্র এইসব ইতিহাসকারদের রচনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম ইতিহাসকাররা সদাসর্বদা মিথ্যা কথা লিখতেন না—যদিও সরকারী ইতিহাসকারা যা করেন তাঁরাও তাই করতেন। জয়পরাজয়ের

পরিমাণ বাড়িয়ে কমিয়ে লিখতেন। এটা একপেশে ঐতিহাসিকদের ক্ষেত্রে সর্বদা ঘটে থাকে এবং একজন আধুনিক ঐতিহাসিক এই ধরনের বিবৃতি থেকে প্রকৃত ইতিহাস অনুধাবন করতে সক্ষম। কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলমানরা পৌত্তলিক হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়েছিল, এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অন্য ব্যাপার। এই সত্য অস্বীকার করা কোনও ছোটখাটো ত্রুটি সংশোধন করার মত ব্যাপার নয়, বরং ভারত ইতিহাস সম্পর্কে সুপ্রতিষ্ঠিত অভিমত অস্বীকার করে সেটিকে বিপরীত মেরুর মতবাদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার চেষ্টা।

মুহাম্মদ হাবিব পৌত্তলিকদের গণহত্যা ও গণতাড়না করার তত্ত্বটিকে অস্বীকার করে দোষটাকে চাপাচ্ছেন কিছু ব্যক্তি মুসলমানদের ঘাড়ে। যদিও প্রাপ্ত তথ্য নির্দেশ দিচ্ছে মুসলিম মৌলবাদীরা কেবলমাত্র কোরানের বিধিগুলি কার্যকর করেছে মাত্র। দোষ মুসলমানদের নয়, দোষ ইসলামের।

আক্রমণশীল অপলাপবাদ: মার্ক্সবাদীদের কথা

আলিগড়ী ধারা তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশাল মাত্রায় নিয়ে গেছে। তাদের মশাল নিয়ে এখন দৌড়তে আরম্ভ করেছ মার্ক্সীয় ইতিহাসবিদরা। এদের বিশাল কুখ্যাতি আছে দলীয় মতবাদ অনুযায়ী ইতিহাস রচনা করার। এই প্রসঙ্গে সকলের জানা প্রয়োজন যে ভারতের কমিউনিস্ট দলসমূহ ও ইসলামী মৌলবাদীদের মধ্যে এক অদ্ভুত মিত্রতা আছে। চল্লিশের দশকে কমিউনিস্টরা বিচ্ছিন্নতাকামী মুসলিম লীগকে রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক সমর্থন জানিয়েছে ভারত ভাগ করে ইসলামী রাষ্ট্র তৈরী করার জন্য। স্বাধীনতার পরে নেহরুর সমর্থনে এরা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করতে বাধা দিয়েছে এবং বাধ্য করেছে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ভারতকে সোভিয়েট-আরব ফ্রন্টে যোগদান করতে। তখন থেকেই মার্ক্সীয়-ইসলামী মৌলবাদী জোট পারস্পরিক সহযোগিতায় নিবদ্ধ হয়েছে নিজ নিজ সুবিধার স্বার্থে। যেমন দুইদল সমবেত হয়েছে মুসলিম মৌলবাদের প্রতীক বাবরী মসজিদ রক্ষায়। নেহরুর আমলে এই মার্ক্সবাদীরা সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার ও নীতির উপর প্রবল মানসিক আধিপত্য বিস্তার করেছে।

এছাড়া তারা প্রবল আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতির উপরও। এমনকি যারা সোভিয়েট পদ্ধতি বাতিল করেছিল, তারাও মার্ক্সীয় পদ্ধতিতে চিন্তা করতেআরম্ভ করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা মার্ক্সীয়দের মত ধরে নেয় যে ধর্মীয় সংঘাত অর্থনৈতিক ও শ্রেণী সংঘাত ছাড়া আর কিছু নয়। তারা মার্ক্সীয়দের বুলিগুলিও অবলম্বন করে। তারা মার্ক্সবাদীদের আদলে সচেতন হিন্দুদের সর্বদা 'সাম্প্রদায়িক শক্তি' বলে উল্লেখ করতে থাকে (মার্ক্সীয়রা মানুষের মনুষ্যত্বকে হেয় করে মানুষকে ইতিহাস নামক ঈশ্বরের 'শক্তি' হিসাবে বর্ণনা করে)। ভারত ইতিহাসের গোটা ক্ষেত্রটাই এখন মার্ক্সবাদীদের দখলে। তারা এখন ভারত ইতিহাস থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে। যার নিগদিত অর্থ, বিভেদকামী অত্যাচারী শক্তি হিসাবে ইসলামকে চুনকাম করা।

সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতের ইতিহাস রচনা পুস্তকে ভারতের অপলাপবাদীদের ও 'ধর্মেতরবাদীদের' পীঠস্থান দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন অধ্যাপক রোমিলা থাপার, হরবন্স মুখিয়া বিপান চন্দ্র লিখেছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে মধ্যযুগের রাজনৈতিক যুদ্ধগুলিতে কৃত্রিমভাবে বর্তমানের ধর্মীয় দ্বন্দ্বের বর্ণ আরোপ করা হয়েছে। বিপান চন্দ্রের বিখ্যাত ফর্মুলা হলো: সাম্প্রদায়িকতা ডায়নোসর নয়, এটা নিতান্তই আধুনিক ঘটনা। তাঁরা জোরগলায় অস্বীকার করেন যে আধুনিক যুগের আগে হিন্দু সত্তা বা মুসলমান সত্তা বলে পৃথক কিছু বস্তু ছিল। যখন এসব পার্থক্য ছিলই না, তখন হিন্দু-মুসলিম সংঘাত বলে কিছু থাকতে পারেনা। যা ছিল তা হচ্ছে শাসক ও শাসিতদের মধ্যে শ্রেণী দ্বন্দ্ব, ঘটনাক্রমে সেই দুই শ্রেণী ধর্মগতভাবে পৃথক। তাঁরা একই ধর্মীয় গোষ্ঠির মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও

দুই ধর্মীয় গোষ্ঠির মধ্যে মিত্রতার কথাও বললেন।

কিছু কিছু হিন্দু মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, এটা ঘটনা। কিন্তু একই ভাবে হিন্দুরা সহযোগিতা করেছে উপনিবেশবাদী ব্রিটীশের সঙ্গে। কিন্তু তারাও বিদেশী শোষকরূপে চিহ্নিত। ওয়ারশ'র ইহুদী বস্তিগুলিতে নাৎসীরা পাহারাদার হিসাবে ইহুদীদেরই নিয়োগ করতো: সেটা তা বলে নাৎসী-ইহুদী সৌভ্রাত্রের নিদর্শন নয়। এটা ঘটনা যে মুসলিম শাসকেরা বহুসময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লাগাতো। কিন্তু সেটা সমভাবে সত্য ইংরেজ, ফরাসী ও পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীদের ক্ষেত্রেও: যারা নিজেদের মধ্যে বহু যুদ্ধ করেছে ভারতের মাটিতে। এই সমস্ত জাতিরা একই রকম উপনিবেশবাদী আদর্শে বলীয়ান। একই উপনিবেশবাদী কর্মকান্ডের অংশীদার। আর এরা সবাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শত্রু। এমনকি ক্রুসেডের ইতিহাসেও দেখা যায় এক মুসলমান-খ্রীষ্টান যুক্তফ্রন্ট অন্য মুসলমান-খ্রীষ্টান যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু ক্রুসেডের সঠিক চরিত্র যে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে যুদ্ধ এই সত্য ওইসব যুক্তফ্রন্ট গঠনের মধ্যে মিথ্যা প্রমাণিত হয়না।

অপলাপবাদীদের বক্তব্য, আধুনিক যুগের পূর্বে হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব ছিলনা: এই বক্তব্য বলার সঙ্গে সঙ্গে অপলাপবাদীদের কাঁধে একটি দায়িত্ব এসে যায়। কীভাবে বহুবৎসরব্যাপী হিন্দু-মুসলমান সৌভ্রাত্রের শেষে এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতা জন্মলাভ করে, তা ব্যাখ্যা করা। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্ক্সবাদীরা এক চক্রান্তের মতবাদ উদ্ভাবন করেছেন: হিন্দু ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক সত্তা ব্রিটীশ উপনিবেশবাদীদেরই চতুর উদ্ভাবন। তার 'ভাগ করো ও দেশ শাসন করো' রোমীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছেন। যাতে তারা সাম্প্রদায়িকভাবে একে অন্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ রামশরণ শর্মা ইলিয়ট ও ডাউসনের আট খন্ডে সম্পূর্ণ বিরাট ভারতের ইতিহাস: ভারতের নিজস্ব ঐতিহাসিকরা যেমন লিখেছেন গ্রন্থের কথা বলেছেন। এই গ্রন্থটিতে মুসলিম আক্রমণকারীদের নৃশংশ পৌত্তলিক নিগ্রহের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থের বক্তব্যের ব্যাপারে ইলিয়ট বা ডাউসনের কোনও দায়িত্ব নেই। গ্রন্থের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে তাঁরা সংকলিত করেছেন ভারতীয় ইতিহাসকারদের (যাদের বেশীভাগই মুসলমান) লিখিত ইতিহাসই।

এতৎসত্ত্বেও এইসব অপলাপবাদীরা এবং ভারতে যাঁরা নিজেদের ধর্মেতরবাদী বলে দাবী করেন তারা সকলেই বিশ্বাস করেন যে ব্রিটীশরাই ভারতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করেছে। রামজন্মভূমি-বাবরী মসজিদ বিতর্কে অপলাপবাদীদের বক্তব্যের মূল ভিত্তি হলো, ব্রিটীশকৃত সাম্প্রদায়িক বিভাজন। অপলাপবাদী ঐতিহাসিকবৃন্দ, যেমন, বিপান চন্দ্র, কে. এন. পানিক্কর, সর্বপল্লী গোপাল, রোমিলা থাপার, হরবন্স মুখিয়া, রাম শরণ শর্মা, জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, সুশীল শ্রীবাস্তব, আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার এবং মুসলিম মৌলবাদী সৈয়দ সাহাবুদ্দিন বারংবার বলেছেন বাবরী মসজিদ হিন্দু মন্দিরে উপর নির্মিত হয়েছে বলে যে গল্প প্রচলিত আছে তা ব্রিটীশদের দ্বারা উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে তৈরী
করা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে। উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যেও কী করে এই কল্পধারণার বিস্তার ঘটলো সে প্রসঙ্গে ঐ অপলাপবাদীরা বলছেন, এই ব্রিটীশের বানানো গল্প, 'ভাগ করো এবং দেশ শাসন করো' নীতি অনুযায়ী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে।

ব্রিটীশদের সৃষ্টি করা বিরাট তথ্যভাণ্ডার থেকে সামান্যতম তথ্য পেশ না করেও তারা এই চক্রান্তের গল্প প্রচার করে চলেছেন। এই ধরনের বিতর্কমূলক বক্তব্যের ক্ষেত্রে যে কোনও দায়িত্বশীল ঐতিহাসিক যে ধরনের বিস্তারিত সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেন, তা তো দূরস্থান।

১৯৯০ অব্দে এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ দলিল পেশ করার পরেও অপলাপবাদীদের মতের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। এইসব গুরুত্বপূর্ণ দলিলের মধ্যে আছে উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের বহিঃস্থ মুসলমানদের পাঁচটি দলিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান কর্মচারীদের দুটি দলিল, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর দুজন ইউরোপীয় পর্যটকের দুটি দলিল) সব কিছুতেই মন্দির ধ্বংসের প্রমাণ। অপলাপবাদীরা তাঁদের রচিত পুস্তকে এইসব সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছেন না।

অযোধ্যা বিতর্কে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার বিষয় যে ভারতীয় অপলাপবাদীরা ইউরোপীয় অপলাপবাদীদের মত আরও এক ধরনের চাতুর্য অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বিরুদ্ধ বক্তাদের চরিত্র হনন করছেন, যাতে জনগণের মন যুক্তি থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। ১৯৯০ অব্দের ডিসেম্বরে জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও গবেষকরা ভারতের তথাকথিত ধর্মেতরবাদী সংবাদপত্রগোষ্ঠির সহায়তায় অধ্যাপক বি. বি. লাল ও ডঃ এস পি গুপ্তের পেশাগত সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই দুজন পুরাতত্ত্ববিদ বাবরী মসজিদের নীচে একটি হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন। এই দুজনের এবং অন্যান্য পুরাতত্ত্ববিদদের প্রতিবাদের সংবাদ ধর্মেতরবাদী সংবাদপত্রগুলিতে খুব অল্পই স্থান পেয়েছে। ১৯৯১ অব্দের ফেব্রুয়ারীতে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিকদের এক সভায় ইরফান হাবিব তাঁর কুখ্যাত ভাষণটিতে যেসব বিদ্বান হিন্দুদের বক্তব্যের সমর্থনে সরকার আয়োজিত বিতর্কে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের উপর প্রবল বিষোদগার করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার ঝাঁজ ছিল বিশেষ করে অধ্যাপক বি. বি. লালের বিরুদ্ধে। এইক্ষেত্রে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট এ. কে সিংহের বক্তব্য ছাপা হয়েছিল ইংরেজী সানডে পত্রিকায়। এই প্রতিবাদের বিষয়বস্তু অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এটা প্রায়োগিক বিষয়ে পূর্ণ--সর্বসাধারণের পক্ষে বোধগম্য নয়। এর ইংরেজীও ছিল অত্যন্ত খারাপ। সুতরাং লেখাটি সাধারণের মনে কোনও ছাপ ফেলতে সমর্থ হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে আমার ধারণা, এই সমস্ত দুর্বলতা থাকার জন্যই সানডে পত্রিকার সম্পাদক লেখাটি ছাপার জন্য বিবেচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে আমি অবশ্য সুনিশ্চিত নই। তবে একটা সাধারণ ঘটনা হচ্ছে অপলাপবাদীরা ইসলামের বিপরীতে হিন্দুদের অবমাননাকর চিত্র উপস্থাপনের জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করে। নিরপেক্ষতা প্রদর্শনের জন্য হিন্দুদের বক্তব্যের মধ্যে যেটি সবচেয়ে দুর্বল ও অবিন্যস্ত সেটিই সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করে। আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার তাঁর বাবরী মসজিদ রাম জন্মভূমি বিতর্ক পুস্তকে হিন্দুদের কিছু অসম্পূর্ণ ও কম বিশ্বাস উৎপাদক বক্তব্য সন্নিবেশ করেছেন। ভাবখানা, হিন্দুদের বক্তব্যও তিনি সাধারণকে শোনাতে উৎসুক। কিন্তু হিন্দুদের বক্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে জোরালো ও যুক্তিযুক্ত অংশ সুকৌশলে বাদ দিয়েছেন তিনি। পাঠকের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়েছেন সবচেয়ে সিদ্ধান্তকর যুক্তিগুলি। কিন্তু কৌশলে ইতিহাসের ইচ্ছাকৃত বিকৃতিকে ঢেকে দিয়েছেন এক ছদ্ম নিরপেক্ষতার আবরণে।

অ্যানাটমি অফ কনফ্রন্টেশন পুস্তকে জে. এন. ইউ ঐতিহাসিকবৃন্দ অধ্যাপক এ. আর. খানের জোরালো যুক্তিসমূহ উল্লেখই করেননি, অধ্যাপক হর্ষনারায়ণ ও এ. কে চ্যাটার্জীর প্রামাণ্য সাক্ষ্যের (প্রথমে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত। পরে ভয়েস অফ ইন্ডিয়ার হিন্দু টেম্পলস: হোয়াট হ্যাপন্ড টু দেম : এ প্রিলিমিনারী সার্ভে নামক পুস্তকে প্রকাশিত) কথা শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সবিস্তারে আলোচনা করা হয়নি--অস্বীকার তো দূরের কথা। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হিজিবিজি পুস্তিকা ও বি.জে.পি বক্তার অজ্ঞতা মিশ্রিত বক্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে সবিস্তারে।

ইরফান হাবিবের বক্তৃতার প্রতিবাদে এ. কে. সিংহের বক্তব্যের শেষ অনুচ্ছেদে দেখানো হয়েছে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকদের বক্তব্য কীভাবে বাবরী মসজিদ বিতর্কের আগে ও পরে পরিবর্তিত হয়েছে। আজ কমিউনিস্ট নেতাদের কাছে, বাবরী মসজিদ অ্যাকসন কমিটি ও ভন্ড ধর্মেতরবাদীদের কাছে, রামায়ণ-মহাভারতের মত মহাকাব্যের নাম উচ্চারণও জাতীয়তা বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িকতা বলে বিবেচিত। এই প্রসঙ্গে এতোদিন পর্যন্ত ডি. ডি. কোশাম্বী, রামশরণ শর্মা, রোমিলা থাপার, কে. এম. শ্রীমালি, ডি.এন. ঝা ও অন্যান্যরা যা প্রকাশ করেছেন সেগুলির সম্বন্ধে এখন তারা কী বলবেন? আমি আমার মার্ক্সবাদী বন্ধুদের সম্পর্কে চিন্তা করছি। বহু সহকর্মীদের বিরুদ্ধে অপ্রমাণিত কলঙ্কারোপণ, অভিযোগ প্রমাণ না করেই সকলকে গালিগালাজ বর্ষণ করছেন ওঁরা। তাঁদের সাম্প্রতিকতম লক্ষ্য হচ্ছে শান্ত ও পরম সম্মানিত অধ্যাপক বি. বি. লাল—যাঁর বয়স এখন প্রায় ষাট, যিনি সারাজীবন কোনও রকম রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে আবদ্ধ হননি— যে দলাদলি ও রাজনীতি করা এদেশের মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবিদের অত্যন্ত প্রিয় হবি। এই মার্ক্সবাদীদের কাছে অন্যের বদনাম গাওয়া বহু চর্চিত শিল্প।

নাৎসী খান্ডব-দাহনের অপলাপবাদ সম্পর্কে যাঁদের জ্ঞান হয়েছে তাঁরা বাবরী মসজিদ সমর্থক ভারতীয় অপলাপবাদীদের চতুরালী সহজেই ধরে ফেলবেন। সেটা হচ্ছে এক ধরনের ভয়াবহ জোচ্চুরী যাতে একজনের বক্তব্য থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে যা বলা হয়েছে তার বিপরীত বক্তব্য প্রমাণ করা। যখন তাদের চালাকী বিফল হয়ে গেল তখন জে এন ইউ এর ঐতিহাসিকরা প্রথমতঃ অধ্যাপক বি.বি. লালকে বিশ্বাসঘাতক ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভাড়া করা লেখক বলে গালি দিতে লাগলো। তারপর তারা অধ্যাপক বি. বি. লালের খ্যাতিকে ব্যবহার করে প্রমাণ করতে চাইলো বাবরী মসজিদের স্থলে কোনও মন্দির ছিলনা।

তাদের পুস্তিকা দি পলিটিক্যাল অ্যাবিউস অফ হিস্ট্রীতে এইসব ঐতিহাসিকরা *ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষার* ১৯৮০ অব্দের অযোধ্যা ও অন্যান্য রামায়ণ-বর্ণিত স্থানের খননকার্যের প্রতিবেদন থেকে অধ্যাপক বি. বি. লালের প্রতিবেদনের সারাংশ উৎকলিত করে প্রচার চালাতে লাগলেন যে বাবরী মসজিদের স্থলে কোনও মন্দির ছিলনা। তাঁরা ঐ প্রতিবেদনের বক্তব্য খুব ভাল ভাবেই জানতেন। কাজে কাজেই তাঁরা ঐ প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে লাগলেন বাবরী মসজিদের আশপাশের এলাকা খনন করে নবম শতাব্দীর পূর্বেকার কোনও মন্দির পাওয়া যায়নি। তারপর তারা বলতে লাগলো, ঐ বিতর্কিত স্থানেতে পুরাতাত্ত্বিক খননের ফলে কোনও মন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি, যদিও অধ্যাপক লালের ঐ প্রতিবেদনে বিতর্কিত স্থানে একাদশ শতাব্দীর একটি দালানের ধ্বংসাবশেষের কথা বলা হয়েছিল। পরে তারা বারবার একই প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "পরবর্তী সময়ের কোনও গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য নেই।" অর্থাৎ, মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঐ স্থান থেকে পাওয়া যায়নি।

প্রকৃত পক্ষে *ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষার* সারাংশকারী ঐ সময় গুরুত্বহীন কিন্তু অস্তিত্বসম্পন্ন মধ্যযুগীয় ধ্বংসাবশেষের বিশদ বর্ণনা দেবার প্রয়োজন অনুভব করেননি (বা, তথ্য গোপন করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন)। কিন্তু ১৯৯০এর শরৎকালে এইসব প্রতিবেদনের কিছুটা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করা হলে দেখা গেল ঐ প্রতিবেদন বাবরী মসজিদ-রাম জন্মভূমি বিতর্কের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক কে. এম. পানিক্কর অ্যানাটমি অফ এ কনফ্লন্টশানে লিখলেন, এই সমস্ত বিষদ বর্ণনা যদি আর এস এসের তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সম্প্রতি তৈরী করা না হয়ে থাকে তবে ঐ সময়ে এগুলি ইচ্ছা করে গোপন রাখা হয়েছিল পুরাতত্ত্ব সমীক্ষার সারাংশকারীর দ্বারা। অর্থাৎ, অপলাপবাদীরা পুরাতত্ত্ব সমীক্ষার প্রকাশন সংস্থায় সক্রিয়। তারা

পুরাতত্ত্ব সমীক্ষার প্রতিবেদন 'সম্পাদনা' করছে অপলাপবাদীদের স্বার্থে। এর অন্য তাৎপর্য, অধ্যাপক পানিক্কর পাঠকের মাথায় স্ক্রু ঢুকিয়ে দিতে চাইছেন: পাঠকেরা অন্য সম্ভবনাটিই সন্দেহ করুক--আর. এস. এস ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সমীক্ষাতেও ঢুকে পড়েছে।

যাই হোক, ১৯৯০এর শেষ দিকে একটি প্রবন্ধে ডঃ এস. পি. গুপ্ত ও অধ্যাপক বি. বি. লাল পুরাতত্ত্ব সমীক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন। এছাড়া বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিদেরা বিভিন্ন বক্তৃতায় ও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করেন। অধ্যাপক লাল ও ডঃ গুপ্ত বি. বি. সি'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ধ্বংসপ্রাপ্ত দালানের একটি স্তম্ভের ভিত্তি চিত্র সমেত প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করেন। ঐ স্তম্ভের ভিত্তি সম্বন্ধে এখন কোনও সন্দেহই থাকতে পারেনা। অধ্যাপক বি. বি. লাল এমন এক সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সিদ্ধান্তের বিপরীত বক্তব্য এতোদিন তাঁর নামে চালিয়ে আসছিল মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকরা।

সেই জন্যই ১৯৯০ এর ডিসেম্বরে একদল মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক অধ্যাপক বি.বি.লালকে গালিগালাজ করতে আরম্ভ করলেন যে, অধ্যাপক লাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে নিজের অভিমত পরিবর্তন করেছেন। কারণ, এখন তাঁরা নিজেদের কোলে ঝোল টানার জন্য অধ্যাপক লালের খ্যাতিকে ব্যবহার করতে সমর্থ নয়। সুতরাং তাঁরা ঠিক করলেন অধ্যাপক লালের বৌদ্ধিক খ্যাতি বিনষ্ট করবেন। এস. পি. গুপ্ত সম্বন্ধে তাঁদের হাস্যকর অভিযোগ: এস. পি. গুপ্ত রামায়ণ বর্ণিত স্থানে খননকার্যে আদৌ যুক্ত ছিলেন না। তাঁরা সেই অভিযোগ আজও ফিরিয়ে নেননি। কিন্তু অধাপক বি. বি. লালের মত বিশ্ববিখ্যাত লোকদের ক্ষেত্রে অপলাপবাদীদের সতর্ক হতে হয়েছে। কারণ, তাঁর উপর রচিত কুবাক্য ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে। সেই জন্য অধ্যাপক বি. বি. লালকে গালিগালাজ বেশী দিন চলেনি। বরং মার্ক্সবাদীরা ও অযোধ্যা বিতর্কে অংশগ্রহণকারীরা ফিরে গেছেন তাদের পুরাতন মঞ্চে। অধ্যাপক বি. বি. লালের বক্তৃতার সারমর্ম--যা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, সেটা থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। যাতে মনে হয়, অধ্যাপক লালের প্রতিবেদন তাঁদের তত্ত্বকেই সমর্থন করছে। এক্ষেত্রে যেহেতু অধ্যাপক লালের সম্পূর্ণ প্রতিবেদন সংবাদপত্রগুলিতে সামান্যই উল্লিখিত হয়েছে, সেহেতু ঘটনার সত্য মিথ্যা সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

অপলাপবাদীদের অস্ত্রাগারের আর এক অস্ত্র হলো অত্যাচারিতদের শিবির থেকে এমন একজনকে সংগ্রহ করা যে অত্যাচারীদের নিরাপরাধতা প্রমাণ করে। এই অস্ত্র ভারতে প্রায়ই প্রয়োগ করা হয়। ঔরঙ্গজেবের দ্বারা অত্যাচারিতদের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু দেশবিভাগের ভয়াবহতার মধ্যে বেঁচে আছে এমন লোক যথেষ্ট আছে। জিন্না রক্তের বিনিময়ে দেশ বিভাগ করতে না চাইলে ঐ ব্যাপক হত্যাকান্ড কখনই ঘটতো না, একথা কেউ স্পষ্ট করে বলেনা। কিন্তু অপলাপবাদীরা পরের কাজটা দক্ষতার সঙ্গে করে: খুনোখুনির দায়টা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের উপর সমভাবে বন্টন করে দেয়। কমিউনিস্ট ঔপন্যাসিক ভীষ্ম সাহানী তাঁর তমস উপন্যাসে দেশবিভাগের হত্যাকান্ডে হিন্দুদেরই খলনায়ক বানিয়েছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে ভীষ্ম সাহানী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত

উদ্বাস্তু। যাঁর মুসলিম বিরোধী হওয়া উচিত ছিল, তাঁর হিন্দুবিরোধী মানসিকতা হিন্দু পীড়নকারীদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। মার্ক্সবাদী অধ্যাপক বিপান চন্দ্র তাঁর কম্যিউনালিজম--দি ওয়ে আউট (খুশবন্ত সিং এর দুটি বক্তৃতার সঙ্গে মেনি ফেসেস অফ কম্যিউনালিজম নামে প্রকাশিত) নিবন্ধে একই ধরনের এক চরিত্রের শোভাযাত্রা দেখিয়েছেন। তাঁর এক ছাত্র রাওয়ালপিন্ডিতে দেশভাগের হাঙ্গামায় পরিবারের সাত জনকে হারিয়ে কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছেন। কিন্তু এর জন্য মুসলমানদের

বিরুদ্ধে তাঁর কোনও অভিযোগ নেই। সে বলেছে অনেকদিন আগেই আমি উপলব্ধি করেছি আমার বাবা-মা মুসলমানদের দ্বারা নিহত হননি। নিহত হয়েছেন সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা। যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার দায়িত্ব হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই কাঁধে সমানভাবে চাপাতে চান তাদের কাছে মুসলিম আক্রমণ থেকে উদ্ধার পাওয়া এই মানুষটি পরম প্রার্থিত পাত্র।

সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে সেই মানসিকতা যাতে একই ধর্মাবলম্বী মানুষেরা বিশ্বাস করে তারা একটি পৃথক জাতি। হিন্দু ধর্ম এই ধরনের বিশ্বাস প্রতিপালন করেনা। কিন্তু হজরত মুহাম্মদ মদিনায় ঐস্লামিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণা ইসলামের কেন্দ্রীয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কথাও ঠিক, কিছু কিছু হিন্দু সম্প্রদায় (সুস্পষ্টভাবে শিখরা) সাম্প্রতিককালে কিছু ইসলামী উপাদান পরিগ্রহ করেছে। যার সঙ্গে আছে সেই সাম্প্রদায়িক মানসিকতা—একই ধর্মের মানুষেরা একই জাতি এবং তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র চাই। কিন্তু এই ধরনের মানসিকতার উৎস বরাবরই ইসলাম। সুতরাং বিপান চন্দ্রের ছাত্র বস্তুতপক্ষে বলতে চেয়েছেন, আমার পরিবার মুসলমানদের দ্বারা নিহত হয়নি, নিহত হয়েছে ইসলামের দ্বারা।

মুসলমানরা সাম্প্রদায়িকতা নামক এক ইসলামী ব্যাধির বাহক। আলাদা একটি মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে তোলার পক্ষে তারা মত প্রকাশ করেছে—এটা একটা বাস্তব ঘটনা। অপরাধী অবশ্যই ইসলাম। ইসলামের মতান্ধ প্রকৃতির আলোকে মুসলমানদের অবস্থান নিয়ে আমি বিপান চন্দ্রের নিজস্ব উপমাই ব্যবহার করছি—যাতে সাম্প্রদায়িকতা এবং তার অনুসরণকারীদের ভালভাবে বোঝা যায়। একজন রোগী যখন রোগে আক্রান্ত হয়, তখন তুমি নিশ্চয় রোগীকে হত্যা করবে না, তাকে সারিয়ে তুলবে। কেউ যদি সাম্প্রদায়িকতা অনুসরণ করে, তবে তাকে মেরে ফেলনা। তাকে সুস্থ মানসিকতায় ফিরিয়ে আনো। হিন্দুদের প্রতিহিংসা কখনও ইসলাম বিশ্বাসীদের উপর বর্ষিত হওয়া উচিত নয়, যেমন হয়েছিল ১৯৪৭ অব্দে। রোগীকে হত্যা করোনা, হত্যা করো রোগকে। মুসলমানদের মন থেকে ইসলামকে সরিয়ে ফেল শিক্ষার মাধ্যমে, দেখবে ভারতের 'সাম্প্রদায়িক' সমস্যা মিটে গেছে। মার্ক্সীয় পন্ডিতদের বক্তব্য, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি।

এখন এই ব্যাপারটা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। উপরোক্ত আলোচনায় আমি উল্লেখ করেছি, সাম্প্রদায়িকতার উৎস ইসলাম। ঐ আলোচনার পরে মনে হতে পারে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বলে কিছু নেই। কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাস চর্চা ইঙ্গিত করে যে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সত্তা সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান থাকলেও হিন্দুদেরও সাম্প্রদায়িক সত্তা ছিল। উদাহরণস্বরূপ সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলিম আগ্রাসন প্রতিহতকারী শিবাজী ছিলেন মুসলিম রাজত্বের অবসানকামী সর্বহিন্দু মুক্তিযুদ্ধের সচেতন সেনানী। রানা প্রতাপের ক্ষেত্রেও সেই একই বক্তব্য উপযুক্ত। এই বক্তব্য উপযুক্ত অন্যান্য বহু হিন্দু নেতাদের ক্ষেত্রেও। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ, বিজয়নগর রাজ্য হিন্দু সভ্যতার শেষ দুর্গরূপে যথেষ্ট সচেতন ছিল।

এ কথা সত্য কোনও হিন্দু রাজ্য যখন মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তখন অন্য হিন্দু রাজ্য হয়তো পিছন থেকে আক্রমণ করেছে সেই হিন্দু রাজ্যকেই। কারণ, প্রথমে তাদের ধারণা ছিলনা যে এইসব নবাগত মুসলমানরা সমস্ত অমুসলমানদের প্রতি ঘৃণা বর্ষনকারী শত্রু, সুতরাং তাদের সকলেরই শত্রু। কিন্তু ইসলামের চরিত্র সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা কখনও প্রমাণ করেনা যে নিজেদের হিন্দু সত্তা সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলনা। নিজেদের মধ্যে বিবাদ দ্বন্দ্বে তাদের ধর্মীয় সত্তা কদাচ বিপন্ন হচ্ছিল না; তার সচেতন ভাবেই নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছিল। কিন্তু যখনই তারা বুঝলো তাদের ধর্মীয় সত্তা ইসলাম নামক নতুন তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন আক্রমণকারীদের লক্ষ্য, তখন তারা জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই চালিয়েছে। একই পিতার একাধিক

পুত্রের মধ্যে এক ধরনের আত্মীয়তা থাকে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা সময় সময় নিজেদের মধ্যে বিবাদ করেনা।

আদৌ যদি কিছু হিন্দু সামগ্রিক হিন্দুত্ব সম্বন্ধে সজাগ না থেকে প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র নিজের জাত ও সম্প্রদায় সম্পর্কে আগ্রহ প্রদর্শন করেও থাকে, তাতে কিছু এসে যায়না। সকল শ্রেণীর হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের নির্বিচার তাড়না নিঃসন্দেহে হিন্দুদের স্ব-সত্তা ও স্বার্থ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে। এখন যদি মার্ক্সবাদীরা অস্বীকার করে যে বৈচিত্রযুক্ত হিন্দু জাতির মধ্যে একধরনের সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধজনিত ঐক্য বর্তমান ছিল, তাহলে তাদেরই হাতে গড়া বক্তব্য প্রয়োগ করা যাক, "ইসলামী আগ্রাসনকারীদের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধের ফলে বহুধাবিচ্ছিন্ন ভারতীয় সমাজ একত্রিত হয়ে হিন্দু সত্তা পরিগ্রহ করে।"

আমি এই বক্তব্যে বিশ্বাস করিনা। কারণ, এই বক্তব্য হিন্দুসত্তার একাধিক নঞার্থক ও প্রতিক্রিয়াশীল ভিত্তি প্রদান করেছে। কিন্তু কেউ যদি এটা ধরে নিতে চায় যে আগে কদাচ হিন্দু সত্তার কোনও সদর্থক অস্তিত্ব ছিলনা তবে তাই হোক। এটা অযৌক্তিক যে ভারতীয় পৌত্তলিকরা বহুশতাব্দী ধরে একত্রে হিন্দু বলে অভিহিত হবে, তারা ইসলামী আগ্রাসনকারীদের আক্রমণের লক্ষ্য হবে, তারা একই ভাবে অপমানিত হবে এবং একই জিজিয়া করের আওতাধীন হবে, অথচ তাদের মধ্যে সমস্বার্থের চেতনা জাগবে না। এই সমস্বার্থের চেতনাই তাদের মধ্যে এক একীভূত সাংস্কৃতিক পরিস্থাপত্য গড়ে তুলেছিল। সুতরাং হিন্দু সমসত্তার চেতনা যদি পূর্ব থেকে না থেকেও থাকে, তবে ভারতীয় পৌত্তলিকদের উপর মুসলমানদের ধারাবাহিক অত্যাচার ঐ সমসত্তার চেতনা অবধারিতভাবেই জাগিয়ে তুলেছে।

কমিউন্যাল হিস্ট্রী অফ রামা'স অযোধ্যা (১৯৯০) পুস্তকে অধ্যাপক রাম শরণ শর্মা যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে মধ্যযুগের হিন্দুরা মুসলমানদের কোনওরকম ধর্মীয় সত্তা হিসাবে দেখেনি। দেখেছে জাতি হিসাবে। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে শর্মা দাখিল করেছেন যে গাহাদভালা রাজবংশ তুরস্কদন্ড নামক একটি কর আরোপ করেছিল--তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টার ব্যয়নির্বাহের জন্য কর। কিন্তু এই দিয়ে অধ্যাপক শর্মা যা প্রমাণ করতে চাইছেন তা প্রমাণ হচ্ছেনা। মুসলমানরা ভারতীয় পৌত্তলিকদের অনেক সময় কাফের বলতেন। কাফের মানে ইসলামে অবিশ্বাসী, অর্থাৎ এটি একটি ধর্মীয় অভিধা। আবার প্রায়ই ভারতীয় পৌত্তলিকদের বলতেন হিন্দু--অর্থাৎ হিন্দুস্তানের বাসিন্দা। এটি একটি জাতি-ভৌগলিক অভিধা। কারণ, সিন্ধু শব্দের ফার্সী রূপ হিন্দু। এবং তারা ভারতীয় পৌত্তলিকদের ধর্মকেও এই ভৌগলিক অভিধার সঙ্গে মিলিয়েছিলেন--যা তাঁরা এখনও বজায় রেখে চলেছেন। হিন্দুরা কখনও নিজেদের হিন্দু বলে চিহ্নিত করেননি। শব্দটি প্রাথমিকভাবে ফার্সী, পরে সনাতন ধর্ম সংলগ্ন ভারতীয় পৌত্তলিকদের মুসলিম নাম। কিন্তু এটা শুধু নামকরণের ব্যাপার। সনাতন ধর্মের মৌলিক 'ধর্মীয় একাত্মতা শাশ্বত। এভাবেই হিন্দুরা আক্রমণকারীদের বলতো তুর্কী, তার অর্থ এই নয় যে তারা তুর্কীদের ধর্মীয় সত্তাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতো না। অপরপক্ষে তৈমুর লঙ তাঁর স্মৃতি কথায় নিজের সৈন্যদের তুর্কী বলেই অভিহিত করছেন। এবং ঐ পুস্তকে লিখেছেন তিনি ভারতের পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতেই ভারতে এসেছেন। এক বিজিত শহরে হিন্দু অধিবাসীদের কোতল করার আগে তিনি ঐ শহরে বন্দী মুসলমানদের আগে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তুর্কীদের কাছ থেকে পাওয়া বর্বর অত্যাচারের পশ্চাতে যে ধর্মীয় তত্ত্ব ক্রিয়াশীল তাকে উপলব্ধির ব্যাপারে, হিন্দুরা (এখনও) ধীরগতির। কিন্তু তারা এক সময়ে বুঝেছিল আক্রমণকারীদের অমানুষিকতার পশ্চাতে আছে তাদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য। অধ্যাপক শর্মার প্রদত্ত তথ্যে তুরস্কদন্ডের প্রস্তাব সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে **মুসলিম** আক্রমণ অন্য যে কোনও আক্রমণের থেকে পার্থক্যযুক্ত।

সাধারণভাবে সেই আক্রমণের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অতিরিক্ত কর আরোপ করার প্রয়োজন।

ইতিহাসের বিভিন্ন প্রাথমিক সূত্র থেকে প্রতীয়মান যে বেশীভাগ ক্ষেত্রেই বিবাদের সূত্রপাত হতো ধর্মীয় কারণে। বহু সময় বিবাদীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও। সুতরাং অপলাপবাদীদের কৌশল হলো এই ধরনের সাক্ষ্যকে পাঠকের দৃষ্টি থেকে আড়াল করা। একটি পরিস্কার উদাহরণ হলো অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ পান্ডের দি কনস্ট্রাকশন অফ কম্যিউন্যালিজম ইন কালোনিয়াল ইন্ডিয়া (ঔপনিবেশিক ভারতে সম্প্রদায়িকতার গঠন) নামক পুস্তক। নামটিই বলে দিচ্ছে অধ্যাপক পান্ডে বলতে চেয়েছেন যে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ঔপনিবেশিক ভারতে গঠিত হয়েছে ব্রিটীশদের দ্বারা, ব্রিটীশ ঔপনিবেশিকদের প্রয়োজনে। অধ্যাপক পান্ডে এই পুস্তকে আরও বলেছেন, পরে ঔপনিবেশিক সমাজে দেশজরা লাভজনক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সন্ধানে সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় গ্রহণ করে।

অধ্যাপক পান্ডের এই ব্যাখ্যা যেন সেই ইহুদী বিদ্বেষের ব্যাখ্যারই মত, আধুনিক পুঁজিবাদীরা দুনিয়ার মজদুরদের বিভক্ত করার জন্য ইহুদী-বিদ্বেষ তৈরী করেছে। এই মতবাদ প্রচারের জন্য সাযুজ্যের অভাবে যাবতীয় মধ্যযুগীয় ইহুদী দলনের ঘটনা অস্বীকার করা হয়েছে, কারণ মধ্যযুগে তো পুঁজিবাদ বলে কিছু ছিলনা। একই ভাবে অধ্যাপক পান্ডে অস্বীকার করতে চেয়েছেন ভারতীয় পৌত্তলিক কাফেরদের বিরুদ্ধে ইসলামী জেহাদের বহু সহস্র তথ্য-প্রমাণ।

আর একটি উদাহরণ হলো অধ্যাপক কে. এন. পানিক্করের মোপলা 'বিদ্রোহ' সংক্রান্ত সাম্প্রতিক পুস্তক। ১৯২১ অব্দে খেলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে মোপলা বিদ্রোহ মালাবারের মুসলিমদের পরিকল্পিত হিন্দু গণহত্যা। এই গণহত্যায় সরকারী হিসাবে অনুযায়ী ২৩৩৯ জন হিন্দু নিহত হয়েছিল (*এ ছাড়া বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল বহুজনকে–সম্পাদক*)। পানিক্কর মার্ক্সবাদী মঞ্চ গ্রহণ করে বলেছেন, মোপলা বিদ্রোহ কোনও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নয়, শ্রেণী সংগ্রাম। আর সেই শ্রেণী সংগ্রাম হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে নয়, জমিদার আর কৃষকদের মধ্যে। ঘটনাক্রমে কৃষকরা মুসলমান আর জমিদাররা হিন্দু। কিন্তু ঐ গণহত্যার সাম্প্রদায়িকচরিত্র এতই প্রবল যে গান্ধিজী পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন যে ঐ গণহত্যা হিন্দু-মুসলিম একতার আদর্শতে একটি বিরাট আঘাত। এটা হতে পারে ঘটনার সুযোগে জমিদার আর সুদখোরদের সঙ্গে হিসাব মেটানো হয়েছিল। কিন্তু মোল্লারা তাদের অনুগতদের লেলিয়ে দিয়েছিল সমস্ত শ্রেণীর হিন্দুদের আক্রমণ করার জন্য। বুঝিয়েছিল শুধু জমিদাররাই নয়, সমস্ত শ্রেণীর হিন্দুরাই তাদের শত্রু। ইসলামী ধর্মান্ধতার চরিত্রই এমন যে সমস্ত ধরনের বিতর্কই শেষ পর্যন্ত অ-মুসলিমদের প্রতি আক্রমণে পর্যবসিত হয়।

আরও মার্ক্সীয় বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, রোমিলা থাপারের অদ্ভুত তত্ত্বতে, যা তিনি উচ্চারণ করেছেন, অযোধ্যার ঘটনাতে, সর্বপল্লী গোপালের অ্যানাটমি অফ কনফ্রন্টেশন পুস্তকে। রোমিলা থাপারের মতে সাম্প্রতিক হিন্দু আন্দোলন সমস্ত হিন্দুকে একত্রিত করতে চায়, হিন্দুরা প্রতিকূলশক্তির দ্বারা অবরুদ্ধ বলে নয়; বা, বহুশতাব্দীব্যাপী জেহাদের স্মৃতি তাদের মনের মধ্যে জাগরুক বলে নয়, (এক সমালোচকের ভাষায়)--"একটা একীভূত দৃঢ় ধর্মব্যবস্থা পুঁজিবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ" বলে। তিনি মনে করেন হিন্দুদের রাজনৈতিক আন্দোলন হিন্দু পুঁজিবাদীদের উদ্ভাবন মাত্র। বা, তাঁর নিজের ভাষায়, "অংশতঃ মধ্যবিত্তদের দ্বারা আধুনিকতার তত্ত্ব হিসাবে হিন্দু ধর্মের পুনর্মূল্যায়ণের চেষ্টা" যাতে "আধুনিকতা পুঁজিবাদের বিস্তারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।" তিনি হিন্দুধর্মের আধুনিকীকরণের পশ্চাতে পুঁজিবাদীদের চক্রান্তের মানসিকতা আবিষ্কার করেছেন এইভাবে: "খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের মত সেমীয় (Semitic) ধর্মের মধ্যে পুঁজিবাদ সমৃদ্ধ হয় বলে ধারণা করা হয়। সেই যুক্তি

বলে পুঁজিবাদকে যদি ভারতে সাফল্যলাভ করতে হয় তাহলে তাকে সেমীয় ধর্মের ছাঁদে গড়ে তুলতে হবে।"

সুতরাং প্রতিকূল শক্তির ক্রমবর্ধমান চাপে হিন্দু সমাজের রাজনীতিকরণের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে অর্থনৈতিক শক্তির ধর্মীয় মুখোস বলে। মার্ক্সীয় মতধারার খাপের মধ্যে অনিচ্ছুক তরোয়ালকে প্রবিষ্ট করার এই ধরনের প্রচেষ্টা দেখে অনেকে হাসবেন। বিশেষতঃ এই ধরনের বিশ্লেষণ ১৯৯১ অব্দেও চলছে : ভারতের বুদ্ধিজীবিদের মাথায় এখনও ঢোকেনি কেন, মার্ক্সবাদ যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাসমূহ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ তাই নয়, সমান ব্যর্থ সামাজিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করতেও।

ঘটনাক্রমে রোমিলা থাপার একদিক দিয়ে ঠিক যে কিছু কিছু হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী সেমীয় ধর্মগুলির সঙ্গে হিন্দু ধর্মের সমান্তরালত্ব খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন, যেন এই ধরনের সমান্তরালত্ব হিন্দু ধর্মের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয়--যদিও রাম জন্মভূমি আন্দোলনকে এইরকম একটা ছাঁচের মধ্যে ফেলার তাঁর প্রচেষ্টা--রাম পয়গম্বর আর রামায়ণ বাইবেলের মত হিন্দুধর্মের একমাত্র নির্দেশক গ্রন্থ ইত্যাদি বক্তব্য সেই অনিচ্ছুক তরোয়ালকে বেখাপ্পা খাপের মধ্যে পোরার প্রচেষ্টার মতই করুণাকর। ভারতীয় সভ্যতার ধর্মীয় পরম্পরা এবং হিন্দু নামে অভিহিত বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের সমন্বয় যে সুস্পষ্টভাবে সেমীয় ধর্ম থেকে পৃথক, এই ঘটনার উপর তিনি নতুন করে জোর দিচ্ছেন বলে মনে হয়।

একথা সত্য কোনও কোনও হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী একেশ্বরবাদ থেকে ধার করা কথার সাহায্যে হিন্দু ধর্মকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। তাদের মধ্যে রয়েছে 'অভ্রান্ত ধর্মগ্রন্থ' (বেদে ফিরে যাও) আর্যসমাজ), প্রতিমা ধ্বংসী একেশ্বরবাদ (আর্য সমাজ, অকালী নব শিখ), অথবা একস্তর বিশিষ্ট দৃঢ় একীভূত সংস্থা (রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ) ইত্যাদি বিভিন্ন একেশ্বরবাদী ধারণার লেশ। কিন্তু পুঁজিবাদের প্রয়োজনের সঙ্গে হিন্দু মনের এইধরণের বিবর্তনের সম্পর্ক নির্ণয় করা কল্পনারও অতীত। হিন্দু ধর্মের এই ধরনের বিবর্তনের কারণ সততার সঙ্গে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে সেমীয় আগ্রাসী ধর্মগুলির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় হিন্দু মানসিকতার মধ্যে কৌশলগতভাবে খ্রীষ্ট-ইসলামীয় পন্থাগুলি অনুকরণ করার একটা প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। এই প্রবণতাকে মার্ক্সবাদীদের প্রিয় সমাজ-অর্থনৈতিক কারণ বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। বরং এর উৎস সেই বীভৎস ভীতি যা ইসলাম (সামন্ত্রতন্ত্র নয়, ধনতন্ত্র নয়, ইসলাম) সঞ্চার করেছিল হিন্দুমনে। আর তা বৌদ্ধিক মাত্রায় বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছিল 'আদিম বহুদেবতাবাদের' বিরুদ্ধে খ্রীষ্টিয় মিশনারীদের বৌদ্ধিক প্রচার। এইভাবে যারা খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালিয়েছে তারা নিজেরাই শত্রুদের ভাবধারার কিছুটা গ্রহণ করে ফেলেছে। ফলে যাবতীয় হিন্দু উপাদানের উপর সেমীয়সুলভ ঘৃণা বিদ্বেষ আরোপ করে চলেছে। এইসব হিন্দু উপাদানের মধ্যে আছে প্রতিমাপূজা, সামাজিক বিকেন্দ্রীকরণ, বহুদেবতাবাদ ইত্যাদি। এই ধরনের অনুকরণ সঠিক পথ না আত্মপরাজয়ের পরিচয় তা হিন্দু সমাজেরই চিন্তা করার বিষয়।

যাই হোক, হিন্দু ও আগ্রাসী একেশ্বরবাদীদের (বিশেষতঃ মুসলমানদের) মধ্যে পুরাতন মেরুকরণের উপসর্গ হিসাবে কিছু উগ্র হিন্দুদের মধ্যে পয়গম্বরী একেশ্বরবাদের অনুকরণ করার মানসিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। বিপান চন্দ্রের 'সাম্প্রদায়িকতা বিংশ শতাব্দীর ঘটনা' ধরনের বক্তব্য দ্বারা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত মেরুকরণ যা শিখধর্ম ও আর্য সমাজ সৃষ্টি করেছে, তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এইসব ঘটনা হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বহুশতাব্দীব্যাপী শত্রুতা থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব। শিবাজী ধনতন্ত্রের অগ্রবাহক ছিলেন না। এমনকি ব্রিটীশ বিভক্ত করো ও শাসন করো নীতির ফসলও নয়। তিনি ছিলেন হিন্দু সভ্যতার ও আগ্রাসী ইসলামের মধ্যে চলমান

যুদ্ধের এক বিশিষ্ট সৈনিক মাত্র। পঞ্চাশের দশক থেকে ইতিহাসের বাজারে একধরনের প্রকাশনার বন্যা বহে যাচ্ছে, যার মধ্যে কমবেশী অপলাপবাদ বাহিত হচ্ছে। টিপু সুলতানের তরবারী টিভি সিরিয়ালে জনসাধারণকে খাওয়ানো হচ্ছে চরম মৌলবাদী টিপু সুলতানের চুনকাম করা চেহারা। অপলাপবাদীদের চশমা পরেই ভারতের ইতিহাসকেদেখতে বাধ্য করা হচ্ছে জনসাধারণ ও ইতিহাসের জিজ্ঞাসু ছাত্রকে। ভারতে অপলাপবাদীরা যা জোগাড় করতে সমর্থ হয়েছে তা ইউরোপীয় অপলাপবাদীরা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারেনা। তারা সৎ ঐতিহাসিকদের অসৎ বলে প্রচার করে এবং একঘরে করে রাখে। যে সমস্ত লোক ইতিহাসচর্চা করে নিজেদের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা অনুযায়ী, তারাই অন্যের দিকে অভিযোগের তর্জনী তোলে ইতিহাসের রাজনৈতিক অপব্যবহার করার জন্য। তুলনায় যে সমস্ত ঐতিহাসিক বিশুদ্ধ ইতিহাসচর্চা করেছেন এবং ইসলামের তত্ত্ব কাটছাঁট করতে রাজী হননি, (যেমন, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, কিশোরী শরণ লাল) তাঁরা সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক বলে সারা ভারত জুড়ে পাঠ্য পুস্তকে চিহ্নিত হচ্ছেন। তাদের পছন্দমত ইতিহাস বহু পুস্তকে লিখিত হচ্ছে দেখেও স্বস্তিতে নেই এই সব অপলাপবাদীরা। তারা চাইছেন, অন্য ধরনের ইতিহাস যেন সাধারণের হাতে না পড়ে। সেজন্য ১৯৮২ অব্দে ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT) বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে একটি নির্দেশনামা দিয়েছেন, "মধ্যযুগকে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের যুগ বলে চিহ্নিত করা নিষিদ্ধ।"

ভারতীয় অপলাপবাদীদের বিদেশী সমর্থন

কিছু কিছু বিদেশী লেখক ভারতীয় সহযোগীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতের ইতিহাস রচনায় অপলাপবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, পেঙ্গুইন হিস্ট্রী অফ ইন্ডিয়ায় রোমিলা থাপারের সহ লেখক পার্সিভাল স্পিয়ার লিখেছেন, ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় অসহযোগিতা বেনারসের হিন্দু মন্দিরের স্থলে মসজিদ নির্মাণের মত কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিরুদ্ধ উপকথা ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কী? বারাণসীতে ঔরঙ্গজেব কী শুধুমাত্র একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের স্থলে একটি বিচ্ছিন্ন মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন? তিনি সব মন্দিরেরই ধ্বংসের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যার মধ্যে ছিল হিন্দুদের অন্যতম পবিত্র কাশী বিশ্বনাথ মন্দির। এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু মন্দিরের স্থলে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর নাগালের মধ্যে হিন্দুদের যত পবিত্র স্থান পড়েছিল, তার সবই ধ্বংস হয়েছিল। প্রতিস্থলেই নির্মিত হয়েছিল মসজিদ। এইসব পবিত্র স্থানের মধ্যে আছে মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমি মসজিদ এবং গুজরাট উপকূলের বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির। ঔরঙ্গজেবের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত মন্দিরের সংখ্যা হাজার দিয়ে লিখতে হয়, সংখ্যাটা দশ হাজারের উপরও হতে পারে। তাঁর নিজস্ব সভা ইতিহাসকারদের মতে ঔরঙ্গজেব সমস্ত প্রাদেশিক গভর্নরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন পৌত্তলিকদের সমস্ত বিদ্যালয় ও মন্দির ধ্বংস করে দিয়ে পৌত্তলিক শিক্ষা ও পৌত্তলিকতার বিনাশ ঘটাতে। ঐ ইতিহাসকার সমস্ত ধ্বংসকার্য লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে, "হাসান খাঁ এসে বললেন, তাঁর এলাকার ১৭২ টি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। ....সম্রাট চিতোরে গেলেন এবং সেখানে ৬৩ টি মন্দির ধ্বংস করা হলো....আবু তারাবকে নিয়োগ করা হয়েছিল অম্বরের মন্দির ধ্বংস করার জন্য। তিনি সংবাদ দিলেন ৬০ টি মন্দির ধূলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

ঔরঙ্গজেব মন্দির ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হননি, ধ্বংস করেছেন মন্দিরের ব্যবহারকারীদেরও। শুধুমাত্র হাজার হাজার ব্রাহ্মণ, শিখ বা অন্যান্য প্রতিরোধকারীরাই নিহত হননি, ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতার বিশিষ্ট সূচক হচ্ছে বিভিন্ন কারণে সহ্য করতে না পেরে বিভিন্ন জনকে হত্যা। অধিকতর পরিচিত ঘটনা হলো ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগে নিজেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাশিকোর হত্যা (দারাশিকো হিন্দু

দর্শনের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন)। ঔরঙ্গজেবের বলপূর্বক ইসলামায়নের নীতিকে বাধা দেওয়ার জন্য হত্যা করা হয়েছিল শিখগুরু তেগবাহাদুরকে। ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা বিরোধী পক্ষের উপকথা বলে পার্সিভাল স্পিয়ার যে বক্তব্য রেখেছেন, তা নিঃসন্দেহে অপলাপবাদের এক গুরুতর ঘটনা।

অপেক্ষাকৃত কম ভয়াবহ বিদেশী অপলাপবাদের একটি দৃষ্টান্ত হলো, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার 'ইন্ডিয়া' শীর্ষক নিবন্ধটি। ঐ নিবন্ধে সুলতানী শাসন অধ্যায়ে হিন্দু তাড়না ও হিন্দু গণহত্যার কোনও উল্লেখ নেই। শুধু আছে ফিরোজ শাহ তুঘলকের কথা। ফিরোজ শাহ তুঘলক তাঁর হিন্দু প্রজাদের ইসলামায়িত করার এক অসফল প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং কখনও সখনও হিন্দুদের তাড়িত করেছিলেন। অপলাপবাদীদের "মধ্যযুগকে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের যুগ বলে চিহ্নিত করা নিষিদ্ধ" ফতোয়াটি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন ব্রিটানিকার নিবন্ধকার। এছাড়া যেখানে যেখানে শত্রুতা ঘটেছিল সেখানে মৈত্রীর কথা লেখা রয়েছে ঐ নিবন্ধে। যেমন লেখা হয়েছে বাহমনী সুলতান তাজউদ্দিন ফিরোজ দুটি যুদ্ধের শেষে বিজয়নগর রাজ থেকে রাজত্ব ও রাজকন্যা দুই-ই পেয়েছিলেন। এবং এর ফলে দুটি রাজত্বের মধ্যে আপাতভাবে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জওহরলাল নেহরু মনে করতেন, মুসলমান হারেমের মধ্যে হিন্দু নারীকে টেনে নিয়ে যাওয়া 'মিশ্র সংস্কৃতি'র দোলনা (মিশ্র সংস্কৃতি বলতে হিন্দু অবমাননার তৎকৃত প্রশংসা-সূচক নামকরণ)। কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য এনসাইক্লো-পিডিয়ার পরাজয়কে বন্ধুত্ব বলে প্রচার করার চেয়েও মুসলিম হারেমকে হিন্দু সংস্কৃতির দোলনা বলে প্রচার করা অধিকতর কুৎসিত। যাই হোক নামী বিশ্বকোষ শেষ পর্যন্ত লিখেছে মৈত্রী টিঁকেছিল মাত্র দশবছর; কারণ, তারপরই বিজয়নগর রাজ্যের সৈন্যদের হাতে পরাজয় ঘটেছিল ফিরোজের। এই ক্ষেত্রে অপলাপবাদের পদক্ষেপ অতি সতর্ক : এখানে সংজ্ঞার পরিবর্তন করে পরাজয় হয়েছে মৈত্রী আর অসুবিধাজনক ঘটনাকে রাখা হয়েছে পাঠকের দৃষ্টির আড়ালে।

অপলাপবাদের বৌদ্ধিক অপরাধে পশ্চিমী গ্রন্থকাররা কতদূর সচেতন সহযোগী আর কতটা ইংরেজী-শেখা ভারতীয়দের বুলির দ্বারা সহজে প্রতারিত তা সম্পূর্ণ পরিস্কার নয়। কিন্তু পেঙ্গুইন দ্বারা ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য আহুত একজন পশ্চিমী ঐতিহাসিকের ক্ষেত্রে তিনি আসল ব্যাপারটা জানেন না, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। বিপরীতক্রমে, বিদেশে প্রচারিত দৈনন্দিন সংবাদের ক্ষেত্রে ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের হিন্দুবিরোধী মানসিকতাকে যথার্থই অনুকরণ করা হয়।

কিছুটা অপলাপবাদের সাহায্য আর কিছুটা সহজ-প্রতারিত হওয়ার ঘটনার একটি দৃষ্টান্ত হলো ব্রায়ান ব্যারনের 'হিন্দু মৌলবাদ' সম্পর্কিত টিভি ফিল্ম। ঐ ডকুমেন্টারী ফিল্ম ১৯৯১ অব্দের মে মাসে লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রচারিত হয়েছিল। ব্রায়ান ব্যারন একজন প্রতিভাবান সাংবাদিক। মঙ্গোলিয়ার কমিউনিষ্ট জমানার প্রথম দিকে হাজার হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর গণহত্যা সংক্রান্ত ঘটনার উপর তাঁর নির্মিত চিত্রটি দেখলেই ব্যাপারটা পরিস্কার বোঝা যায়। ঐ টিভি চিত্রটি ১৯৯১ অব্দের অক্টোবরের আগেই প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু আন্দোলন সংক্রান্ত তাঁর চিত্রটি পক্ষপাতদুষ্ট ও দ্বিতীয় শ্রেণীর। উদাহরণস্বরূপ এতে বহু তথ্যগত ভুল আছে (যেমন, রাম জন্মভূমির জন্য রথযাত্রার গতিপথ ভুলভাবে দেখানো হয়েছে, তাছাড়া এতে দিল্লীকে দেখানো হয়েছে গঙ্গার তীরে), যা নিতান্তই অবহেলার নিদর্শন--যে ধরনের অবহেলা বিদেশী সাংবাদিকরা প্রায়ই দেখান ভারতের ব্যাপারে।

ব্যারন বলেছেন ভারত আগেই ভাগ হয়েছে *ধর্মের* কারণে। বস্তুতঃ ভারত ভাগ হয়েছে ইসলামের কারণে, অন্য সব ধর্মাবলম্বীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এবং এই ছোট্ট ভুলটি একটি পুরানো চাতুরী। এতে দেশভাগের দায়টা ইসলাম থেকে অন্যদের ঘাড়ে সমানভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ব্যারন নিরপেক্ষ হবার কোনও চেষ্টা করেননি। বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানীকে সরাসরি লোক খেপানো লোক বলেছেন। আদবানীর ঘোষিত শত্রু ভি.পি. সিং কে শুধিয়েছেন, আদবানী ধর্মান্ধতার উপর একটি

মানবিকতার মুখোস পরাতে চেয়েছেন কিনা। ভিপি সিং স্বাভাবিকভাবেই বলবেন, হ্যাঁ। কিন্তু ব্যারন ইমাম বোখারীর সঙ্গে ভিপির রাজনৈতিক বিবাহ সম্পর্কে ভিপিকে প্রশ্ন করার সুযোগ গ্রহণ করেননি। যদিও সেটা এক 'হিন্দুর' মৌলবাদে 'উস্কানি' দেওয়ার ঘটনা। তিনি স্বামী অগ্নিবেশকে সুযোগ দিয়েছেন, বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মেশানোর অভিযোগ হানতে। কিন্তু অগ্নিবেশকে পাল্টা প্রশ্ন করেননি, কীভাবে সন্নাসীর গৈরিক বসন পরে জনতা দলের লোকসভা প্রার্থী হওয়া যায়।

ব্যারন যখন আদবানীকে প্রশ্ন করলেন, তিনি তাঁর শোভাযাত্রায় (১৯৯০ অব্দের অক্টোবরের রথযাত্রা) এতো রক্তক্ষয় হতে দিলেন কেন? আদবানী যথাযথ উত্তর দিলেন, আপনি এক ভ্রান্ত সংবাদের চক্রে পড়ে গেছেন। একটু মনোযোগী সাংবাদিক হলে এ ধরনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরে তাঁর সংবাদ-সূত্রগুলি খুঁটিয়ে দেখতেন। কারণ, ঐ সমস্ত সংবাদ-সূত্রের উপরই তাঁর কাজের গুণাগুণ নির্ভর করে। কিন্তু তিনি তা করলেন না। যখন একজন সাধু বললেন, মুসলমানরা হিন্দুদের সম্মান করতে অস্বীকার করে এবং হিন্দুদের আইনতঃ প্রভেদ করা হয়, তখন ব্যারন প্রশ্ন করলেন না, কীভাবে প্রভেদ করা হয়। সমস্ত পশ্চিমা সাংবাদিকদের মত ব্যারন সংবাদ চিত্র বানালেন 'হিন্দু মৌলবাদের' উপর। কিন্তু ভুলেও একবার প্রশ্ন করলেন না কীভাবে এই ধরনের আন্দোলনের অভ্যুদয় ঘটলো। উল্টে তিনি মার্ক্সবাদীদের মত বললেন, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এটা মুখোসপরা শ্রেণীস্বার্থের আন্দোলন ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

অধ্যাপিকা রোমিলা থাপারের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ব্যারন। থাপার অভিযোগ করেছেন, এই হিন্দু আন্দোলনের উদ্দেশ্য এমন একটি তত্ত্বের সৃষ্টি করা, যে তত্ত্বে কিছু সম্প্রদায়ের লোক দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে ক্রমাগত প্রাণভয়ের মধ্যে জীবন যাপন করবে। মার্ক্সবাদের প্রবক্তা রোমিলা থাপারের এই বক্তব্য লজ্জাহীন। কারণ, মার্ক্সবাদ সমস্ত জনগোষ্ঠীকেই ত্রাসের মধ্যে রেখে দিয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ 'প্রতিবিপ্লবী এলিমেন্টদের' (মার্ক্সবাদীদের ব্যবহৃত অমানবিক ও দুবৃত্যায়িত অভিধা) খুন করেছে। কিন্তু যারা *বি.বি.সি'*র টিভি চিত্রটি দেখছেন তাঁরা স্পষ্ট জানেন না, রোমিলা থাপারের অবস্থান। তাঁরা ভেবেছেন রোমিলা থাপার একজন নিরপেক্ষ বক্তা, যাঁর কাছে ঘটনার বিষয়গত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। একই ধরনের ঘটনা বহুক্ষেত্রে ঘটেছে টাইম ম্যাগাজিন ও নিউজউইকের ক্ষেত্রে। বিপান চন্দ্র, রোমিলা থাপার ও অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্য উৎকলিত করা হয়েছে ঐ সব পত্রিকায়, যেন তাঁরা নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবি। যদিও এই সমস্ত সংবাদপত্র সাধারণ সংবাদের ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট বিরোধী, কিন্তু যখন সংবাদের বিষয় ভারতীয়, তখন এই সমস্ত সংবাদপত্র জেনে না-জেনে মার্ক্সবাদীদের বক্তব্যই সন্নিবদ্ধ করে ঘটনার অন্তর্তদন্ত করতে গিয়ে। মাত্র দশবছর আগে বিভিন্ন পশ্চিমী দেশসমূহে বাম-মার্গী প্রচার মাধ্যম গুলিতে খোলাখুলিভাবে 'সত্যকারের অস্তিত্বযুক্ত' পুঁজিবাদকে আক্রমণ করা হতো, উদ্ভাবন করা হতো সবরকম কাল্পনিক CIA ও নব-ফ্যাসীবাদী চক্রান্ত। কিন্তু যত্নসহকারে যাবতীয় সমালোচকদের দৃষ্টির আড়ালে রাখা হতো 'সত্যকারের অস্তিত্বযুক্ত' সমাজবাদকে। একই ভাবে ব্রায়ান ব্যারন কুমারী থাপারকে হিন্দু আন্দোলনের উপর কুৎসা রটনার সুযোগ দিলেন। কিন্তু সযত্নে পরিহার করে চললেন, সত্যকারের অস্তিত্ব-যুক্ত তথ্য, পাশ্ববর্তী ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানেই আছে কুমারী থাপার বর্ণিত সেই সমাজ যেখানে সংখ্যালঘুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে ত্রাসের মধ্যে জীবনযাপন করে।

আজকাল ভারতের সাম্প্রদায়িক অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশনের ধরন হলো, হিন্দুর চোখে ক্রোধের আগুন দেখানো এবং মুসলমানের চোখকে সংবাদ দৃষ্টির বাইরে রাখা। ১৯৯১ অব্দে লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে জার্মান বামমার্গী পত্রিকা Der Spiegel স্বাধীন ভারতের সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গাগুলির সারাংশ লিখেছে এইভাবে, ১৯৪৭ অব্দ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে ১০০০ টি দাঙ্গা লেগেছে : ঐ সব দাঙ্গার বলি ১২০০০ মুসলিম। দাঙ্গায় হিন্দু বলির কথা একবারও উচ্চারণ করা হয়নি ঐ পত্রিকায়। পড়ে মনে হয় যেন মুসলিম মৌলবাদীদের মুসলিম ইন্ডিয়া বা রেডিয়ান্স পত্রিকা পড়ছি। সাংবাদিকরা কী ধরনের অযৌক্তিক মাপকাঠি ব্যবহার করে, অযোধ্য বিতর্ক তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। হিন্দুদের একটি পবিত্রস্থান যা ১০৪৯ অব্দ থেকে প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে এবং ১৯৮৬ অব্দ থেকে প্রতিবন্ধকতাহীন ভাবে একটি হিন্দু মন্দির হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তা দাবী করছে মুসলিম নেতারা, যারা একই সঙ্গে দাবী করছে মথুরা ও বারাণসীর পবিত্র স্থান দুটিতে মুসলিম দখলদারী চলুক। এটা যদি ধর্মান্ধতার পরিচয় না হয় তাহলে সেটা কী তা আমি জানিনা। এতৎসত্ত্বেও গোটা বিশ্বের সংবাদপত্র মুসলিমদের সপক্ষে এবং রামজন্মভূমি স্থানের উপর মন্দির তৈরীর হিন্দু পরিকল্পনা হিন্দু ধর্মান্ধতা বলে প্রচার করছে। এটাকে দুমুখো নীতি বললে ভুল হবে, বলতে হবে উল্টো নীতি।

ভারতের মুসলমানরা যে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সোচ্চারে প্রতিবাদ করে (যেমন, তাদের মধ্যে অশিক্ষার জন্য, যার জন্য তাদের মোল্লারা শতকরা ১০০ ভাগ দায়ী) তাতেই প্রমাণ, তারা ভাল আছে। কারণ, আমি দেখেছি পাকিস্তান থেকে যেসব হিন্দুরা বেড়াতে আসে বা সেখান থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুরা নিজেদের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে কোনও কথা উচ্চারণ করতে ভয় পায়। কারণ, তাতে তাদের বা পাকিস্তানে বসবাসকারী আত্মীয় স্বজনদের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। ক্রমাগত ত্রাসের মধ্যে থেকে তারা মনিব জাতিদের সম্পর্কে সামান্য অভিযোগ জানাতেও ভুলে গেছে। এই মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারীরা কোনও ক্রমেই এমন কোনও কাজ করেনা যাতে মুসলিম প্রভুরা চটে যায়। নির্বোধ সাংবাদিকদের কাছে তাদের নিস্তব্ধতার অর্থ মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে সংখ্যালঘুরা ভালই আছে, সুতরাং স্বাধীন ভারতে উচ্চকিত মুসলিম অসন্তোষের কথা আগ্রহভরে শোনে তারা। যেখানেই চিৎকার সবচেয়ে বেশী, সেখানেই সংবাদদাতারা ছুটে যান। কারণ, ভারতের সাংবাদিকদের পেশাগত মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের।

হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক সম্বন্ধে নেহরুবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহ যে একপেশে ধারণা সৃষ্টি করছে, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ১৯৬৪ অব্দে রাঁচীর কাছে জেস্যুইট পাদ্রী ফাদার রাসচিয়ার্ট এর শহীদত্ব, যা ঢাক ঢোল পিটিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলি প্রচার করেছে। ফাদার রাসচিয়ার্টের বোন আমার মার বান্ধবী ছিলেন। সেজন্য শিশুকাল থেকে ঘটনাটির বর্ণনা আমি প্রায়ই শুনেছি। ক্রুদ্ধ হিন্দুদের তাড়া খেয়ে কিছু মুসলমান একটি মসজিদে লুকিয়েছিল। যখন ফাদার রাসচিয়ার্ট হিন্দুদের শান্ত করার চেষ্টা করেন,তখন তিনি হিন্দুদের দ্বারা নিহত হন এবং জনতা মুসলিমদের কেটে ফেলে। কিন্তু কাহিনীর যেখানে আরম্ভ, হিন্দুরা কেন মুসলমানদের তাড়া করেছিল, সে ব্যাপারটা কোনওদিনই সমকালীন সংবাদপত্রে উল্লিখিত বা আলোকিত হয়নি। পরবর্তীকালেও এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য হয়নি। ঘটনাটা আরম্ভ হয়েছিল পূর্বপাকিস্তান থেকে রেল বাহিত হয়ে আনা অঙ্গহীন আহত হিন্দুদের দেখে। ঐ হিন্দুরা পূর্বপাকিস্তানে গণহত্যা থেকে কোনওক্রমে রক্ষা পেয়েছিল: যা অন্য হিন্দুরা পারেনি। তারা কোতল হয়ে গিয়েছিল সেখানেই। সর্বদাই মুসলমানদের বলপ্রয়োগের পরে হিন্দুরা বলপ্রয়োগ করে। পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের রক্ষা করতে কিন্তু কোনও মিশনারীদের পাওয়া যায়নি। পাওয়া যাবে কী করে? পূর্ব পাকিস্তানে মিশনারীদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। ইসলামী দেশে মিশনারীদের দ্বারা ধর্মান্তরিতদের নানারকম হয়রানি করা হয়; সময় সময় নিজের পরিবারের দ্বারা খুনও হয় তারা। যে কোনও রকম অজুহাতে মিশনারীদের স্কুল ও গীর্জা আক্রান্ত হয়। তাদের দ্বারা শিক্ষিতদের চাকুরী দেওয়া হয়না। সুতরাং পৃথিবীর মিশনারী কেন্দ্রগুলি ভারতের মত অতিথিবৎসল

দেশই পছন্দ করে। একজন মিশনারী মুসলিমদের রক্ষা করতে গিয়ে হিন্দু ধর্মান্ধদের দ্বারা খুন হয়েছেন, এতে প্রথমতঃ প্রমাণ হয় ক্যাথলিক পাদ্রীরা ভারতের মত দেশে পাকিস্তানের চেয়েও সহজে কাজ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু ধর্মান্ধতার এই উদাহরণ খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে এর পিছনের অনেক বেশী সংগঠিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধর্মান্ধতার দৈত্যকে।

এই ঘটনার তৃতীয় একটি দিক আছে, যেটা কখনও উল্লেখ করা হয়না। সেটা হলো পাকিস্তানের হিন্দুদের সমর্থন করার ব্যাপারে ভারত সরকারের অনিচ্ছাই রাঁচীর হিন্দুদের অদম্য করে তুলেছিল। এই গণহত্যার প্রধান একজন আসামী হলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। যিনি হিন্দুদের অপরাধীর কাঠগড়ায় তুলে সংখ্যালঘুদের দিকে সমবেদনার হাত তুলে ধরলেন ফাদার র‍্যাসচিয়ার্টের মৃত্যু উপলক্ষে। নিজের হাতে গড়া ইসলামী রাষ্ট্রের হিন্দুদের অবশিষ্টাংশের রক্ষা করার কর্তব্য তিনি (এবং আজ পর্যন্ত সমস্ত 'ধর্মেতরবাদী' প্রতিষ্ঠানসমূহ) বরাবরই অস্বীকার করেছেন। পাকিস্তানের মুসলমানদের কৃত হিন্দু তাড়নার অভিযোগগুলি খন্ডন করে তিনি হিন্দুদের প্রতিহিংসার জন্যও পরোক্ষভাবে দায়ী। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলি এই সব ব্যাপার নিয়ে কখনই গভীরভাবে চিন্তা করেনা। ফাদার রাসচিয়ার্টের মৃত্যুর জন্য তারা হিন্দু ধর্মান্ধদের দায়ী করে, মুসলিম দুর্ভাগাদের জন্য কেঁদে আর সমস্ত ধর্মীয় উন্মত্ততার মধ্যে জওহরলাল নেহরুর সুস্থ মানসিকতার প্রশংসা করে তাদের সংবাদ পরিবেশনের দায়িত্ব শেষ করে দেয়। যেভাবে আমাদের সাংবাদিকরা মুসলমানদের অসন্তোষকে সংবাদের মধ্যে প্রকট করে কিন্তু পাকিস্তানের হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠদের ক্ষোভ অস্বীকার করে (এবং ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের যথার্থ ক্ষোভকে ব্যঙ্গ করে) তা স্মরণ করিয়ে দেয় পশ্চিম ইউরোপের অবাম সংবাদপত্রগুলির গোর্বাচভ-পূর্ব বাম-দক্ষিণ ভেদাভেদের প্রতি পক্ষপাতমূলক অবস্থানকে। বামপন্থী বিশ্লেষণ অনুযায়ী দক্ষিণপন্থী শাসকেরা স্বেচ্ছাচারী। যেমন, পিনোচেট হচ্ছেন 'স্বেচ্ছাচারী', কিন্তু চেসেস্কু হচ্ছেন 'প্রেসিডেন্ট'; দক্ষিণপন্থীরা হচ্ছে 'বিদ্রোহী', কিন্তু বামপন্থীরা 'প্রতিবাদকারী'। পশ্চিমের সমালোচনা প্রচুর পরিমাণে শোনা যেত, কিন্তু সোভিয়েট ব্লকের মূক মানুষদের কথা শোনা যেতনা। সেখানে গিয়ে সেখানকার মানুষদের কথা শোনার কোনও স্পৃহার কথাও শোনা যেতনা। যাঁরা সোভিয়েট ব্লকের মানুষদের স্বাধীনতার কথা বলতেন তাঁদের বিদ্রুপ করা হতো। এর থেকে খারাপ ব্যাপার হলো, যখন ১৯৬৮ অব্দে রুশ পদার্থবিজ্ঞানী শাখারভ সোভিয়েট ইউনিয়নে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি দলিল প্রকাশ করলেন। নেতৃস্থানীয় বামপন্থী বুদ্ধিজীবিরা অস্বীকারই করলেন শাখারভ নামের কোনও বিজ্ঞানীর অস্তিত্ব। বললেন সোভিয়েট ইউনিয়নের গৌরবময় কৃতিত্বকে ম্লান করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উদ্ভাবন হলো শাখারভ। মার্ক্সবাদের পৌষমাসে বৌদ্ধিক পরিমন্ডল তখন এমনই বিষাক্ত! যখন গ্লাসনস্তের মুক্তি হাওয়া প্রকাশ করে দিল সোভিয়েট ব্লকের মানুষদের কমিউনিজমের প্রতি ঘৃণা কতো তীব্র, তখন পশ্চিমী বুদ্ধিজীবি ও সমাজবাদী দলগুলি যথার্থই বিস্মিত হলো। তার এতদিন বলে আসছিল সোভিয়েট ব্লকের মানুষদের অবস্থা পশ্চিমী দেশের মানুষদের থেকে কোনওমতেই খারাপ নয়।

সংবাদপত্রগুলি কখনই আমাদের যথার্থ চিত্র পরিবেশন করেনি। তার জন্য অবশ্য ডাহা মিথ্যা বলতে হয়নি তাদের। শুধু এড়িয়ে গেছে মূক কণ্ঠের স্বর। কমিউনিস্ট ডিক্টেটররা চাইতেন, আমরাও সেগুলি এড়িয়ে চলি। যাইহোক পশ্চিমী দেশের রাস্তায় রাস্তায় অনেক বেশী বিক্ষোভ দেখা যায় সোভিয়েট ব্লকের দেশসমূহে যা কদাচ দেখা যায়না। কারণ, পশ্চিমী দেশে বাক্ স্বাধীনতা অনেক বেশী, মানুষ অনেক বেশী নির্ভয়। ভারত ও মুসলিম দেশসমূহের সংখ্যা লঘুদের সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশনে একই ধরনের ভুল করার কোনও যুক্তি নেই।

কোনও কিছু ভাল ভাবে না দেখে পশ্চিমী সাংবাদিকরা মার্ক্সবাদী-মুসলিম সৌভ্রাত্রের মুখপাত্র

বনে যায়। এই মার্ক্সবাদী মুসলিম সৌভ্রাত্রই ভারতে রাজনৈতিক বাগধারা নিয়ন্ত্রণ করে। আমার ধারণা, কয়েকজন নামজাদা সাংবাদিক সচেতনভাবে এই সংবাদ বিকৃতির সহায়তায় যোগদান করেছেন। যেমন, ব্রায়ান ব্যারন কীভাবে তাঁর সংবাদচিত্রে সংবাদ বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁর নিদর্শন রেখেছেন ছোট্ট একটি ক্ষমার অযোগ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। রামজন্মভূমির জন্য বিশাল মিছিল (দিল্লী, ৪ ঠা এপ্রিল, ১৯৯১) দেখাতে গিয়ে তাঁর ক্যামেরা নিবদ্ধ করেছেন এক হিন্দু সন্ন্যাসীর বহন করা গেরুয়া পতাকার উপর, যার মাঝখানে ছিল একটি স্বস্তিকা। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের দৃষ্টি ভালভাবে আকর্ষণ করার জন্য মুখে বলেছেন হিন্দু আন্দোলনে স্বস্তিকা ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি অবশ্য জানতেন দুটি তথ্য: (১) পশ্চিমী দেশসমূহে দর্শকেরা শুধুমাত্র জানে স্বস্তিকা নাৎসীদের চিহ্ন, (২) স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতীয়রা স্বস্তিকা চিহ্ন ব্যবহার করে সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসাবে।

ব্যারন সুস্পষ্ট ভাবেই জানতেন, পশ্চিমী দর্শকদের তিনি এমন একটি সংবাদ পরিবেশন করছেন, যা হিন্দু আন্দোলনকারীরা মোটেই প্রেরণ করেননি: তিনি সুকৌশলে নাৎসীবাদের সঙ্গে হিন্দু আন্দোলনকে যুক্ত করে দিয়েছেন। এই ধরনের পরিবেশনের নৈতিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের অপলাপবাদী অংশ কীভাবে জগতের চোখে হিন্দুদের দুর্বৃত্ত বলে প্রমাণ করছে এ তারই নিদর্শন।

কীভাবে পশ্চিমী ভারত-দর্শকেরা ভারতীয় 'ধর্মেতরবাদের' তথ্য-বিকৃতি গলাধকরণ করে তার আরও কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি : রামজন্মভূমির সমর্থনে ১৯৯১ অব্দের ৪ই এপ্রিল তারিখে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়, তা পশ্চিমী সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমে শতকরা দশভাগও প্রচারিত হয়নি। আমি এ সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্ন করে জানলাম তাদের প্রাপ্ত টেলেকসে তিন লক্ষ বিক্ষোভকারীর কথা বলা হয়েছে (যদিও সরকারী পুলিশের মতে সংখ্যাটি ৮ লক্ষ) এবং বিক্ষোভের কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। ভারতীয় সংবাদসূত্রসমূহ ইচ্ছা করেই ব্যাপারটাকে ধোঁয়াটে ও তুচ্ছ করে উপস্থিত করেছে, যার ফলে পশ্চিমী সংবাদপত্রগুলি সরল বিশ্বাসে সংবাদটিকে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেনি। ছ সপ্তাহ পরে ব্রায়ান ব্যারন সংখ্যাটিকে ১০ লক্ষেরও বেশী বললেন। এটা ভাববার কারণ নেই যে ব্যারন তাঁর ভুল সংশোধন করলেন। ব্রায়ানের এই সংশোধনের উদ্দেশ্য গূঢ়। তিনি 'হিন্দু মৌলবাদকে' বিশালাকৃতি ডাইনোসর করে দেখাতে চান। টিভির দর্শকরা মুসলিম মৌলবাদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছেন। এখন তাদের কাছে যদি নতুন কোনও মৌলবাদকে দেখাতে হয় তবে তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণাঢ্য করে দেখাতে হবে। আর একটি উদাহরণ হলো, ১৯৯১ অব্দের উপসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কেভারতীয়দের মনোভাব সংক্রান্ত। বেলজিয়ান রেডিও BRTর দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা বলেছিলেন ভারতের জনগণ ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিপক্ষে এবং সাদ্দাম হোসেনের সমর্থক।এই কথাই কয়েক দিন আগে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে ভারতীয় জনগণ মোটেই সাদ্দাম হোসেনের পক্ষে ছিলেন না। আরবের সঙ্গে যুদ্ধে হিন্দুরা ইস্রায়েলকেই বাহবা দিয়েছে। এখন তারা সবাই আরব হিটলারের পরাজয়ের জন্য ব্যস্ত। ঐ আরব হিটলার ঘোষণা করেছিলেন তিনি ইস্রায়েলের অর্ধাংশ রাসায়নিক অস্ত্র দিয়ে পুড়িয়ে দেবেন। ইঙ্গ-মার্কিনদের বিরুদ্ধে সাদ্দামের জেহাদ সর্বতোভাবে মুসলমানদের সমর্থনও পাচ্ছিল না। কারণ সাদ্দামের কুয়েত দখলের ফলে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মুসলমান ইরাক ও কুয়েতে চাকুরী হারিয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ভারতের মুসলিম নেতাদের আরব বা কুয়েতই অর্থ যোগান। সুতরাং খোলাখুলিভাবে, বা সাদ্দামকে অস্বীকার করে তারা মনিবদেরই সমর্থন জানালেন। সুতরাং সাদ্দামকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে এলেন নেহরুবাদী প্রতিষ্ঠান সমূহ (তারা চন্দ্রশেখর সরকারকে বাধ্য করলো মার্কিন যুদ্ধ বিমানগুলিকে মুম্বইতে তেল নেওয়া বন্ধ করতে) এবং রক্তগত

মার্কিন বিরোধিতার জন্য কমিউনিস্টরা। সাদ্দামকে সমর্থনের একমাত্র ভারতীয় নজির হচ্ছে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা কলকাতা বন্দরে ধর্মঘট। আমাদের সংবাদপত্রসূত্র এটি উল্লেখ করলেন। তিনি এটি সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু টাইমস অফ ইন্ডিয়ার কোনও সন্দেহের অবকাশে মুক্তি নেই।

দিল্লীস্থ বিদেশী সংবাদপত্র সমূহের বোঝা উচিত হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম বা ভারতীয় বুদ্ধিজীবিরা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। তিব্বত বা চীনে গণতান্ত্রিক বিরোধিতা সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিশ্চয় কেউ পিপলস্ ডেলীকে কপি করেনা। কুর্দিশদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিশ্চয় কেউ ইরাকী বেতারের শরণাপন্ন হয়না। সুতরাং হিন্দু মনোভাব বোঝার জন্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া বা আলিগড় বা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিকদের উপর নির্ভর করা উচিত নয়।

যদি কোনও এক বিজয় সিং ধর্মেতরবাদী গালিগালাজ পূর্ণ 'হিন্দু মৌলবাদ ভারতের এক আতঙ্ক' নামক একটি সন্দর্ভ লেখেন লা মন্ডে ডিপ্লোম্যাট পত্রিকায়, তাহলে সেটা হিন্দু ধর্মকে কলঙ্কিত করার জন্য কায়েমী স্বার্থের মানসিকতার প্রতিফলন ছাড়া অন্য কিছুই নয়। যদিও এই সন্দর্ভটাই বিদেশের পাঠকের কাছে ভারত সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল লেখকের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য বলে গ্রাহ্য হবে। যদিও সন্দর্ভটি দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম আবদুল্লা বোখারীর আদৃত রাজনৈতিক দল জনতা দলের (ব্যঙ্গ করে অনেক সময় জিন্না দলও বলা হয়) রাজনীতিবিদ রাজমোহন গাঁধীর আন্ডারস্টান্ডিং দি মুসলিম মাইন্ড নামক পুস্তকের প্রস্তাবনা অধ্যায়টি থেকে ঋণস্বীকার ব্যতিরেকে উৎকলন ছাড়া কিছুই নয়। ঐতিহ্যসম্পন্ন ঐ ফরাসী পত্রিকার আর একটি সংকলনে শ্রীমতি ফ্র্যানসিন আর ফ্রাঙ্কেল ভায়োলেন্ট অফেন্সিভ অফ হিন্দু একসট্রিমিস্ট নামক সন্দর্ভে হিন্দুদের সম্পর্কে উগরে দিয়েছেন যাবতীয় বস্তাপচা গালাগাল। এ ক্ষেত্রেও তিনি সংবাদের ভারতীয় সূত্র ভালভাবে অনুধাবন না করে নির্ভর করেছেন কিছু একদেশদর্শী পুস্তিকার উপর। এটা একটা লজ্জাজনক ব্যাপার যে পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমগুলি এই ধরনের উদ্দেশ্যপরায়ণ সংবাদবিকৃতি সর্বদা গলাধকরণ করছেন বা পুনরুৎপাদন করছেন। পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যমগুলি ভারত সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সহজে প্রতারিত হওয়ার মত নির্বুদ্ধিতা অপলাপবাদীদের সুবিধাজনক মুখোস পরিধানের সুযোগ করে দিচ্ছে। বেশীভাগ ভারতবাসীই মনে করে পশ্চিমী বুদ্ধিজীবিরা যথেষ্ট বিষয়ানুগ এবং যথাযথ। যদিও এই ধরনের ভারত সম্পর্কীয় বিষয়ে তারা যথেষ্ট অজ্ঞ এবং অনুপযুক্ত। এইভাবে কৌশলে সৃষ্ট বহির্বিশ্ব থেকে অপলাপবাদীরা সমর্থন সংগ্রহ করে এবং সাধারণ ভারতবাসীরা মনে করে সেই সমর্থন যথাযথ। হিন্দু নেতৃত্ব যদি ভারতের রাজনৈতিক শক্তিসজ্জার মানসিক দিকটি উপলব্ধি করে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমগুলির কাছে যথাযথ তথ্য জ্ঞাপন করে এবং ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ইসলামী-স্টালিনবাদী দখল সম্বন্ধে তাদের শিক্ষিত করতে পারে, তাহলেই প্রতারণার এই বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে তারা।

গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যমগুলির ভারত বিরোধী সংবাদ পরিবেশনের আংশিক কারণ অবশ্যই দুই দেশের হিন্দু বিরোধী পাকিস্তান সমর্থনকারী রাজনৈতিক মানসিকতা। যেমন মর্যাদাপূর্ণ ব্রিটীশ পাক্ষিক দি ইকনমিস্ট পত্রিকায় জাতীয়তাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ সম্পর্কে একটি সন্দর্ভে পাকিস্তান সৃষ্টিকে যুক্তিযুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে (এবং ব্রিটীশ মুসলিমরা তাদের পিতামহদেরই অনুকরণ করছে। তারা ব্রিটেনের মধ্যে একটা পাকিস্তান চাইছে ঐ একই যুক্তিতে)। সবচেয়ে বড় কারণ অবশ্যই কোনও উপযুক্ত ও বাগ্মী মুখপাত্রের কাছ থেকে তারা ভারতীয় ঘটনাবলীর বিশুদ্ধভাষ্য জানতে পারছেনা। কারণ, প্রথমতঃ জাতীয় ইংরেজী পত্রপত্রিকা গুলিতে হিন্দু মানসিকতার

প্রবেশ দুঃসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যমগুলির দিল্লীর সংবাদদাতারা এই সব জাতীয় সংবাদপত্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে। সরেজমিনে তদন্ত করে সংবাদ সংগ্রহ করার পরিশ্রম তারা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। তৃতীয়তঃ জনসংযোগের উপযোগীতা সম্পর্কে হিন্দুরা এখনও সচেতন নয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সম্ভবতঃ ইউরোপের রাজনৈতিক পরিমন্ডল। যে পরিমন্ডল দাবী করে জাতি বিদ্বেষ বিরোধিতা ও বহুসংস্কৃতিবাদ। সেই পরিমন্ডলে সবচেয়ে চোখ ধাঁধানো ও ওজস্বী অতিথি সংস্কৃতি হিসাবে ইসলাম প্রশংসিত হয়। ইসলামী ধর্মনেতার মুখোস না উন্মোচন করার বাধ্যবাধকতার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে খ্রীষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিদের অবিরত পীড়নের সংবাদও পশ্চিমী খ্রীষ্টান সংবাদপত্রগুলিতে স্থানলাভ করেনা। ইসলামের সঙ্গে সমঝোতার এক কাল্পনিক প্রত্যাশায় ইউরোপের খ্রীষ্টানরা লালন করে চলে। সেজন্য তারা মুসলিম দেশসমূহে সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুসলিম ভাইদের অস্বস্তির মধ্যে ফেলতে চায়না। এখন এই পশ্চিমী খ্রীষ্টানরা যদি তাদের তাড়িত ভ্রাতাদের সমর্থনে এগিয়ে না আসে, তাহলে পৌত্তলিক হিন্দুদের নিয়ে তারা কোনওরকম ভাব-নাটিকা করবে না, এতে আশ্চর্য কী?

কাজে কাজেই এইসব পশ্চিমী ভারত দর্শকরা আক্রমণকারীদেরই পা চাটে, সমসাময়িক সংবাদগুলিকে বিকৃত করে চলে। এবং অনেক সময় ছাত্রপাঠ্য পুস্তকেও ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ মুসলমানদের মুখের দিকেচেয়ে যথেষ্ট বিকৃত করে। যদিও তারা ভারত-মার্কা অপলাপবাদ উৎপাদন করেনা, কিন্তু ঐ অপলাপবাদকে সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত করে।

অসুবিধাজনক পুস্তকসমূহ বাজেয়াপ্ত করা

বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতির পরিণামস্বরূপ কোনও মোল্লা বা মুসলিম রাজনীতিবিদদের সামান্য অঙ্গুলী হেলনে ইসলাম সম্পর্কে সমালোচনামূলক যাবতীয় পুস্তক সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়। সৈয়দ সাহাবুদ্দিনের আপত্তিতে সলমন রুশদীর সাটানিক ভার্সেস বাজেয়াপ্ত করা এই ধরনের উপসর্গের উদাহরণ। পৃথিবীর মধ্যে যে সব দেশ স্যাটানিক ভার্সেস পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করেছে ভারত তাদের মধ্যে প্রথম। বিনিময়ে অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সঙ্গে ছিল অযোধ্যা অভিমুখে সাহাবুদ্দিনের অভিযান প্রত্যাহার। অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে আছে কিছু সত্যসন্ধী পুস্তিকা। যেমন, কলিন মেনের (Colin Maine) দি ডেড হ্যান্ড অফ ইসলাম, বা, অরবিন্দ ঘোষের দি কোরান অ্যান্ড কাফির। দি কোরান অ্যান্ড কাফিরে আছে কাফেরদের জন্য কোরানে রক্ষিত বাক্যাবলী। এছাড়া বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কিছু মর্যাদাপূর্ণ প্রকাশন। যেমন রিচার্ড ম্যাক্সওয়েল ইটনের দি সুফিস অফ বিজাপুর। সুফিরা এক ধরনের উদার ইসলামের প্রচারক--সাধারণের মধ্যে প্রচারিত এই ধরনের কল্পধারণার অবসান ঘটানো হয়েছে ইটনের মূল্যবান পুস্তকে (বস্তুতঃ পক্ষে সুফিরা ধর্মান্ধ ইসলাম প্রচারকই নয়, তারা সবসময় শাসকদের গুপ্তচর এবং ভাড়াটে সৈনিক)।

১৯৯১ অব্দের মার্চে রাম স্বরূপের *Understanding Islam through Hadis* পুস্তকটি নিষিদ্ধ করা হলো। তার আগের বছর নিষিদ্ধ করা হয়েছিল পুস্তকের হিন্দী সংস্করণ। পুস্তকটি সহী মুসলিম নামক প্রামাণ্য হাদিশ সংকলনের বিশ্বাসযোগ্য সারমর্ম ছাড়া কিছুই নয়। মৌলবাদী জামাত-ই-ইসলামীর মতে পুস্তকটির মধ্যে বিকৃতি ও চরিত্র হনন আছে। উদাহরণস্বরূপ তারা কয়েকটি পঙ্ক্তি উৎকলিত করেছে, "মুহাম্মদ জয়নাবকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করলেন এবং তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন।" এই উৎকলনের সাহায্যে মৌলবাদীরা একটি আন্দোলন গড়ে তুললো এবং পুস্তকটি নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে উৎকলিত বাক্যটি সরাসরি এসেছে আসল হাদিশ থেকে। ওটা কোনও

রকম চরিত্র হনন করার জন্য তথ্য বিকৃতি নয়।

পুস্তকটির বিরুদ্ধে আন্দোলন মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের চোখ খুলে দেয়।

তা হলো আমাদের সাধারণ মুসলমানরা কোরান হাদিশ সম্পর্কে যথেষ্ট অজ্ঞ। অন্যান্য অমুসলমানদের মত তারা যে নৈতিকতায় বিশ্বাসী সেই নৈতিকতাই অভিক্ষেপ করে তাদের প্রিয় পয়গম্বর মুহাম্মদের উপর। ফলে এক আদর্শ মুহাম্মদের মানসছবি তাদের মনে চিরজাগরুক। ঐতিহাসিক মুহাম্মদের সন্মুখীন হলেই সে মর্মপীড়িত হয়ে যায়।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এই কোরান-হাদিশ সম্পর্কে অজ্ঞতা, এটি দূর করার প্রয়াসেই পুস্তকটি প্রকাশ করা হয়েছিল। কারণ, ভারতীয় সংবিধানে মুক্তচিন্তার বিকাশের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নেহরুবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহ (যাদের মধ্যে আছে কংগ্রেস ও তার লেজুড় জনতা দল) ইসলামী তত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কে কোনও মুক্তচিন্তায় বিশ্বাস করেনা। প্রশাসন ধর্মেতরবাদের কথা সর্বদা উচ্চারণ করলেও সর্বদা ধর্মান্ধ মুসলিমদের কাছে নতি স্বীকার করে। তথাকথিত ধর্মেতরবাদী বুদ্ধিজীবিরা কেউই পুস্তক নিষিদ্ধ করার এই মধ্যযুগীয় পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন না। এই ধরনের তথ্যঋদ্ধ পুস্তক নিষিদ্ধ করার সরকারী যুক্তি হলো, এগুলি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোনও ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার জন্য লিখিত হয়েছে (ভারতীয় দন্ডবিধির ১৫৩ এ এবং ২৯৫ এ ধারার অপরাধ)। ফৌজদারী কার্যবিধির ৯৫ ধারা অনুযায়ী প্রশাসন এই ধরনের পুস্তকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু সরকারী প্রশাসন-অস্ত্রটি তার ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধেই উঁচিয়ে ধরা যেতে পারে। কারণ, অনেকের মতে, একটি পুস্তক আছে যা ভারতীয় দন্ডবিধিতে বর্ণিত যাবতীয় বর্ণনা পরিপূরণ করে। এমনকি যেসব পুস্তক ঐ অভিযোগে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার চেয়েও বেশী। ঐ পুস্তকটির নাম কোরান। কিন্তু ঐ পুস্তকটি সরকারী অনুদান সম্বলিত বিদ্যালয়সমূহে পাঠ ও আবৃত্তি করা হয়। ভারতের গ্রাম ও সহরে প্রার্থনাগৃহে আবৃত্তি করা হয় অসাধারণ মর্যাদার সঙ্গে।

১৯৮৪ অব্দে এক ভারতীয় নাগরিক এইচ. কে. চক্রবর্তী কোরানকে নিষিদ্ধ করার জন্য একটি দরখাস্ত করলেন। তিনি ঐ দরখাস্তে যোগ করলেন কোরানের ৩৭ টি বচন যা ভারতীয় দন্ডবিধির ভাষায় "নিষ্ঠুরতা শিক্ষা দেয়, বলপ্রয়োগকে উৎসাহিত করে এবং জন-শান্তি বিঘ্নিত করে;" এর মধ্যে ১৭টি বচন "ধর্মের কারণে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতার বোধ, ঘৃণা এবং কুমৎলব বৃদ্ধি করে"। ৩৭ টি বচন "অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমানিত করে"। বারংবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দরখাস্তের কোনও জবাব দেয়নি।

এইবার শ্রী চক্রবর্তী অহিংসায় দৃঢ় বিশ্বাসী জৈন সম্প্রদায়ের শ্রী চাঁদমল চোপরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। শ্রী চোপরা বাঙলাদেশের হিন্দুদের দুরাবস্থা চিন্তা করে কোরান পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। কারণ, তারা ক্রমাগত পিতৃপুরুষের দেশ থেকে মুসলিমদের দ্বারা তাড়িত হয়ে ভারতে উদ্বাস্তু হচ্ছে। ১৯৮৫ অব্দে চাঁদমল চোপরা কোরান নিষিদ্ধ করার জন্য কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করলেন। দরখাস্তে তিনি কোরানের আপত্তিকর বচনের একটি তালিকা দিলেন: ১ থেকে ৮ বচনের ২৯ টি অংশ যা কাফেরদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ প্ররোচিত করে, ১৫ টি অংশ যা শত্রুতা বৃদ্ধিকরে, ২৬ টি অংশ যা অন্য ধর্মকে অপমান করে। শ্রী চাঁদমল চোপরা তাঁর দরখাস্তে বলেছিলেন, কোরানের উল্লিখিত অংশসমূহ...মুসলমানদের মনে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও ধর্মান্ধতা উদ্রেক করে, যা রূপান্তরিত হয় খুন, গণহত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও পবিত্র স্থানসমূহ ধ্বংস ও অপবিত্র করায়।

এই দরখাস্ত কলকাতা ও অন্যত্র প্রচুর শোরগোল সৃষ্টি করলো। মুসলিম জনতা রাস্তায় বেরিয়ে

এসে বিক্ষোভ দেখালো বহুস্থানে। সরকার বাপারটাতে হস্তক্ষেপ করলো এবং চাপ সৃষ্টি করলো বিচার-ব্যবস্থার উপর। দরখাস্তকারীর জীবনে কিছু আপত্তিকর ব্যাপার আছে কিনা দেখার জন্য কাজে লাগানো হলো সিক্রেট সার্ভিসকে। পশ্চিমবঙ্গের মার্ক্সবাদী সরকার তার এফিডেবিটে বললো, কোরান হলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাক্য, যা তাঁর শেষ পয়গম্বর মুহাম্মদের কাছে উন্মোচিত করেছেন।....যেহেতু পবিত্র কোরান একটি দৈবী গ্রন্থ, কোনও পার্থিব শক্তি তার বিচার করতে সক্ষম নয়, এই গ্রন্থের বিচার কোনও আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়েনা।"

এই ভিত্তিতে জজ দরখাস্তটি বাতিল করে দিলেন: "কোরান নিষিদ্ধ বা বাতিল করলে মুসলিম ধর্মকেই বাতিল করা হয়।" জজ আরও বললেন: "বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্য রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি বাধাস্বরূপ নয়। কোরানের জন্য জন-শান্তি আজ পর্যন্ত কোথাও বিঘ্নিত হয়নি।"

দরখাস্তকারী আদালতের এই রায়ই প্রত্যাশা করেছিলেন। রাজনৈতিক চাপের জন্য কোরান বিরোধী রায় অচিন্তনীয়। তাছাড়া ভারতীয় দন্ডবিধি ধর্মগ্রন্থ ও চিরায়ত সাহিত্যকে বিচারের আওতার বাইরেই রেখেছে। দরখাস্তকারী পুস্তক নিষিদ্ধ করার পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নন, তাঁর মামলা করার উদ্দেশ্য কোরানের বিষয়বস্তুর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ: জনসাধারণ গ্রন্থটি পড়ুক। কারণ, ভারতের নাগরিকদের জানা প্রয়োজন কেন তাদের দেশে অবিরত দাঙ্গা ঘটে যাচ্ছে।

তারপর চাঁদমল চোপরা যখন রায় সমেত তাঁর মামলার নথিপত্র প্রকাশ করলেন, তখন প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিল তাকে অভিযুক্ত করবে, হুবহু সেই ধারায়, যে ধারায় তিনি নিজে মামলা করেছিলেন।

এইচ. কে. চক্রবর্তী ও চাঁদমল চোপরার দরখাস্ত ছাড়াও, তৃতীয় একটি সূত্র কোরানের বলপ্রয়োগের তত্ত্বর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেটি ১৯৮৬ অব্দে দিল্লীতে প্রকাশিত একটি পোস্টার। সেটি প্রকাশ করেছিলেন হিন্দু মহাসভার দুই প্রমুখ সদস্য আই. এস. শর্মা ও রাজকুমার আর্য। পোস্টারের শিরোনাম ছিল, আমাদের দেশে দাঙ্গা লাগে কেন? এতে দেখানো হয়েছিল ২৪ টি কোরানের বাক্য। যেমন, *হে বিশ্বাসীগণ! অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। জেনে রাখ যে আল্লাহ্ সাবধানীদের সঙ্গে আছেন (৯/১২৩) । অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে পৌত্তলিকদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা (অনুতাপ) করে, যথাসময়ে নমাজ পড়ে ও যাকাত দেয় (দান করে) তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯/৫)।*

ভারতীয় দন্ডবিধির ১৫৩ এ ও ২৯৫এ ধারা অনুসারে দুই প্রকাশককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা মুক্তি পেয়েছিলেন। জজ রায় দিলেন যে "তাঁরা সঙ্গত সমালোচনা করেছিলেন। কারণ, পবিত্র কোরানের প্রতি যাবতীয় সম্মান প্রদর্শন করেও বলতে হয় যে কবিতাগুলির নিবিড় পাঠে দেখা যায় এগুলি সত্যই ক্ষতিকর এবং বলপ্রয়োগ শিক্ষা দেয় এবং মুসলিম ও অন্যান্যদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম।"

প্রশাসন এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল।

কোরানের সমালোচনা অপলাপবাদীদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দেয়। কারণ, সমসময়ে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ধর্ম-রাজনৈতিক সংঘর্ষের পশ্চাৎ প্রক্ষেপণ হিসাবে মুসলিম ও পৌত্তলিকদের দ্বন্দ্বকে দেখানো যায়না। ঐতিহাসিকভাবে এই দ্বন্দ্ব মুহাম্মদের মৃত্যুর পরও সৃষ্টি হয়নি এবং এই দ্বন্দ্বকে সমাজ-রাজনৈতিক কারণের গন্ডীতেও আবদ্ধ করা যায়না। এই শত্রুতার উৎস ইসলামী তত্ত্বের অভ্যন্তরে।

কোরানীয় তত্ত্ব সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার পরে আমরা দেখি অপলাপবাদীদের তত্ত্ব যে শুধুমাত্র প্রচুর সাক্ষ্যের দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়েছে তাই নয়, এই তত্ত্ব যুক্তির বিচারেও ভ্রান্ত। কারণ, অপলাপবাদীদের তত্ত্ব হচ্ছে ইসলাম ভারতে ধারাবাহিকভাবে অন্য ধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষে (পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে) রত নয়। এই তত্ত্ব দাবী করছে, ইসলাম ভারতে এসে নিজের নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় এবং নিজের চরিত্র বিরোধী কাজ করে যায়। যুক্তিযুক্তভাবে এটাই ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে ইসলাম ভারতেও স্ব-ভাব বজায় রাখবে (অর্থাৎ, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে; অন্য ধর্মের লোকেদের তাড়িত করবে)। ইসলাম ভারতে এসে স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করলে তার সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু যা কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে তা ইসলামের স্বভাবের ব্যত্যয় প্রমাণ করেনা। মুসলিম আক্রমণকারীরা ও শাসকেরা যথাসম্ভব কোরানের বিধান অনুযায়ীই কাজ করে গেছেন।

কোরানের সমালোচনা নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এটা একটি পুরাতন ইসলামী নীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা। ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে সিরিয়ার খ্রীষ্টানরা যখন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়, তখন ঐ জিম্মিদের অন্যান্য বহু অঙ্গীকারের মত অঙ্গীকার করতে বাধ্য হয় যে "আমাদের সন্তানদের কোরান পড়তে শেখাবো না।" মুহাম্মদের মত তাঁর উত্তরসুরীরাও বুঝেছিলেন, কোরানের বচনের নীতিহীনতা ও পরস্পরবিরোধিতার অভিযোগের মোকাবিলা করা সহজ ব্যাপার নয়। সংবেদনশীল কাফেররা এই ধরনের অভিযোগ তুলবেই। সুতরাং এটা যুক্তিযুক্ত যে ভবিষ্যতের ইসলাম সমালোচনা এড়াতে তারা অমুসলমানদের কোরান পাঠ নিষিদ্ধ করে দেবে। ধর্মবাদী খলিফারা ইসলামের বিরুদ্ধ সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে যা করেছিলেন, ধর্মেতরবাদের নামে ভারতে এখন তারই প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।

অপলাপবাদীদের দ্বিতীয় রণক্ষেত্র

ইসলামের অপরাধকে অস্বীকার করার পরে অপলাপবাদীরা বিশাল চেষ্টা করছে একটা ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার যে হিন্দুধর্ম যে অপরাধের জন্য ইসলামকে অভিযুক্ত করে নিজে সেই অপরাধেই অভিযুক্ত। যদি কখনও মুসলিম ধর্মান্ধতাকে স্বীকার করতে হয়, আত্মরক্ষার দ্বিতীয় একটি ওজর তৈরী: হিন্দুরাও সমান ধর্মান্ধ!

উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে আপনি প্রায়ই পড়বেন "নালন্দা বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করেছিল হিন্দুরা।"

এটা একটা নির্জলা মিথ্যা। বেশ কয়েকটি হিন্দু রাজবংশের সময় নালন্দা বিহার ফুলে ফেঁপে ওঠে। বহু শতাব্দী ধরে নালন্দা বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজী কর্তৃক বিহারটি ধ্বংস হয়। কিন্তু একটি মিথ্যা যদি বারংবার বলা হয়, তবে মিথ্যাটা সত্য বলে চলে যায়। এখন অনেক ভারতীয় বিশ্বাস করেন হিন্দু ধর্ম বলপ্রয়োগ করে বৌদ্ধধর্মকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম ভারতে চিরকাল সংখ্যালঘিষ্ঠ ধর্ম—এই ধর্ম সীমাবদ্ধ ছিল অভিজাত ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ১২০০ অব্দে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবার আগে পর্যন্ত এটি আংশিকভাবে হিন্দু ধর্মের মূল ধারার সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছিল। অথবা, এটি হিন্দুদের অন্যান্য উপাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছিল--বহুক্ষেত্রে একই মন্দির-প্রাঙ্গণ ব্যবহার করে। মূলস্রোত হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের সংঘর্ষের ঘটনাগুলি এক হাতের কড়ে গোনা যায়। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মকে তাড়িয়েছে 'ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আঘাত' নয়, ইসলাম। মধ্য এশিয়ায় নেস্টরবাদ, ম্যানিকীবাদ ও জরথুস্ত্রবাদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মকে মুছে ফেলে দিয়েছে ইসলাম। প্রতিমার ফার্সী প্রতিশব্দ বুত এসেছে

'বুদ্ধ' থেকে। কারণ, তাদের বুদ্ধমূর্ত্তি সমেত বৌদ্ধরা চূড়ান্ত পৌত্তলিক বলে গণ্য হতো মুসলিমদের কাছে। তাদের অহিংস নীতি অনুসারে বৌদ্ধরা বুত-শিকন (মূর্তি ধ্বংসকারী) মুসলমানদের কোনও রকম বাধা না দেওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের ক্রোধের শিকার হয়েছিল। মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ-অতীতের চিহ্ন হিসাবে থেকে গেছে কিছু শব্দ। যেমন, বুখারা সহরটির নাম বিহার বা বৌদ্ধ মঠের শব্দের অপভ্রংশ। ভারতে বৌদ্ধধর্ম অন্যান্য উপাসক সম্প্রদায়ের চেয়ে সহজ আক্রমণযোগ্য ছিল। কারণ, বৌদ্ধধর্ম কেন্দ্রীভূত ছিল তাদের মঠকে ঘিরে। মঠকে ধ্বংস করে সন্ন্যাসীদের বধ করলেই গোটা সম্প্রদায়ের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যেত। ফলে, ইসলামের চাপে সহজেই ইসলামায়িত হয়ে যেত তারা।

বেশ কিছু অপলাপবাদী ঐতিহাসিক হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মরিয়া হয়ে গেছেন এবং হিন্দুরা যে অন্য সম্প্রদায়কে তাড়িত করেছিল, তার উদাহরণ সংগ্রহ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমরা সেই সব বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করবো। আমার জ্ঞানমত হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যকার তাড়নার ঘটনাগুলির সারমর্ম রামশরণ শর্মা সম্পাদিত কম্যিউন্যাল হিস্ট্রী অ্যান্ড রামা'স অযোধ্যা পুস্তকে হরবন্স মুখিয়ার কম্যিউন্যালিজম অ্যান্ড দি রাইটিং অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী অধ্যায়ে এবং রোমিলা থাপারের কালচারাল ট্রানস্যাকশন অ্যান্ড আরলী ইন্ডিয়া অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে। রোমিলা থাপারের মতে, "ধর্মীয় সহনশীলতা ও অহিংসার পরম্পরা হিন্দু ধর্মের চরিত্রগত উপাদান, এ বক্তব্য ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়।" তাঁদের উদ্দেশ্যসাধনের দৃঢ়তা দেখে ধরে নেওয়া যেতে পারে তাঁদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম এমন কোনও উদাহরণই তাঁরা বাদ দেননি।

তাঁদের প্রদত্ত দুটি সবথেকে জ্ঞাত উদাহরণ, পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ও শশাঙ্ক, ঐতিহাসিকদের সমালোচনার ঘাত সহ্য করতে সক্ষম নয়। আমি এই দুটি উদাহরণ নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। তবুও সংক্ষেপে এখানে আমার সমালোচনা উপস্থাপিত করছি:

'ঘটনা' ঘটার তিন শতাব্দী পরে লেখা পুষ্যমিত্র সম্বন্ধে গল্প—তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের খন্ডিত মাথার উপর অর্থ প্রদান করতেন, ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা সমর্থিত নয়। ঐতিহাসিক তথ্য বলে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ তাঁর রাজত্বের বৌদ্ধ বিহার ও মঠের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বৌদ্ধ অশোকের বৌদ্ধ ধর্মের উদাত্ত পৃষ্ঠপোষকতার পরে হিন্দু শুঙ্গদের আমলে নিশ্চয় বৌদ্ধ ধর্ম ততোটা পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছিল না। কিন্তু সেটা এক ব্যাপার আর বৌদ্ধদের তাড়না করা আর এক ব্যাপার। বৌদ্ধ ধর্মের বিখ্যাত ঐতিহাসিক এটিয়েন লামটের (Etienne Lamotte) এর মতে "প্রাপ্ত তথ্যের বিচারে পুষ্যমিত্রকে অবশ্যই মুক্তি দিতে হয়।"

পুষ্যমিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ বজায় রাখার একমাত্র যুক্তি, "যা রটে তার কিছুটা তো বটে।" কিন্তু এই ধরনের জ্ঞানগর্ভ উচ্চারণ প্রত্যেক অযথা কলঙ্ক-রোপণের ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়।

চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ শুনেছিলেন কয়েক বছর আগে মহারাজ শশাঙ্ক বিহারের বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করেছেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হত্যা করেছেন, বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র চিহ্নসমূহ ধ্বংস করেছেন। কিন্তু হিউয়েন সাঙ নিজেই লিখেছেন, শশাঙ্ক বুদ্ধের পদচিহ্ন সম্বলিত একটি পাথর নদীর জলে ফেলে দেন। কিন্তু পাথরটি অলৌকিক ভাবে নদী থেকে ফিরে আসে। তিনি বোধিবৃক্ষটিকে কেটে ফেলে দেন। কিন্তু অলৌকিকভাবে একটি ছোট ডাল থেকে বৃক্ষটি রাতারাতি পুরোপুরি গজিয়ে ওঠে।

এই অলৌকিকতাকে বাদ দিলে যা থাকে তা হলো, ঐ চৈনিক তীর্থযাত্রী বুদ্ধপদলাঞ্ছিত প্রস্তর ও বোধিবৃক্ষ দুই-ই পরিপূর্ণ মহিমায় দর্শন করেছিলেন। সুতরাং শশাঙ্ক কর্তৃক বোধিবৃক্ষ ছেদন নিতান্তই গল্প—অলৌকিকতার কথা বলে হিউয়েন সাঙ নিজেই তাঁর কল্প-ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করে বসেছেন। হিউয়েন সাঙ অতিরঞ্জন ও অলৌকিক ঘটনা বর্ণনার জন্য কুখ্যাত। তাঁর নিজের

দেশ চীনে যখন বৌদ্ধধর্মের রমরমা অবস্থা তখন বৌদ্ধধর্মের জন্মস্থান ভারতে তার কেন এতো দুরবস্থা তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব তার উপর বর্তেছিল। হিউয়েন সাঙের বক্তব্য বিচার করার শ্রেষ্ঠ ভিত্তি হচ্ছে যে, তাঁরই লেখা গঙ্গা উপত্যকায় সাধারণ বর্ণনার মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম যে তাড়িত এমন কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়না।

তৃতীয় কাহিনী--দ্বাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরের রাজা হর্ষের ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে সত্য, কিন্তু এর সঙ্গে ধর্মীয় তাড়নার কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি বুদ্ধের মন্দির সমেত যাবতীয় হিন্দু মন্দির লুট করতেন--মন্দির অপবিত্র না করে বা মন্দিরের পুজারীদের ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়েই।এটা হচ্ছে এক বাস্তব ঘটনা যেখানে দেশের শাসক অর্থলোভেই মন্দির লুট করতেন। এর সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই।ঐতিহাসিক কলহন এই কাহিনী বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন, তাঁর তুর্কী কর্মচারীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তিনি তুর্কীদের মতই আচরণ করেছেন। হর্ষ তুর্কী ভাড়াটে সৈন্য নিযুক্ত করেছিলেন (তার জন্য তাঁর উত্তরাধিকারীদের দুঃখভোগ করতে হয়েছিল; কারণ, ঐ সৈন্যরা গুপ্তচরগিরি করতো এবং শেষ পর্যন্ত দেশের ক্ষমতা দখল করেছিল) যাদের বিবেকের সঙ্গে মন্দির লুট করার ব্যাপারে খ্যাতি ছিল।

চতুর্থ কাহিনী পারমার রাজা সুভাতবর্মনের গুজরাট আক্রমণ। এই আক্রমণে দাভয় ও কাম্বেতে বহু জৈন মন্দির লুট করা হয়েছিল (ধ্বংস বা অপবিত্র করা হয়নি)। হরবন্স মুখিয়া এই উদাহরণ দেখিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, "বহু হিন্দু রাজা মুসলমানরা তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হবার আগেই একই কাজ (অর্থাৎ, মুসলমানদের মত মন্দির ধ্বংস ও অপবিত্র করা) করেছেন।" কিন্তু এটা ঘটনা যে যখন সুভাতবর্মন সিংহাসনে বসেছেন তার অনেক আগেই মুসলমানরা ভারতে এসে গেছে। মুহাম্মদ ঘুরী তখন উত্তর ভারত ধ্বংস করছেন। মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগেই হিন্দুরা এ কাজ করেছে, এ ঘটনা তার প্রমাণ নয়। ঘটনার বিবরণ সত্য হলেও এগুলি মন্দির ধ্বংস বা অপবিত্র করণের ঘটনা নয়, লুটের ঘটনা; এবং কাশ্মীর রাজ হর্ষের ঘটনার মতই: তুর্কীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুভাতবর্মন তুর্কীদের মতই আচরণ করেছিলেন।

আরেকটি ঘটনা হলো অযোধ্যায় শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে পৌনঃপুনিক সংঘর্ষের ঘটনা। অধ্যাপক রামশরণ শর্মা ১৮০৪ অব্দের ঘটনা থেকে বর্ণনা দিয়েছেন, যার মধ্যে আছে 'সৈনিকেরা যুদ্ধে আনন্দ পাচ্ছে," "দুঃখ,""প্রচন্ড ভয়াবহ," এবং "গুপ্তস্থানে আশ্রয় নেওয়া," ইত্যাদি শব্দাবলী। কিন্তু সংঘর্ষে কতজন মারা গিয়েছিল তা বলা হয়নি। কোনও মৃত্যুর কথা বলা হয়নি এই বিস্তৃত বর্ণনার মধ্যে। কিন্তু অধ্যাপক শর্মা নিবন্ধের শেষে লিখেছেন, "উল্লিখিত অনুচ্ছেদ মধ্যযুগীয় হিন্দু নেতাদের সহনশীলতার কল্পধারণা ভেঙ্গে দিতে যথেষ্ট।"

হিন্দু পরম্পরায় স্বীকৃত যে অযোধ্যায় শৈব-বৈষ্ণব সংঘাত একসময় নগরের শান্তি বিঘ্নিত করেছিল। এই পটভূমিকায় রাম-চরিতমানস লিখতে মনস্থ করেছিলেন তুলসীদাস। শৈব-বৈষ্ণব ভেদাভেদের কৃত্রিম ও আপাত চরিত্র প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তুলসীদাস তাঁর রাম আখ্যানের কথক হিসাবে উপস্থাপিত করেছিলেন দেবাদিদেব মহাদেবকে। কারণ, শিব ও বিষ্ণু এক এবং অভিন্ন, এটা তাঁর ভক্তরা যদি উপলব্ধি না করে থাকেন তবে তাঁদের জানা উচিত। ইসলাম ও হিন্দু বিভেদের ক্ষেত্রে কোনও ইসলামী তত্ত্ববিদ কখনও বলেননি, শিব ও আল্লা এক, বা রাম ও রহিম এক বা কাবা ও কাশী এক। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দেবতা এক, এই মানসিকতার অভিক্ষেপই হলো সর্ব ধর্ম এক। এর পাশে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয় সম্পর্কে ইসলামী ধারণা একান্তই বেমানান। রাম-রহিমের বিরোধিতা, কাবা ও কাশীর বিরোধিতা অসংখ্য তাড়না ও দেশবিভাগের জন্ম দিয়েছে। শৈব ও বৈষ্ণবের বিরোধিতা এ ধরনের কোনও কিছু সৃষ্টি করেনি। অধ্যাপক শর্মা যা বর্ণনা করেছেন তা

বড়জোর একটা দাঙ্গা--ফুটবল খেলায় বিভিন্ন ক্লাবের সমর্থকরা যে ধরনের দাঙ্গা করে তার চেয়ে বড় ধরনের কিছু নয়। মার্ক্সবাদীদের কাছে যা প্রত্যাশিত, তারা সত্য ঘটনা জনসাধারণকে না জানিয়ে ঘটনা বিকৃত করে জনমানসকে বিপথে চালিত করবে, এ ক্ষেত্রে সেই প্রত্যাশার ব্যত্যয় ঘটেনি। যেমন, রোমিলা থাপার লিখেছেন, শৈব সন্ত জ্ঞান সম্বান্দার প্যাণ্ডীয় রাজা অরিকেশরী পরানকুশ মারাবর্মনকে জৈন ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। এবং এটা বলা হয় যে, ঐ রাজা ৮০০ জৈন ধর্মীকে শূলে চড়িয়েছিলেন। অধ্যাপিকা ভদ্রমহিলা জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে যা দুরে রেখে ছিলেন তা হলো সন্ত সম্বান্দার জৈনদের হারিয়েছিলেন আসল যুদ্ধে নয়, বাক যুদ্ধে (যার ফলে রাজা জৈন ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মে ফিরে আসেন)। আর সন্ত সমবান্দার জৈনদের আক্রমণ থেকে কোনও ক্রমে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। মুসলিমদের তাড়নার বিপরীতে এই শৈব-জৈন দ্বন্দ্ব সুস্পষ্টভাবেই একপেশে ঘটনা নয়। হিন্দুদের উপর কলঙ্ক রোপনের জন্য বৌদ্ধ ও জৈনদের অসহায় বলি হিসাবেই দেখাতে হবে, এবং অন্তঃহিন্দু দ্বন্দ্বে তাদের বানাতে হবে গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা।

এটা একটা বিতর্কের বিষয় যে হিন্দুদের দ্বারা এইসব তাড়নার ঘটনাগুলি আদৌ ঘটেছিল কিনা। হিন্দুরা কখনও সচেতন ইতিহাসকার নয়। হিউয়েন সাঙ এর মত তারা ইতিহাসের সঙ্গে গল্পকাহিনী মিশিয়ে ফেলে। সেজন্য আধুনিক ইতিহাসকাররা সমর্থনকারী অন্য সাক্ষ্যসমূহ (যেমন, পুরাতাত্ত্বিক ও শিলালিপি) পেলে তবেই এইসব গল্পকাহিনী বিশ্বাস করেন। সচেতন মুসলিম ইতিহাসকার বা রাজতরঙ্গিনীর মত ইতিহাসের লেখকের কাছ থেকে নয়, সন্ত সামবান্দার কাহিনী এসেছে স্থানীয় উপকথা থেকে, যার ঐতিহাসিকতা, আদৌ যদি কিছু থেকে থাকে, অত্যন্ত ক্ষীণ। নীলকান্ত শাস্ত্রী তাঁর দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস পুস্তকে এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, "এটা একটা অস্বস্তিকর উপকথা ছাড়া কিছু নয়, এবং ইতিহাস বলে গণ্য করা যায়না।" কথাগুলি পার্সিভাল স্পীয়ারের সেই "ঔরঙ্গজেবের হিন্দু তাড়নার ঘটনাগুলি বিরুদ্ধ উপকথার বেশী কিছু নয়" গোছের হয়ে গেল। কিন্তু, পার্সিভাল স্পীয়ারের বক্তব্য খন্ডন করার জন্য বহু সমসাময়িক সাক্ষ্য আছে; যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পৌত্তলিকদের প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস ও পৌত্তলিকদের হত্যা করার জন্য রাজকীয় ফর্মান এবং কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য। জ্ঞান সম্বাদারের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনও সাক্ষ্য বা সাক্ষী মোটেই নেই।

ইতিহাসবিকৃতির এইসব স্পষ্ট সাক্ষ্যর পর আমরা পরবর্তী সব ব্যাপারগুলি একই ভাবে গ্রহণ করবো। পরের ঘটনাটি কমপক্ষে দুটি পৃথক সূত্র থেকে গৃহীত : কাশ্মীরের হুন রাজা মিহিরকুলের দ্বারা বৌদ্ধদের তাড়না। রোমিলা থাপার নিজে স্বীকার করেছেন হিউয়েন সাঙের "১৬০০ বৌদ্ধ স্তুপ ও সঙ্ঘারাম ধ্বংস এবং হাজার হাজার বৌদ্ধ সাধু ও সাধারণ বৌদ্ধ হত্যা" অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর কলহনের বিস্তারিত বর্ণনার উপর আস্থা আছে, যাতে উল্লেখ আছে "শত শত নিরীহ লোককে হত্যা করা হয়েছিল।"

কিন্তু হিউয়েন সাঙ ঘটনার এক গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন, যা আষাঢ়ে গল্প বলে মনে হয়না এবং যথাযথ ঐতিহাসিক হতে পারে। মিহিরকুল তাঁর অবসর সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে পড়াশুনা করবেন বলে বৌদ্ধ সঙ্ঘকে একজন শিক্ষক দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত কোনও সাধু এই শিক্ষাদানের কাজ করতে রাজী হলেন না। একজন ভৃত্যশ্রেণীর লোককে এই কাজ করতে পাঠালেন সাধুরা। ফলে, গোটা ব্যাপারটাতে অপমানিত বোধ করলেন রাজা মিহিরকুল এবং বৌদ্ধদের ধ্বংস করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এই রাজা গোড়া থেকে বৌদ্ধ বিরোধী ছিলেন না। তিনি খোলা মনের মানুষ ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে জানার তাঁর সত্যকারের উৎসাহ ছিল। কিন্তু একবার রাজার অহং যদি আহত হয় তবে তিনি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারেন, তা তাঁর ধর্ম যাই হোক না কেন। ব্যাপারটা দুঃখজনক, কিন্তু এটা ধর্মান্ধতা নয়।

ঠিক একই ভাবে রাজাকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ব্যাপারে নাক গলাতে না দেওয়ায় মহারাজ অশোকের এক সেনাপতি ক্রুদ্ধ হয়ে ৫০০ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে মেরে ফেলেছিলেন। এই গণহত্যার ব্যাপারে ধর্মীয় অসহনীয়তার কোনও ব্যাপার নেই। আছে শুধু আহত অহং এর অসহনীয়তা। মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকরা এই ঘটনাকে তাদের তালিকাতে না রেখে ঠিকই করেছেন। সেই একই কারণে মিহিরকুলের অভদ্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রতি ক্রোধের সঙ্গে মুসলমান শাসকদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত অত্যাচারের তুলনা দেওয়া যায়না। যেভাবে মিহিরকুল বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে চেয়েছিলেন, সেভাবে পৌত্তলিকদের ধর্মীয় তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার উদ্দেশ্যে পৌত্তলিক পন্ডিতদের আহ্বান করেছেন এমন কোনও মুসলমান রাজার কথা আমাদের জানা নেই। এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রমযুগল হচ্ছেন স্বধর্মদ্রোহী মহান মুঘল সম্রাট আকবর, যিনি প্রবলভাবে সমালোচিত হন মুসলমান ধর্মবিদদের দ্বারা। আর, যুবরাজ দারাশিকো--যিনি ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগে তাঁর ভ্রাতা ঔরঙ্গজেবের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন ।

কলহনের রাজতরঙ্গিনী থেকে আন্তঃ হিন্দু তাড়নার আর একটি ঘটনা হচ্ছে, "কাশ্মীরের বৌদ্ধদের তাড়না করার একটি ঘটনা, শৈব রাজা কর্তৃক চক্রান্ত করে বৌদ্ধদের একটি বিহার ধ্বংস করা।" এই ঘটনা বর্ণনার শেষে একটু উপসংহার লিখেছেন অধ্যাপিকা থাপার: "এই ক্ষেত্রে রাজা পরে অনুতপ্ত হয়েছেন এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য নতুন একটি বিহার নির্মাণ করে দিয়েছেন।"

এই উপসংহারের অন্য গুরুত্ব আছে: এটি আলোকিত করেছে এমন একটি ঘটনা যা ইসলামী ইতিহাসের সুদীর্ঘ কালে কদাচ দেখা যায়নি: অনুশোচনা! ঐ শৈব রাজা মনে মনে জানতেন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা অন্যায়। যখন তিনি আত্মস্থ হয়ে বুঝলেন নিজের অন্যায়, তখন তিনি প্রায়শ্চিত্য করতে মনস্থ করলেন। এ ধরনের কাজ কখনও করেননি গজনীর মাহমুদ বা ঔরঙ্গজেব। মুসলমানদের ধারাবাহিক হিন্দু তাড়নার সঙ্গে হিন্দুদের বিচ্ছিন্ন অসহিষ্ণুতার মুলগত পার্থক্যের যদি কোনও প্রমাণ প্রয়োজন হয়, সে প্রমাণ অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার দিয়েছেন।

পরের ঘটনা হলো: "দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথমে লিঙ্গায়েত বা বীরশৈবদের দ্বারা কর্ণাটকের জৈন মন্দিরগুলিকে এক উদ্বিগ্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে দিনযাপন করতে হয়।" এই মন্দিরগুলিকে যদি উদ্বেগের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করে থাকে তবে তাদের অবস্থা তো ঐ একই সময়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হাজার হাজার হিন্দু মন্দিরের থেকে অনেক ভাল! কিছু সময় শান্তিতে অতিবাহিত করার পর, যা রোমিলা থাপার স্বীকার করেছেন, "একটি মন্দির শৈব মন্দিরে পরিবর্তিত করা হয়। হুলীতে মন্দির বেদীর পাঁচ জিনকে পাঁচ লিঙ্গের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে পাঁচ জিনের মন্দিরকে পরিবর্তিত করা হয় পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে। একই গতি হয় অন্য কয়েকটি জৈন মন্দিরের।" এটাকে কি শান্তিপূর্ণভাবে মন্দির হস্তান্তরের ঘটনা বলা যায়? মোটের উপর মন্দির তো ধ্বংস করা হয়নি? না। কারণ, "ধারওয়ারের আবলুতে প্রাপ্ত এক শিলালেখে শিবপূজার জৈন বিরোধিতার জন্য প্রতিশোধস্বরূপ জৈন মন্দিরের উপর আক্রমণকে প্রশংসা করা হয়েছে।"

এটা আবার পছন্দমত উদ্ধৃতি দিয়ে সাক্ষ্য বিকৃত করার একটি ঘটনা। যে শিলালেখের সংক্ষিপ্তসার উদ্ধৃত করেছেন অধ্যাপিকা থাপার, সে শিলালেখে উদ্ধৃত আছে গন্ডগোলের সূত্রপাত হয় যখন জৈনরা এক শৈবকে তার প্রতিমা পূজা করতে বাধা দেয়। শিলালেখে আরও বলা আছে শৈবরা যদি কোনও অলৌকিক কান্ড প্রদর্শন করে তবে জৈনরা মন্দির থেকে জিন ফেলে দিয়ে শিবপূজা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু যখন অলৌকিক কান্ড প্রদর্শিত হলো তখন জৈনরা তাদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করলো না। তারপরের বিবাদে শৈবরা জিন মূর্তি ভেঙ্গে ফেললো। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, ব্যাপারটা যখন বিচারের জন্য জৈন রাজা বিজ্জলার কাছে গেল তখন রাজা জৈনদেরই

দোষী সাবাস্ত করলেন।

আবার এই গল্পে বিবাদটা আদৌ একপেশে ব্যাপার নয়। পুরো গল্পটাই আমরা বিশ্বাস করতে রাজী নই। কারণ, এটা একটি উপাসক সম্প্রদায়ের তৈরী অলৌকিক ঘটনার গল্প, (যার নিগদিত অর্থ: আমার সম্প্রদায়ের সন্ত তোমার সম্প্রদায়ের সন্তের চেয়ে পবিত্র) যে ধরনের গল্প প্রত্যেকটি তীর্থক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে রচিত আছে--সে তীর্থ খ্রীষ্টানদের, সুফিদের বা হিন্দুদের হতে পারে। ঐ শিলালেখের সঙ্গে ঐস্থানে প্রাপ্ত আরও চারটি শিলালেখ যিনি অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন, দুটি লিঙ্গায়েত পুরাণ এবং বিজ্জলচরিতের সারমর্ম লিখেছেন, সেই ডঃ ফ্লিট লিখেছেন, শিলালেখের কাহিনীর সমর্থন দুটি সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়না। মানাগোলীতে আবিস্কৃত ১১৬২ অব্দে খোদিত বিজ্জলের নিজ শিলালেখে এই কাহিনীর সমর্থন নেই। তারিখহীন এবং রাজার নামহীন এই শিলালেখ বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশ্বাসযোগ্য শিলালেখে কী অলৌকিকতার কথা লেখা থাকে?

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে বাবরী মসজিদ স্থান দাবী করবার সময় হিন্দুরা যদি এই ধরনের একটি শিলালেখ পেশ করতো তাহলে মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকরা ব্যাপারটা 'হাস্যকর' ও 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন' বলে বাতিল করতেন। বাবরী মসজিদের স্থলে কোনও মন্দির ছিলনা—মার্ক্সবাদীদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই ধরনের ঠুনকো সাক্ষ্যকে তাঁরা কোনও বাধা বলে মনে করতেন না। অথচ এইক্ষেত্রে এই ঠুনকো 'সাক্ষ্যের' উপর ভিত্তি করে আমাদের মানতে বলা হচ্ছে যে শৈবরা জৈনদের মন্দির আক্রমণ করেছিল এবং 'হিন্দু সহিষ্ণুতা একটি কল্পধারণা'।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টি-লাইনের ঐতিহাসিকদের মত আমি মনে করিনা এই ধরনের পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে জোরের সঙ্গে কিছু বলা যায় বা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায়। সুতরাং আমি এই শিলালেখকে কল্পকাহিনী বলে সম্পূর্ণ বাতিল করছিনা। এটা হতে পারে ঐ সময়ে জৈনরা খুব দুঃসময়ে পড়েছিল এবং আমি এমন কিছু তথ্য দাখিল করছি না যা অস্বীকার করে অধ্যাপিকা থাপারের সিদ্ধান্তকে : "চতুর্দশ শতাব্দীতে জৈনদের তাড়না এমনই একটা পর্যায়ে পৌঁছয় যে তারা বিজয়নগর রাজ্যের শাসকের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন জানায়।" প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় বিজয়নগর রাজ্যের যে শাসকের কাছে জৈনরা নিরাপত্তার জন্য আবেদন জানিয়েছিল, তিনি ছিলেন বৈষ্ণব।

ডঃ ফ্লিটের গবেষণা থেকে জানা যায় যে জৈন বিরোধী এই শৈবরা ছিল বীরশৈব বা লিঙ্গায়েত। অধ্যাপিকা থাপারের প্রদত্ত পরবর্তী সাক্ষ্য : অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীশৈলমে প্রাপ্ত শিলালেখে শ্বেতাম্বর জৈনদের মাথা কাটার জন্য বীরশৈব নেতার গর্ব প্রকাশের কথা আছে।এখন বীরশৈবরা হচ্ছে জাতপাতের বিরোধী এবং ব্রাহ্মণবিরোধী শৈব সম্প্রদায়। এইগুলি যেহেতু সৎ গুণ বলে পরিচিত,সেহেতু অপলাপবাদীরা এইগুলিকে মুসলিম মিশনারীদের প্রভাবের সঙ্গে জড়িত করতে চেষ্টা করেন ("সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা আনয়ণকারী")। ঐ সময়ে মুসলিম মিশনারীরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে সক্রিয় ছিল এবং সেখানেই ঐ সময়ে বীরশৈববাদের অভ্যুদয় ঘটে। ভারতের ধর্মেতরবাদী ঐতিহাসিকদের চূড়ামণি ডঃ তারাচাঁদের মতে বীরশৈববাদের বিকাশ ঘটে ইসলামেরই প্রভাবে। আমাদের তাহলে ধরে নেওয়া যাক বীরশৈববাদের উপর ইসলামের প্রভাব ছিল। সেক্ষেত্রে অপলাপবাদীদের স্বীকার করতে হয়, বীরশৈবদের মাঝে মাঝে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শনের জন্য ইসলামের প্রভাব দায়ী। যাই হোক, এই ব্রাহ্মণবিরোধী উপাসক সম্প্রদায়ের কুকর্মের জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদ দায়ী হতে পারেনা।

শেষতঃ, অধ্যাপিকা থাপারের বক্তব্য, "গুজরাটে জৈন ধর্ম সমৃদ্ধিশালী হয় কুমারপালের রাজত্বে, কিন্তু তাঁর উত্তরসুরী অজয়পাল জৈনদের তাড়িত করেন এবং তাদের মন্দির ধ্বংস করে দেন।"

রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত The History and Culture of the Indian People গ্রন্থে আমরা পড়ি, "জৈন ঐতিহাসিক নথিতে অভিযোগ করা হয়েছে অজয়পাল জৈনদের তাড়িত করতেন, জৈন মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, নির্দয়ভাবে জৈন বিদ্বান রামচন্দ্রকে বধ করেছিলেন এবং কুমারপালের মন্ত্রী অম্বদকে এক যুদ্ধে নিহত করেছিলেন।" এখানে ক্ষতিগ্রস্তদের দ্বারাই অভিযোগ করা হয়েছে, আক্রমণকারীদের বর্ণনা নয়। এটা হতে পারে তারা অতিশয়োক্তি করেছে, কিন্তু গোটা গল্পটা তারা বানিয়েছে, এটা বিশ্বাস করার কোনও হেতু নেই। সুতরাং এটা স্বীকার করা যাক যে কয়েকটা জৈন মন্দির ধ্বংস হয়েছিল এবং অন্ততঃ পক্ষে একজন বিশিষ্ট জৈন হিন্দু আক্রমণকারীদের দ্বারা নিহত হয়েছিল।

যেসব মার্ক্সীয় বিদ্বানরা উপরোক্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তারা তাদের বর্ণনা থেকে বাদ দিয়েছেন বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে বিবাদকে। মহাবংশতে লেখা আছে বৌদ্ধ রাজা ভট্টগামিনী (২৯-১৭ পূর্বাব্দ) একটি জৈন বিহার ধ্বংস করে সেই স্থলে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন। মল্লিসেনার শ্রবণবেলগোলা শিলালেখে আছে জৈন শিক্ষক অকলঙ্ক বৌদ্ধদের বিতর্কে পরাজিত করে একটি বৌদ্ধমূর্তি পা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। জৈন-বৌদ্ধ বিবাদের আরও ঘটনা আছে, কিন্তু এইসব ঘটনা কুপরিকল্পনাতে কাজে লাগেনা। তাঁদের প্রিয় তত্ত্ব হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম 'ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের' বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ব্রাহ্মণদের পাল্টা আঘাতেই এইসব ধর্ম বিনষ্ট হয়েছে ভারতের মাটি থেকে। বস্তুতঃপক্ষে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের দায়িত্ব মোটামুটিভাবে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানুপাতে বন্টিত।

সনাতন ধর্ম মহাসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদের ঘটনাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সম্ভবতঃ ভিত্তিহীন এবং কতকগুলি অতিরঞ্জিত। কিন্তু আমাদের এইরকম ধারণার সমর্থনে যেহেতু কোনও প্রমাণ নেই, সেহেতু ধরে নেওয়া যাক এই সমস্তই সত্য এবং সঠিক। আমাদের ধরে নেওয়া যাক সমসংখ্যক ঘটনা আমাদের মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বা তাঁরা বর্ণনা করেননি। তাহলেও এইসমস্ত ঘটনায় মোট বলির সংখ্যা তৈমুরের এক দিনের বলির সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। এইসমস্ত ঘটনায় ধ্বংস করা মন্দিরের সংখ্যা শুধুমাত্র ঔরঙ্গজেবের দ্বারা ধ্বংসীকৃত মন্দিরের সংখ্যা থেকে অনেক কম। যখন ইসলামের ধ্বংস ও হত্যাকান্ডের সঙ্গে হিন্দুধর্মের ধর্মান্ধতার তুলনা করা হয় তখন দেখা যায় এক মামুদ গজনী, এক ঘোরী বা এক ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতার তুলনায় গোটা হিন্দুধর্মের ধর্মান্ধতা বামন সদৃশ। তাছাড়া লোক সংখ্যার যদি বিচার করা হয় তবে গোটা হিন্দুসভ্যতার ধর্মান্ধতার সঙ্গে তুলনা করতে হবে গোটা ইসলামের, শুধুমাত্র ভারতীয় ইসলামের নয়।

অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার লিখেছেন, "সহিষ্ণুতা ও অহিংসাকে হিন্দু পরম্পরার শাশ্বত মূল্যবোধ বলে উপস্থাপিত করার জন্য এসব 'উদাহরণকে' সরিয়ে রাখা হয়।" কীসের 'উদাহরণ'? কয়েকটি বিতর্কিত 'উদাহরণ' প্রমাণ করেনা হিন্দু সহিষ্ণুতা একটি কল্পধারণা।

এইসব সাক্ষ্যের মোকাবিলা করার সামর্থ হিন্দুদের আছে। হিন্দুধর্ম সহিষ্ণু কিনা তার বিচার পরিকল্পনা মাফিক কয়েকটি নির্বাচিত ও সম্পাদিত ঘটনা বর্ণনার উপর নির্ভর করেনা, নির্ভর করে হিন্দু ইতিহাসের সামগ্রিক চিত্রের উপর। হিন্দু ইতিহাসের সামগ্রিক চিত্র প্রদর্শন করে অপলাপবাদীদের সৃষ্ট ছবি অলীক।

যুগ যুগ ধরে অনেক বিদেশী মানুষ ধর্মীয় কারণে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ভারতে পার্সীরা এসে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। সিরীয় খ্রীষ্টানরা এখানে শান্তিতে বাস করছিল, যতদিন না পর্তুগীজরা এসে ভারতকে খ্রীষ্টস্থান বানাবার জন্য তাদের দলে

টানলো। ইহুদীরা ইস্রায়েলে চলে যাবার আগে ভারতের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল, কারণ, একমাত্র ভারতেই তাদের স্মৃতি তাড়নার নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের। এমনকি মোপলা মুসলমানরাও বিনা প্রশ্নে আশ্রিত হয়েছিল ভারতে। এইসমস্ত বিদেশীদের শুধু যে নিরাপদে বাস করতে দেওয়া হয়েছিল তাই নয়, তাদের দেওয়া হয়েছিল উপাসনাস্থল নির্মাণের জন্য জমি ও ইমারতি-দ্রব্য।

এই ব্যাপারে সবচেয়ে বলার মত ঘটনা হলো মুসলিম দুঃশাসনের প্রায় অবসানের পরে যখন মারাঠা, শিখ, রাজপুত ও জাঠদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন হিন্দুদের সহিষ্ণুতা প্রদর্শন। স্পেনের পুনরাধিকারের পর স্পেনীয় খ্রীষ্টানরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল হিন্দুরা সেই পথে যেতে পারতো। মুসলমানদের ধর্মান্তর বা বিতাড়নের মধ্যে যে কোনও একটা বেছে নিতে বলতে পারতো। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি তাহলে বহু অমূল্য জীবন বেঁচে যেত এবং ভারতের একতাও নষ্ট হতোনা। কিন্তু মানুষকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলা হিন্দু পরম্পরার বিরোধী।

এইসব অপলাপবাদীরা যখন ইসলামের তাড়নার ব্যাপক উদাহরণের সম্মুখীন হয়, তখন তারা হাতে গোনা কয়েকটি মন্দিরের কথা শোনায়, যেখানে মুসলিম শাসক মন্দির নির্মাণের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাপারটা প্রতারণাপূর্ণ: জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তিকা ইতিহাসের রাজনৈতিক অপব্যবহার এই ধরনের তিনটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু ভাল করে বিচার করলে দেখা যায় দুটি ঘটনায় মুসলমান শাসকেরা যুক্ত নয়, যুক্ত তাঁদের হিন্দু মন্ত্রী। (প্রতিবাদ পত্রে অধ্যাপক এ.আর. খাঁ লিখেছেন, "ব্যাপারটা শুধু সাক্ষ্য গোপনের নয়, সাক্ষ্য বিকৃত করাও")। আচ্ছা, ঠিক আছে! কয়েকজন মুসলমান শাসক হিন্দু প্রতিষ্ঠানে কিছু দান করেছিলেন। অপলাপবাদীরা দাবী করছে এই ধরনের কয়েকটি ঘটনা বহুবৎসরব্যাপী ইসলামী অত্যাচারের ক্ষতি পূরণ করে দিচ্ছে! বিপরীতে, তাদের অসমান মাপকাঠিতে, হিন্দু রাজাদের ক্ষেত্রে বহু সনাতনপন্থী ও অ-সনাতনপন্থী উপাসক সম্প্রদায়কে বহু বৎসরব্যাপী লালন পালনের দ্বারা কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অসহিষ্ণুতার ঘটনার ক্ষতি পূরণ কদাচ সম্ভব হয়না।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ব্যাপারটা সঠিকভাবে বুঝতে গেলে ধর্মগুলির মধ্যে দু ধরনের বিবাদের কথা স্মরণ করতে হবে। প্রথম ক্ষেত্রে সাধারণ গোলমাল যা দু দল মানুষের মধ্যে ঘটে থাকে। এই দুটি দলের সত্তা তাদের জাতীয়তা, ভাষা, পরিবার, অর্থনৈতিক স্বার্থ, সামাজিক শ্রেণী বা একটি ফুটবল ক্লাবের প্রতি আনুগত্যর উপর নির্ভরশীল হতে পারে। এই রকম দুটি দল ঝগড়া বাঁধিয়ে দিতে পারে। সুতরাং দুটি ধর্মীয় দল একই রকম আচরণ করবে। নিয়ম অনুযায়ী দুটি ধর্মীয় দলের ক্ষেত্রে স্বার্থের হানি থেকে বিবাদ লাগতেই পারে (এই বিবাদে কিছু লোক হিংস্র হয়ে যাবে, কিছু লোক তাদের অহিংস নীতির জন্য অহিংস থেকে যাবে)। কিন্তু এই ধরনের বিবাদ ক্ষণস্থায়ী; বিবাদের কারণ অনেক সময় আকস্মিক, মাথা ঠান্ডা হলেই বিবাদ মিটে যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্মীয় বিবাদের কারণ আকস্মিক নয়, ধর্মীয় দলগুলি যে ধর্মীয় তত্ত্বে বিশ্বাস করে তার জের। মার্ক্সীয় 'ধর্ম' সমেত কতকগুলি ধর্মের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটে থাকে। এইসব ধর্মীয় দলগুলির বৈশিষ্ট তাদের পরাকরণমনস্কতা ও বিশ্বজয়ের উচ্চাকাঙ্খা। ইসলাম অন্য দলের বেঁচে থাকার ও তাদের স্বধর্ম পালনের চিরন্তন অন্তরায়। অন্য ধর্মের সঙ্গে ইসলামের বিবাদের মূল কারণ তার ধর্মীয় তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা।

ধর্মীয় বিবাদের সমস্যার মূল কারণ উপলব্ধির জন্য আকস্মিক কারণ ও আচরণের বিচ্যুতিজাত বিবাদ ও ধর্মের তত্ত্বের মধ্যে নিহিত বিচ্ছিন্নতার কারণে বিবাদের মধ্যে পার্থক্য করা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। প্রথম ক্ষেত্রে তত্ত্বের সহায়তা ব্যতিরেকেই উন্মত্ততা প্রদর্শন করা হয়। বেদের মতে 'সেই পরমকে

জ্ঞানীরা বহু নামে ডাকে' এবং 'শুভ চিন্তা সব দিক থেকেই আসুক আমাদের কাছে।' গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'যে যে নামেই ডাকুক না কেন, সব প্রার্থনাই আমার কাছে এসে পৌঁছয়।' সুতরাং ধর্মের পার্থক্য জনিত যেটুকু বিবাদ তা অবশ্যই ওপর ওপর এবং তেমন গভীর কিছু নয়। সেহেতু ধর্মীয় সহনীয়তাই রীতি, অসহনীয়তা এক্ষেত্রে নিতান্তই ব্যতিচার। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ধর্মীয় উন্মত্ততা ধর্মীয় তত্ত্বেরই ইসলামের বিধান এবং ধর্মকে যদি নিষ্ঠাভরে পালন করা হয়, তবে বিশাল আকারে ধর্মীয় উন্মত্ততা প্রদর্শিত হতে বাধ্য। কোরানে লেখা আছে, "শত্রুতা ও ঘৃণা আমাদের মধ্যে বিরাজ করবে যতক্ষণ না তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করবে।" এবং মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে যে শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করে এটা অতি স্বাভাবিক।

এই যে পার্থক্যের কথা বলা হলো, যারা কুমৎলবে থাকে তারা এই পার্থক্য মুছে দিতে চায়। মার্ক্সীয়রা এই পার্থক্য অস্বীকার করতে বা মুছে দিতে যায়। কারণ, তারা সব ধর্মকেই কলঙ্কিত করতে চায়, অথবা, তারা ধর্মান্ধ মুসলমানদের দোসর।

যারা বলতে চায় 'সবাই সমান দোষী' তাদের মধ্যে আছে খ্রীষ্টান মিশনারীরা। এদেরও বিধর্মীদের তাড়না করার ও মন্দির ধ্বংস করার বিরাট ঐতিহ্য আছে। সেটা শুধু ইউরোপ বা আমেরিকায় নয়, ভারতেও। গোয়াতে পর্তুগীজ মিশনারীরা হিন্দুদের বাড়ী বাড়ী তল্লাশী চালিয়ে ধরে ধরে খ্রীষ্টান বানিয়েছে এবং অন্যত্রও দলের পর দলকে জোর করে ধর্মান্তরিত করেছে। ফরাসী মিশনারীরা তুলনায় কম নৃশংস। তারা অনেককে ধর্মান্তরিত করেছে হয় অন্তর্ঘাত করে বা অর্থের লোভ দেখিয়ে। কিন্তু তারাও ভারতে ধ্বংস করেছে অনেক মন্দির। হিন্দু মন্দিরের ইট-পাথর দিয়ে সেই একই জায়গায় তৈরী হয়েছে বহু গীর্জা। আমরা একটা গীর্জার উদাহরণ দেব ব্যাপারটা বিশদ করার জন্য: গীর্জাটি হলো চেন্নাই এর মাইলাপুর সমুদ্রতটে সেন্ট টমাস গীর্জা। ভারতের খ্রীষ্টান নেতাদের মতে প্রেরিতদূত সেন্ট টমাস ভারতে আসেন ৫২ অব্দে। তিনি সিরীয় খ্রীষ্টান ধর্মমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি ৭২ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মান্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। তাঁর শহীদত্বের স্থানে সেন্ট টমাস গীর্জা নির্মিত হয়েছে। ঘটনা হচ্ছে, এই প্রেরিতদূত কোনও দিনই ভারতে আসেননি, এবং দক্ষিণ ভারতের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা টমাস (এই নামটি থেকেই সেন্ট টমাস উপকথার সৃষ্টি) ক্যানানিয়াস (Thomas Cananeus)। তিনি ৩৪৫ অব্দে পারস্য থেকে ভারতে আসেন ৪০০ জন শরণার্থী নিয়ে। হিন্দু শাসকরাই এইসব শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। ইউরোপের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সেন্ট টমাসের ভারতে যাওয়ার গল্প আর পড়ানো হয়না। কিন্তু ভারতে এই গল্প এখনও দরকারী বলে মনে করা হয়। এমনকি বহু সক্রিয় ধর্মেতরবাদীরা, যাঁরা অযোধ্যার ব্যাপারে "উপকথায় বিশ্বাস করার জন্য" হিন্দুদের আক্রমণ করেন, তাঁরাও এক কথায় বিশ্বাস করেন সেন্ট টমাসের এই গল্পে। আসল কথা, ব্রাহ্মণদের ধর্মান্ধ বলে প্রতিপন্ন করতে হবে এবং সেই জন্যই শহীদ বানাতে হবে সেন্ট টমাসকে। বস্তুতঃপক্ষে হিন্দুরা যে কাউকে শহীদ করেনি, এতে মিশনারীরা খুশী নয় (শহীদের রক্ত 'ধর্মের বীজ' বলে আখ্যাত হতে পারতো)। সেই জন্য তাদের একটা 'শহীদ' উদ্ভাবন করতে হয়েছে। 'হিন্দু ধর্মান্ধদের' হাতে নিহত সেন্ট টমাসের স্মারক যে গীর্জার কথা বলে খ্রীষ্টানরা, সেটি আসলে খ্রীষ্টান ধর্মান্ধদের হাতে নিহত হিন্দু শহীদদেরই স্মারক। এটি একটি শৈব ও একটি জৈন মন্দির বলপূর্বক প্রতিস্থাপিত করে নির্মিত হয়েছিল, যাদের অস্তিত্ব খ্রীষ্টান মিশনারীদের কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিল। মায়লাপুর সমুদ্রতট থেকে পৌত্তলিকতার অভিশাপ বিদূরিত করতে ঠিক কতজন হিন্দু পুরোহিত ও ভক্তের রক্তপাত ঘটেছিল খ্রীষ্টান সৈন্যদের হাতে তা কেউ বলতে পারেনা। কারণ, হিন্দুরা শহীদপূজা করতে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু আমাদের যদি এই পরিপ্রেক্ষিতে শহীদত্বের কথা বলতে হয়, তবে শহীদের শিরোপা পড়বে সেই জৈন ও শৈব ভক্তদের শিরে,

প্রেরিতপুরুষ সেন্ট টমাসের শিরে নয়।

'আক্রমণ প্রতিরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়' এই প্রবাদ অনুসরণ করে অসহিষ্ণু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররা সহিষ্ণু হিন্দুদের অভিযুক্ত করছে সেই অপরাধে, যে অপরাধে তারাই বিশ্বজুড়ে অভিযুক্ত। হিন্দুধর্ম ত্রুটিশূন্য বা হিন্দুসমাজ কখনও কোনও ধর্মান্ধকে সৃষ্টি করেনি বলে যখন কেউ দাবী করছে না, তখন এটা নির্জলা মিথ্যা যে তিনটি বিশ্বজয়ী ধর্মের (খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম ও মার্ক্সবাদ) মত হিন্দুধর্মেরও ধর্মান্ধতার সমান্তরাল ঐতিহ্য আছে।

সিদ্ধান্ত

ভারতের নিজস্ব অপলাপবাদ আছে: ইসলামকৃত মানবতার বিরুদ্ধে বৃহদাকার ও ধারাবাহিক অপরাধ অস্বীকার করার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার নেতারা হচ্ছেন ইসলামী ধ্বজাধারী ও মার্ক্সীয় বিদ্বানরা এবং তাদের অনুসরণকারী রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবি, যাঁরা নিজেদের 'ধর্মেতরবাদী' বলে, অভিক্ষেপ করেন। কিন্তু নাৎসী গণহত্যার অপরাধ গোপন-প্রত্যাশী অপলাপবাদীরা কোনওরকম সরকারী সমর্থন পায়না। বিপরীতে আর্মেনিয়ার গণহত্যা গোপনের অপলাপবাদীদের মত ইসলামের তথ্য গোপনকারী অপলাপবাদীরা ভারতে সব রকম সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পায়। এই অপলাপবাদীরা যাবতীয় প্রচার মাধ্যম নিয়ন্ত্রিত করে এবং কেন্দ্রীয় এবং সব প্রাদেশিক সরকারের 'সাম্প্রদায়িক' সমস্যা (বলতে গেলে ইসলাম সংক্রান্ত সমস্যা) সম্পর্কে ভাষ্য রচনায় নির্দেশ জারী করে।

এদের কর্ম-কৌশল পৃথিবীর অন্যান্য অপলাপবাদীদের কর্মকৌশলের মতই:

- যেসব বিদ্বানদের সাক্ষ্য অসুবিধাজনক তাদের নামে কলঙ্ক প্রচার করো। তাদের রাজনৈতিক বা অন্য স্বার্থের ক্রীতদাস বলে প্রচার করো, যাতে তাদের সাক্ষ্য থেকে জনসাধারণের মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়।
- পাঠকের দৃষ্টির আড়ালে রেখে দাও যাবতীয় অসুবিধাজনক নথীপত্রাদি। যদি কোনও নথী অসুবিধাজনক বলে মনে হয়, পুরো অস্বীকার কর ঐ নথীর অস্তিত্ব। প্রচার মাধ্যমের উপর যদি তোমার নিয়ন্ত্রণ থাকে, তবে তোমার অস্বীকারের দ্বারা এইসব নথী জলে তলিয়ে যাবে।
- নথী অস্বীকার করা যদি সম্ভব না হয়, তবে সুবিধামত ঐ নথী থেকে উদ্ধৃত করে এবং নথীর লেখকের উদ্দেশ্য প্রণোদনার কথা বলে তথ্য বিকৃত কর। উদ্ধৃতির মধ্যে তঞ্চকতা কর, যাতে আসল লেখক যা বলতে চেয়েছেন তার উল্টোটা বোঝায়।
- অস্বস্তিকর সাক্ষ্যর মধ্যে দোষ খোঁজ। দু-একটি ক্ষুদ্র কাল্পনিক বা আসল ত্রুটি খুঁজে বার করে পাঠকের সমস্ত দৃষ্টি সেটার দিকে আকর্ষিত করো, যাতে পাঠক ভাবতে পারে সমস্ত নথীটাই বিশ্বাসজনক নয়।
- অস্বস্তিকর আলোচনা যদি বন্ধ না করাই যায়, তবে অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করে ব্যাপারটা পাতলা করে দাও: আলোচনা কর ইহুদীদের ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনীয়দের প্রতি ইহুদীদের দুর্ব্যবহার; হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা।
- ঘটনার সত্যতা যদি আদৌ স্বীকার করতে হয়, তাহলে ঘটনার বলিকে দোষ দাও।
- মানুষ যদি তোমার বিকৃত ইতিহাসকে অস্বীকার বা তুচ্ছ করে তবে তাকেই ইতিহাস বিকৃতির ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইতিহাসের অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করো। আক্রমণই সেরা আত্মরক্ষা।

ইসলামী অত্যাচার হিন্দু সমাজের উপর যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে, অপলাপবাদ তার উপর অতিরিক্ত

আঘাত। এটা একটা বৌদ্ধিক অপরাধ; কারণ, অপলাপবাদ রাজনীতির কাছে সত্যকে বিকিয়ে দেয়।

মার্ক্সবাদের মন্ত্রপূত এইসব ঐতিহাসিক ও লেখকরা বিপুল দক্ষতার সঙ্গে অপলাপবাদী কাজকর্ম চালিয়ে যায়। রুশ কমিউনিজমের পতনের ফলে এবং ভারতে কমিউনিজমের রমরমা ক্ষয় হওয়ার ফলে অপলাপবাদের অবসান হবে এ রকম ভাবা ঠিক নয়। যারা মার্ক্সবাদের দ্বারা সামান্যভাবে প্রভাবিত তারাও অপলাপবাদীদের ভাষ্য অনুযায়ী চিন্তা করতে অভ্যস্ত। বাপ মায়ের মৃত্যুর পর ছেলে মেয়ে বেঁচে থাকে। মার্ক্সবাদের মৃত্যুর পরও অপলাপবাদ বেঁচে থাকবে, যদি না একনিষ্ঠ চেষ্টায় অপলাপবাদের গোটা মুখোসটা খুলে দেওয়া যায়। সুতরাং আমি মনে করি ভারতের বুদ্ধিজীবিদের একান্ত কর্তব্য অপলাপবাদের ঘটনাগুলিকে নিয়ে চর্চা করা এবং যখনই অপলাপবাদী কাজকর্ম হবে, তখনই তার মুখোস খুলে দিয়ে তার নিন্দা করা।

তৃতীয় অধ্যায়

অপলাপবাদের মুখোস খোলা ও প্রতিবাদ করা

অপলাপবাদ ও ইতিহাস বিকৃতির জন্য প্রবল প্রচেষ্টার প্রয়োজন এবং এর জন্য শিক্ষা বিভাগ ও প্রচার মাধ্যমের উপর প্রবল প্রভাব থাকা অত্যাবশ্যক। যখনই এই প্রভাব আলগা হতে থাকে, তখনই অপলাপবাদীদের সবচেয়ে বড় দুর্গের পতন ঘটে এবং অপলাপবাদীদের বিশ্বাসযোগ্যতা লোপ পায়। ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিদ্যালয়গুলিতে ইতিহাস পরীক্ষা বন্ধ রাখতে হয়; কারণ, "ইতিহাস বইগুলি মিথ্যায় পরিপূর্ণ।" সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট জমানার সেই ইতিহাস লিখন প্রণালী এখন ব্যঙ্গের যাদুঘরে স্থান পেয়েছে।

আসুন ভয়েস অফ ইন্ডিয়ায়

রুশরা যেমন কমিউনিস্ট ইতিহাস রচনাপ্রণালীকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় অপলাপবাদীদেরও একই অবস্থা হবে। কিছুদিন আগে প্রকাশিত ভারতীয় ঐতিহাসিক সীতা রাম গোয়েলের (জন্ম, ১৯২১) লেখা হিন্দু মন্দির? কি হলো সেগুলির? বইটির দ্বিতীয় খন্ড অপলাপবাদীদের মুখের উপর এক জবর আঘাত। এই বইটিকে এক দিকচিহ্ন বলার যথেষ্ট কারণ আছে।

লেখক ও তাঁর দার্শনিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ বন্ধু রাম স্বরুপ (১৯২০-৯৯) এই দুজন হতাশ ও ভগ্নদশাগ্রস্ত হিন্দু সমাজের আলোকদূত। সীতারাম গোয়েলের জন্ম ১৯২১ অব্দে হরিয়ানার এক অগ্রবাল পরিবারে। অগ্রবালরা সাধারণভাবে ব্যবসায়ী হলেও সীতারামের পিতামাতা দরিদ্র ছিলেন। আগাগোড়া লেখাপড়ায় ভাল সীতারাম দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এম.এ। যৌবনে তিনি ছিলেন সক্রিয় গাঁধীবাদী, গাঁধিজীর আদর্শে হরিজন উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে গাঁধীবাদীরা যখন কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকছে এবং সমাজতন্ত্রীদের বাগধারা অবলম্বন করছে, তখন তিনি স্থির করলেন অনুকরণ না করে আসল জিনিষই গ্রহণ করবেন। তিনি সোজাসুজি কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যোগ দিলেন।

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে মোহভঙ্গ হলো তাঁর। ভারতীয় কমিউনিস্টদের বারাণসী কলকাতায় রামস্বরূপের সঙ্গে কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিলেন।

পঞ্চাশের দশকে তিনি কতকগুলি পুস্তক লিখে কমিউনিষ্টদের মেরুদন্ডস্বরূপ নানা মিথ্যা প্রচারের মুখোস খুলে দিলেন। উদাহরণস্বরূপ ঃ আমরা কাকে বিশ্বাস করবো ? পুস্তকে তিনি অর্থনৈতিক ব্যাপারে চীন ও রুশ সরকারের সরকারী তথ্যের সঙ্গে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সহযোগীদের প্রদত্ত তথ্য তুলনা করে কমিউনিস্টদের ধাপ্পাবাজী উন্মোচিত করেছিলেন। এই ধরনের কমিউনিজমের সমালোচনার উৎকর্ষ মার্কিন ও ইউরোপীয় কমিউনিস্ট বিরোধীদের সমালোচনার চেয়ে অনেক বেশী।

১৯৬২ অব্দের চীনা আক্রমণ, যা 'এশিয়ার স্থায়িত্ব অক্ষ' গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন ও ভারত-চীন মৈত্রীরূপ পন্ডিত নেহরুর আত্মম্ভরিতার বিশাল বেলুনটিকে পিন ফুটিয়ে ফাটিয়ে দিয়েছিল, তার ঠিক আগে সীতারাম গোয়েল নেহরুর কমিউনিজমের সঙ্গে মিতালীর নীতির সমালোচনা করেন 'কমরেড কৃষ্ণ মেননের সমর্থন' নামক পুস্তকে। এই পুস্তকে তিনি ভারতের কমিউনিজম-ঝোঁকা নীতির জন্য কৃষ্ণ মেননকে দোষী করার ঝোঁকের রহস্য উন্মোচন করে দেখান যে কৃষ্ণ মেনন নয়, স্বয়ং পন্ডিত নেহরুই ১৯২৭ অব্দে রাশিয়া পরিভ্রমণের পর থেকে কমিউনিস্টদের প্রতি নানাভাবে

সহানুভূতিশীল। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কমিউনিস্টরা তাঁকে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিয়ে অপমান করার পরেও কমিউনিস্টদের প্রতি জওহরলালের সহানুভূতি বরাবরই বজায় রয়েছেঃ যে জুতা তাঁকে লাথি মেরেছে সেই জুতাই তিনি লেহন করেন। নেহরু যথেষ্ট ইংরেজ-মনা ও মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা যুক্ত। ফলে তাঁর পক্ষে স্বৈরাচারী সমাজতন্ত্রী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অনেক ইউরোপীয় বামপন্থীদের মত বিদেশ নীতির ব্যাপারে তিনি সোভিয়েটরাজকে পছন্দ করেন। সেজন্য যখন চীন তিব্বত দখল করলো তখন তিনি কূটনৈতিক স্তরেও তিব্বতীদের বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। এ বিষয়ে তাঁর সহচরদের কোনও ভূমিকা ছিলনা। তিব্বতকে চীনের গর্ভে হস্তান্তর তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চীনা আক্রমণের পরে সীতা রামের বক্তব্য যখন সত্য বলে প্রমাণিত হলো, তখন তাঁকে ভাতে মারার ব্যবস্থা হলোঃ সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরীটি খোয়ালেন তিনি। পেটের জ্বালায় বাধ্য হয়ে ব্যবসা করতে নামলেন এবং বই রপ্তানীর একটি কোম্পানী খুললেন। ঐ কোম্পানীয় আয় থেকে অল্প অল্প টাকা জমিয়ে গড়ে তুললেন নিজের অলাভজনক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান ভায়েস অফ ইন্ডিয়া। ভায়েস অফ ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্য হলো হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এবং হিন্দু সমাজের শত্রুদের প্রকৃতি, রণকৌশল ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পরিবেশন করে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা।

১৯৮১ অব্দে প্রকাশিত তাঁর অবরুদ্ধ হিন্দু সমাজ পুস্তকটির কথা ধরা যাক। হিন্দু সমাজ সপ্তম শতাব্দী থেকে ইসলামের দ্বারা, পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টধর্মের দ্বারা এবং বিংশ শতাব্দী থেকে মার্ক্সবাদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। এইসমস্ত মতবাদের উচ্চারিত উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মকে প্রতিস্থাপিত করে তাদের মতবাদ ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করা, যার সরল অর্থ হিন্দুধর্মের বিনাশ। এটা কোনও পাগলের উদ্ভট চিন্তা নয় (হিন্দুধর্মের আগ্রাসীরা যেমন বলেন)। যদি এইসব আগ্রাসী ধর্মান্তরকারীরা আজ পর্যন্ত তেমন সাফল্যলাভ না করেও থাকে, ভবিষ্যতে তারা ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হবে। কারণ, আফ্রিকার কথা ধরা যাক। ১৯০০ অব্দে আফ্রিকার জনসংখ্যার শতকরা ৫০ জন ছিল পৌত্তলিক। আজ খ্রীষ্টান ও মুসলিম মিশনারীরা সেই সংখ্যাটা নামিয়ে এনেছে শতকরা দশে। হিন্দুধর্মও একই ধরনের ত্রাসের সম্মুখীন। এখনও পর্যন্ত আক্রমণকারীদের সবচেয়ে বড় সাফল্য চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে। এই আক্রমণকারীরা তাদের ক্ষমতার আসন থেকে হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতির যে অবমূল্যায়ণ করছে তা দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক হিন্দুর কাছে বিশ্বাসযোগ্য বস্তু হয়ে উঠেছে। এইসব মারাত্মক শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে ভায়েস অফ ইন্ডিয়া হিন্দু সমাজের বৌদ্ধিক পরিযোজনে তৎপর। রামস্বরূপ এবং সীতারাম গোয়েলই বিশ্বজয়ী একেশ্বরবাদীদের তথাকথিত 'ধর্মের বিজ্ঞান' ও ইতিহাসের একেশ্বরবাদী ভাষ্যের 'পৌত্তলিক' বিরোধিতা করেছেন। এই বিরোধিতা ঐতিহাসিকভাবে, যেমন সীতারাম গোয়েলের হিন্দু খ্রীষ্টান যুদ্ধের ইতিহাস ((History of Hindu-Christian Encounter) এবং তাত্ত্বিক ভাবে, যেমন রামস্বরুপের হিন্দুধর্ম বনাম খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম (Hinduism vis-a-vis Christianity & Islam), হিন্দুদের অভিজ্ঞতার নিরিখে, (যেমন, সীতারাম গোয়েলের Hindu Society under Siege) এবং পয়গম্বরবাদী-একেশ্বরবাদী ধারণামুক্ত ধর্মতত্ত্বের নিরিখে (যেমন, The Word as Revelation:Names of Gods, 'পৌত্তলিকদের' তত্ত্ব সম্পর্কে যুগান্তকারী বক্তব্য)। এই সমস্ত পুস্তক রচনার দীর্ঘস্থায়ী ফল হচ্ছে পৌত্তলিকতা, বিশেষ করে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং মানুষের মোহ কেটে যাচ্ছে একেশ্বরবাদী সংস্কার সম্পর্কে। অন্যান্য লেখকদের মত শুধুমাত্র ঔপনিষদীয় চিন্তার এবং হিন্দুধর্মের অন্যান্য বিষয়ের প্রশংসা (বহু হিন্দু লেখকেরা যা করেন) না করে তাঁরা বিশ্বজয়ী একেশ্বরবাদের দ্ব্যর্থহীন এবং বিশদ সমালোচনা করেছেন।

ভায়েস অফ ইন্ডিয়ার স্বল্পকালীন রাজনৈতিক গুরুত্ব হচ্ছে অন্যান্য হিন্দু আন্দোলন আশ্রিত দুর্বল প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান থেকে বিচ্যুতি। ভারতীয় জনতা পার্টি সমেত এইসব হিন্দু আন্দোলন নিজেদের 'ধর্মেতর' চরিত্র ও নিজেরা মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠদের পক্ষে নির্বিষ, এটা প্রমাণ করার জন্যই নিজেদের যথেষ্ট শক্তি অপব্যয় করে। এইভাবে তারা 'ধর্মেতর' তকমা সংগ্রহের চেষ্টায় নিজেদের স্বাভাবিক হিন্দুসত্তার অবমূল্যায়ণ করে। এইভাবে তারা আজও মার্ক্স-মুসলিম অক্ষ রচিত আচরণবিধি মেনে চলছে। ধর্মেতরবাদীদের বক্তব্যের ভিত্তি টলিয়ে দিয়ে ভায়েস অফ ইন্ডিয়া খেলার এই নিয়মের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং ধর্মেতরবাদের আড়ালে দ্রুত আগুয়ান সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত উন্মোচিত করে দিয়েছে।

হিন্দুধর্মের বৌদ্ধিক প্রতিরক্ষা

বিশ্বজয়ী ধর্মাবলী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে হিন্দু সমাজ এখনও পর্যন্ত বৌদ্ধিকভাবে প্রতিরক্ষা করতে ব্যর্থ। এই সত্য উন্মোচিত হবে ইংরেজী মাধ্যম সংবাদপত্রগুলির পরিবেশিত হিন্দু আন্দোলনের বিরুপাত্মক রূপ দেখে, যার বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজ একরকম অসহায়। হিন্দুসমাজের উন্নতি ও রক্ষার দাবী নিয়ে যে সমস্ত সংস্থা কাজ করছে তাদের কর্মকান্ডের মধ্যে কোনও বৌদ্ধিক মাত্রা সংযোজিত করতে পারছেন না। তাঁরা তাত্ত্বিক দিকটা অবহেলা করছেন, নিজেদের বক্তব্য কখনও প্রচার মাধ্যমের নিকট উপস্থাপিত করতে উৎসাহিত নন।

ভারতজোড়া একটি হিন্দূ সংগঠন আছে--রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এইসংস্থা দেশবাসীর শারীর-শিক্ষা, চরিত্র গঠন, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গঠন ইত্যাদি কর্মে ও হিন্দু সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক মেরুদন্ড হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। পূর্বতন ভারতীয় জনসঙ্ঘ ও ভারতীয় জনতাপার্টি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অনুমোদিত রাজনৈতিক দল। হিন্দুধর্মের পিঠ কীভাবে দেওয়ালে ঠেকে গেছে তা অনুভব করা যায় যখন দেখা যায় এইসব সংস্থাগুলি নিজেদের হিন্দু না বলে জাতীয় বা ভারতীয় ইত্যাদি নিষ্ক্রিয় নামের আড়ালে নিজেদের গোপন করে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের রাজনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তি পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একান্ত মানবতাবাদ। একান্ত মানবতাবাদের ভিত্তি প্রাচীন হিন্দু সামাজিক দর্শন। এই তত্ত্ব অনুসারে পৃথিবীকে পুনর্গঠিত করতে হবে মানব জীবনের চারটি লক্ষ্য (পুরুষার্থ) পূরণের জন্য। এই চারটি লক্ষ্য হলো, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই কর্মকান্ডের ভিত্তি মানবিক মূল্যবোধ—কোনও দৈবী উন্মোচন নয়। সুতরাং এই কর্মকান্ড একটি মানবতাবাদ ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু বিস্ময়ের কথা অজ্ঞজনেরা বলে ভারতীয় জনতা পার্টির লক্ষ্য হিন্দু 'ধর্মরাষ্ট্র' গঠন। সমাজবাদ, বদান্যতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি খন্ডাতাবাদী তত্ত্বের বিপরীতে একান্ত মানবতাবাদ ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও বিজেপির প্রতি অজস্র গালিগালাজ বর্ষণের পরেও স্বীকার করতে হয় তাদের তত্ত্ব পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য। মার্ক্সবাদের পতনের পর, জাতীয়তাবাদের বাড়াবাড়ি ও উদারনীতিবাদের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার কারণে মানবসমাজ যে আদর্শবাদ চায় তা অখন্ড মানবতাবাদ হতে পারে।

হিন্দু আন্দোলনের তাত্ত্বিক উৎস যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য হলেও এই উৎসকে মহীরুহ করে সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যাকে এই তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করার মত বিদ্বৎজনের অভাব আছে। মার্ক্সবাদীরা যখন সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাস্কৃতিক সমস্যাকে তাদের তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে অনেক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে, আর.এস.এস'এর বৌদ্ধিক উৎপাদন এই ক্ষেত্রে একেবারেই শূন্য। আর.এস.এস এর বেশীভাগ উৎপাদন আবেগময় দেশাত্মবোধ ও দেশভাগের বেদনাজনিত ক্রন্দনে

পরিপূর্ণ। কিন্তু একটু গভীর বিশ্লেষণ হিন্দু আন্দোলনের সুপরিকল্পিত নীতি ও বাস্তববাদী কৃৎকৌশলের ভিত্তি রচনা করতে পারতো। বৌদ্ধিকভাবে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভারতের ক্ষত মুসলিম সমস্যার সঙ্গে যুঝবার ব্যাপারে হিন্দু আন্দোলন হতাশাজনকভাবে ব্যর্থ। হিন্দু-মুসলিম সমস্যা নিয়ে অনেক কথা শোনা যায়। এই সমস্যার কার্যকরী সমাধানের পূর্বশর্ত হিসাবে সমস্যাটিকে বিশ্লেষণের বিশাল বৌদ্ধিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ঘটনা হচ্ছে খুব সংক্ষিপ্ত ও প্রাথমিকভাবে ছাড়া (যেমন, ভূতপূর্ব জনসঙ্ঘ নেতা অধ্যাপক বলরাজ মাধোক করেছিলেন, দলের সঙ্গে যাঁর বিবাদ ঘটে। কারণ, তিনি দলের সুবিধাবাদী নীতি ও হিন্দু চেতনার অভাবের সমালোচনা করেছিলেন) কোনও হিন্দু নেতা এই ধরনের কোনও বিশ্লেষণ করেননি। সবাই অভিযোগ করেন, মুসলমানরা এই এই করেছে, মন্দির ধ্বংস করেছে, মাতৃভূমিকে ভাগ করেছে, দাঙ্গা আরম্ভ করেছে, মুসলিম দেশে হিন্দুরা তাড়িত হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু কেউ সাহস করে প্রশ্ন করেনা, ইসলাম বিশ্বাসীরা কেন এই ধরনের আচরণ করে।

বেশীভাগ হিন্দু নেতা মুসলিমদের ধর্মান্ধতা নিয়ে তাত্ত্বিক পড়াশুনা করতে নারাজ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নেতা গুরু গোলওয়ালকর একদা বলেছিলেন, "ইসলাম একটা মহান ধর্ম, মুহাম্মদ একজন মহান পয়গম্বর। কিন্তু মুসলমানরা নির্বোধ।" এটা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, বিভিন্ন দেশ ও জাতের মুসলমানদের একত্রিত করেছে তাদের ধর্ম: মুসলমানরা যদি কোনও অন্যায় করে থাকে তার জন্য দায়ী তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। তারা ব্যক্তিগত ভাবে এর জন্য দায়ী নয়।

অযোধ্যা বিবাদের সময় দেখা গেছে বিজেপী নেতারা রামের জন্মভুমির উপর তাদের দাবী ছেড়ে দেবার জন্য মুসলমানদের কাছে বারবার আবেদন জানাচ্ছে। যুক্তি দেখাচ্ছে, বিতর্কিত স্থানে মসজিদ নির্মাণ কোরান অনুযায়ী নিষিদ্ধ। বিতর্কিত স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি যাবেনা সেটা মুসলমানদের নিজেদের ব্যাপার। কিন্তু, পৌত্তলিকদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে সে জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা মুসলমানদের পক্ষে সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত এবং পয়গম্বরের উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু বিজেপী নেতারা এক উদার ইসলামের স্বপ্নে বিভোর। তাঁরা মুসলমানদের স্মরণ করতে আবেদন জানাচ্ছেন, হজরত মুহাম্মদ অন্যান্য পয়গম্বরদের মতই ঔদার্যের শিক্ষা দিয়েছিলেন। এটা সম্ভবতঃ বিশেষ হিন্দুসুলভ মানসিকতা—যে মানসিকতা সব কিছুর মধ্যে ভাল দেখার চেষ্টা করে। এটা অজ্ঞানতা বা কাপুরুষতা বা আত্মপ্রতারণা। সম্ভবতঃ বহুশতাব্দীব্যাপী আতঙ্কের জগতে বাস করার ফল: হিন্দুরা তাদের অত্যাচারীদের সমালোচনা করতে ভয় করে। যাই হোক, বিজেপী নেতারা যে উদার ইসলামের কথা চিন্তা করে তা সোনার পাথরবাটি।

সেজন্য সীতারাম গোয়েল অযোধ্যা আন্দোলনের কিছুটা সমালোচক। তাঁর Hindu Temples : What happened to them পুস্তকের ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন, হিন্দু মন্দিরসমূহের যথাস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন অযোধ্যার রামজন্মভূমি আন্দোলনের পাঁকের মধ্যে আটকে গেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, হিন্দু মন্দিরগুলি কেন এই দশা প্রাপ্ত হয়েছিল, তা কেউ নীচু গলাতেও জিজ্ঞাসা করেনা। মুসলিম প্রচারবিদদের বক্তব্য, ইসলাম অন্য ধর্মের মানুষদের উপাসনাস্থলের উপর মসজিদ নির্মাণ অনুমোদন করেনা, হিন্দু নেতারা গ্রহণ করে বসেছেন। হিন্দু নেতাদের কথিত ইসলাম কোরান-হাদিশের কোথাও পাওয়া যাবেনা। আশা করা যাচ্ছে এই পুস্তক হিন্দু মনের দ্বন্দ্ব নিরশন করবে। কোনও আন্দোলনই সত্যকে অস্বীকার বা এড়িয়ে গিয়ে সফল হতে পারেনা। আত্মপ্রতারণার ভিত্তিতে গঠিত কোনও আন্দোলন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে পরাজিত হয়।"

কিছুটা বিস্ময়করভাবে হিন্দু সংস্থাগুলি ভায়স অফ ইন্ডিয়া সম্বন্ধে উৎসাহহীন। নিজস্ব কর্মীদের মনে একটা উন্নত হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের মানসিকতা অত্যন্ত শ্লথ। ধর্মেতর

রাষ্ট্র ও মুসলমানদের হাতে তাদের যে দুরবস্থা হয়েছে সেই দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাদের দেহ-মনের যাবতীয় শক্তি ব্যয় করে। এর পরিবর্তে তাদের উচিত ভারতীয় রাজনীতির ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা। বিকৃত মার্ক্স-মুসলিম রাজনৈতিক বাগধারার লৌহমুষ্ঠি থেকে তাদের ক্যাডারদের ও জনসাধারণকেমুক্ত করে নতুন করে শিক্ষিতকরা। ইসলামী সাম্রাজ্যবাদের ও ধর্মেতরবাদীদের গুন্ডামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সব রথযাত্রা, পদযাত্রা ও করসেবার থেকে বেশী কার্যকরী হবে সেটা। হিন্দু রাজনীতিবিদদের তাত্ত্বিক দুর্বলতা ত্বরিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মহাত্মা গাঁধীর কথা উঠলে। হিন্দু সমাজের সপক্ষে গাঁধীর তাৎপর্য নির্ণয় ও একজন হিন্দুর দ্বারা গাঁধীর হত্যা হিন্দু সমাজের পক্ষে অপ্রীতিকর ব্যাপার, যা নিয়ে হিন্দু বিরোধীরা মজা করে। তারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ ও বিজেপী সমেত তার অনুমোদিত সংস্থাগুলিকে 'গাঁধিজীর হত্যাকারী' বলে চিহ্নিত করে। ক্রেগ বাক্সটার তাঁর জনসঙ্ঘ পুস্তকে লিখেছেন এই ধরনের অভিযোগ গাঁধী হত্যা মামলার রায়ের বিরুদ্ধাচারণ করে। তাহলেও বাক্সটার লিখেছেন, এই হত্যা সাধারণভাবে সমস্ত হিন্দু রাজনৈতিক সংস্থার এবং বিশেষ করে আর.এস.এস এর গলায় বিশালাকার পাথর ঝুলিয়ে দিয়েছে। এটা সত্য যে আর. এস. এস গাঁধিজীর ব্যর্থ 'হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি' সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো। যে মনোভাব নাথুরাম গডসের গাঁধী হত্যারও কারণ ছিল। বলরাজ মাধোকের মতে গাঁধীর হত্যা 'অত্যন্ত অহিন্দু জনোচিত কাজ' যা গাঁধীকে ইতিহাসের আস্তাকুড় থেকে বাঁচিয়েছে--পাকিস্তান সৃষ্টির পরে যে আঁস্তাকুড়ের দিকে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ, তাঁর স্বপ্নের 'আন্তঃধর্মীয় একতা'র সমাধির উপর নির্মিত হয়েছিল ইসলামী বিচ্ছিন্নতাবাদের রাজপ্রাসাদ। অধ্যাপক মাধোকের মূল্যায়ণে সত্যতা আছে--যদি আমরা হিন্দু-মুসলিম একতার আকাঙ্খাকেই গাঁধিজীর জীবনের একমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলে ধরে নিই। ভয়েস অফ ইন্ডিয়াই একমাত্র বিদ্বৎ-সংস্থা যারা হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সামগ্রিকভাবে গাঁধিজীর জীবন ও মৃত্যুর ঘটনা বিশ্লেষণ করেছে--তাঁর জীবনের একটিমাত্র দিক বিবেচনা করে তাঁর অবমূল্যায়ণ ঘটায়নি। বিশ্বাসযোগ্য গাঁধিবাদী রাম স্বরূপ (Gandhian Economics এর লেখক) এবং সীতারাম গোয়েল অবিচল বিবেকের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলতে পারেন। তাঁরা গাঁধিজীর হিন্দু সমাজের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থ সেবার কথা যেমন স্বীকার করেছেন তেমনই দেশভাগের ব্যাপারে গাঁধিজীর ব্যর্থতার কথাও বিবৃত করেছেন যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে। যাঁরা ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সততার সঙ্গে বুঝতে চান, তাঁদের পক্ষে সীতারাম গোয়েলের এর Perversion of India's Political Parlance এ মহাত্মা গাঁধীর উপর লেখা অধ্যায়টি অবশ্যপাঠ্য। এতে নাথুরাম গডসের গাঁধী হত্যার যুক্তির যেমন তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে, তেমনই তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে ধর্মেতরবাদী বিদ্বানদের গাঁধিজীর ধর্মেতর বক্তব্যসমূহ কৌশলে উৎকলিত করে হিন্দুদের হেয় করার প্রচেষ্টারও।

ইসলামী ও কমিউনিস্ট মহল সম্প্রতি মহাত্মার নাম নিয়ে হিন্দু ধর্মকে কলঙ্কিত করতে চাইছে। কিন্তু মহাত্মা যখন জীবিত ছিলেন তখন এরা ভুলেও মহাত্মার নাম মুখে আনতো না। মহাত্মাকে আক্রমণ করতো কাঁচাখোলা ভাষায়, তাঁর নীতি বানচাল করে দিত এবং প্রাণপণে বাধা দিত তাঁকে। অন্য অনেক ব্যাপারের মত ধর্মেতরবাদীরা এই ব্যাপারে নিকৃষ্টতম অসতের ভূমিকা গ্রহণ করে। হিন্দুরাই কেবল মহাত্মাকে শ্রদ্ধা করতো। ইসলাম-মার্ক্সবাদী অক্ষ মহাত্মার নাম লাভজনক মনে করছে, কারণ, জনসাধারণের বেশীভাগই হিন্দু এবং তাঁরা এখনও মহাত্মাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে।

মহাত্মার প্রথম এবং প্রধান বিশ্বস্ততা ছিল হিন্দু সমাজের প্রতি। তিনি যদি হিন্দু সমাজের সমালোচনা করে থাকেন তবে তা হিন্দু সমাজের মঙ্গলের জন্যই, হিন্দু সমাজকে জড়তা থেকে মুক্তির জন্য, হিন্দু সমাজের পুনর্জাগরণ ও পুনঃনির্মাণের জন্য।

খ্রীষ্টধর্ম ও উপনিবেশবাদের আনা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তরে হিন্দুধর্মের সপক্ষে মহাত্মাজীর বক্তব্য স্পষ্ট ও অবিচল। বিরুদ্ধশক্তি হিন্দুধর্মের মধ্যে, তামিল, শিখ, হরিজন ইত্যাদির মাধ্যমে যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তার বিরুদ্ধেও মহাত্মাজীর বক্তব্য অনুরূপ। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরই ক্রিয়া-কৌশলের ফলে সমগ্র জনসাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল। মহাত্মা হিন্দু মহাসভার মত হিন্দু ধর্মের নাম নিয়ে পশ্চিমী জাতীয়তাবাদীদের আদলে চিন্তায় ও কর্মে রাজনীতি করেননি। তিনি বুঝেছিলেন হিন্দু জনসাধারণের মন গভীর ধর্মীয় আবেদন দিয়ে শুধুমাত্র জয় করা সম্ভব। তিনি রাজনীতিতে এক আধ্যাত্মিক মাত্রা সংযোজিত করেন, যার ফলে হিন্দুধর্ম বিশ্বজুড়ে সুনাম অর্জন করে, এবং এই তথ্য আজও প্রাসঙ্গিক (এই ব্যাপারে অরুণ শৌরীর Individuals, Institutions, Processes পুস্তকটি দেখুন)। সুতরাং গাঁধিজীকে নাথুরাম গডসে বা অন্যান্য কিছু হিন্দুর মত শুধুমাত্র মুসলিম বিচ্ছিন্নতা রোধে ব্যর্থ একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে চিন্তা করা এক ধরনের মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ।

বিপরীতপক্ষে, "এটাও স্বীকার করা দরকার মুসলিমদের ব্যাপারে মহাত্মার ব্যর্থতা পর্বত প্রমাণ।" এটা একটা ঘটনা যে মুসলমানদের ব্যাপারে মহাত্মার নীতি ছিল হিন্দু সমাজের ক্ষতি করে মুসলমানদের তুষ্টি সাধন। কিন্তু এই তোষণে কোনও লাভ হয়নি, প্রতিটি সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা আরও বেশী বিরুদ্ধমনা হয়ে উঠছিল। "মুসলমানদের অন্তরে এমন কিছু একটা আছে যা অত্যন্ত কঠিন এবং মহাত্মাজীর মত সমুদ্রহৃদয় মানুষও যা টলাতে পারেননি।"

কিন্তু দেশভাগ রোধ করতে না পারার দায়িত্ব যতদিন গাঁধী কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণ করছিলেন ততদিনই তাঁর উপর বর্তায়। দেশভাগ করার রাজনীতি আরম্ভ হয়েছিল ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁর আবির্ভাবের আগেই। যখন তিনি কংগ্রেসের নেতা তখন সব কংগ্রেস নেতারাই সমভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন এমন সব নীতির, যা এখন পাকিস্তান সৃষ্টির রাজপথ বলে চিহ্নিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯১৬ অব্দে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পাদিত লক্ষ্ণৌ চুক্তির কথা ধরা যাক। ঐ চুক্তিতে মুসলিম লীগকে ব্রিটীশ সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধাসমূহ (পৃথক মুসলিম নির্বাচক নির্বাচকমন্ডলী, কেন্দ্রীয় পরিষদে এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব) কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন লোকমান্য তিলক--গোঁড়া হিন্দু বলেই যাঁর পরিচিতি। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের শক্তিশালী টনিক খেলাফৎ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন শুধু যে মুসলিমদের অবিসংবাদিত সমর্থক নেহরুরা তাই নয়, হিন্দু নেতা বলে পরিচিত লালা লাজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও পন্ডিত মদন মোহন মালব্যও।

মহাত্মা ইসলাম সম্পর্কে কিছু আবেগমিশ্রিত এবং অবিমিশ্র অসত্য কথা উচ্চারণ করেছিলেন, একথা সত্য। যেমন তিনি বলেছিলেন, "ইসলাম একটি মহান ধর্ম।" কোরান হিংসা শিক্ষা দেয়, একথা তিনি অস্বীকার করেছিলেন। যদিও তাঁর বিভিন্ন ধর্মের প্রার্থনা অনুষ্ঠানগুলি তাঁকে কোরানের হিংসা, ঘৃণা ও বিভিন্ন বিধিনিষেধ সম্পর্কে তথ্য আহরণের যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু ইসলামের এই নির্মম সত্য সম্পর্কে অন্ধত্ব মহাত্মার উদ্ভাবন নয়। ইসলাম সম্পর্কে এই আবেগমিশ্রিত ভুল--মুহাম্মদ অবতার তুল্য, কোরান পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, ইত্যাদি, মহাত্মার অভ্যুদয়ের অনেক আগে থেকেই ভারতে প্রচলিত।এখনও এইরকম ধারণা বহু হিন্দু সন্ত, বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে প্রচলিত। হিন্দুধর্ম সর্বদাই নিজের আধ্যাত্মিক চোখ দিয়ে ইসলামকে দেখে এবং নিজের গুণ আরোপ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের তত্ত্বের উপর।

ইসলামী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মহাত্মার ব্যর্থতা আসলে হিন্দু সমাজের ব্যর্থতা। মহাত্মা হচ্ছেন দেশভাগের মূল আসামী--নাথুরাম গডসের এই অভিযোগ দৃঢ়তার সঙ্গে বাতিল করে দিয়েছেন

সীতারাম গোয়েল। তিনি লিখেছেন, "মহাত্মা গান্ধী না থাকলেও হিন্দু সমাজ দেশবিভাগ এড়াতে পারতো কিনা সন্দেহ। অন্যদিকে হিন্দুসমাজ যে এই ধরনের যে কোনও ব্যাপারে ব্যর্থ হয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।"

নেহরুবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিপ্রতীপে গাঁধিজীর দৃষ্টিকোণ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ পেয়েছেঃ

- ভারতে একটিমাত্র জাতি বাস করে। আত্মগর্বী ইংরেজ বা নেহরুবাদীদের বক্তব্য অনুযায়ী এই জাতি 'গঠনপথে' নয়। এর একটা সাধারণ সংস্কৃতি আছে যাকে বলে সনাতন ধর্ম (চিরন্তন মূল্যবোধের তন্ত্র, হিন্দু ধর্ম)। এই সাধারণ উত্তরাধিকারের অনুগামীরা জাতি নির্ণয়ের জন্য অন্যত্র ভাষা, বাসভূমি ইত্যাদি যে সমস্ত উপাদানের কথা বলা হয় সেগুলিকে অতিক্রম করে গেছে।
- অন্য কোনও ধর্ম বা তত্ত্ব থেকে হিন্দুধর্ম কোনওভাবেই হীন নয়। পৃথিবীর অন্য যে কোনও ধর্মে যা আছে হিন্দু ধর্মেও তাই আছে। যা হিন্দু ধর্মে নেই তা অপ্রয়োজনীয় বা অসার।
- শুধু মাত্র হিন্দু সমাজের ধর্ম ও সাস্কৃতিক জাগরণের ফলেই স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য ও সামাজিক উন্নতি ইত্যাদি রাজনৈতিক সাফল্য আসবে।

এই সমস্ত বক্তব্য রাজনৈতিক হিন্দু আন্দোলনগুলিও মানে। এটা জোর দিয়ে বলা দরকার ধর্মেতরবাদীরা মহাত্মা সম্বন্ধে যা দাবী করে, তা ডাহা মিথ্যা। ভারতীয় চামচাবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের তোমার দিকে টেনে আনা প্রয়োজন এবং তাঁদের আপ্তবাক্য উৎকলিত করা অত্যাবশ্যক। সুতরাং মহাত্মাজীর উত্তরাধিকারের জন্য হিন্দু আত্মবিশ্বাসের বার্তার বিশ্বাসঘাতক নেহরুবাদীরা মহাত্মাকে ধর্মেতরবাদী বলে প্রক্ষেপিত করার জন্য প্রচুর মাথার ঘাম ঝরিয়েছে। হিন্দুসমাজ যদি ধাপ্পাবাজদের মুখোস খুলে দিতে পারে এবং মহাত্মার বাণী ভাল করে অনুধাবন করে তবে জনসাধারণের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে নেহরু ও গাঁধীর মধ্যে কী পার্থক্য, দেশপ্রেমিক ও তাদের লেজুড়দের মধ্যে কী পার্থক্য, হিন্দু সহনশীলতার আচরণকারীদের ও মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের জুতোচাটাদের মধ্যে কী পার্থক্য। যারা নিজেদের এখন গাঁধীবাদী বলে, কিন্তু যারা মহাত্মাকে তাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু বলে বিবেচনা করতো সেইসব হিন্দু বিরোধীদের (যেমন, মিশনারীদের) অনুকরণ করে হিন্দুধর্মকে হেয় করে মহাত্মাকে দ্বিতীয় বারের জন্য হত্যা করেছে, তাদের হাত থেকে একমাত্র এইভাবে উদ্ধার করতে পারে মহাত্মাকে।

সীতারাম গোয়েল মহাত্মাকে হিন্দু পুনর্জাগরণের কেন্দ্রে স্থাপিত করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ হিন্দু আন্দোলনের সামগ্রিক শিক্ষা হিন্দুদের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণের পূর্বে প্রয়োজন হিন্দুদের ধর্মীয় ও সাস্কৃতিক পুনর্জাগরণ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভাষা হওয়া উচিত সনাতন ধর্মের ভাষা। তবেই তা বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদের ভাষাকে মোকাবিলা ও পরাজিত করতে পারবে। যত ভালভাবে হিন্দুসমাজ হিন্দু সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতাকে অনুধাবন করতে পারবে ততো ভালভাবে তারা ধর্মের মুখোসধারী রাজনৈতিক তত্ত্বগুলির স্বরূপ ধরতে পারবে। মহর্ষি দয়ানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ লোকমান্য তিলক ও শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সমতালে মহাত্মা গাঁধী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভাষা নির্মাণ করেছেন। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্তি তাঁর সেই জাতীয়তাবাদের ভাষার ওজস্বীতা নষ্ট করেনি, যা তিনি উচ্চারণ করেছেন পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। এর বিপরীতে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্তির মধ্যেও একটি গভীর তাৎপর্য রয়ে গেছে।"

ইসলামের ব্যাপারে মহাত্মাজীর ব্যর্থতা থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তা হলো, হিন্দু সমাজ শান্তি ও সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে যদি ইসলাম থেকে সে থেকে দূরে থাকতে পারে। ইসলামী তত্ত্ব ও তার অন্তস্থিত বিশ্বজয়ের রাজনৈতিক আকাঙ্খা কোনও শুভেচ্ছা দিয়েই পরিবর্তন করা সম্ভব

নয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত হিন্দু সংস্থাগুলি এখনও এড়িয়ে যাচ্ছে। কোনও হিন্দু নেতা বলবেন ইসলাম ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক তত্ত্ব, আমরা ইসলাম সম্পর্কে নমনীয়তা দেখাবো না--এটা অচিন্তনীয়। ইসলামী ভাণ-ভনিতার এ ধরনের স্পষ্ট প্রতিবাদ শুনে ধর্মেতরবাদী প্রচার মাধ্যমগুলি কীরকম চিৎকার জুড়ে দেবে সেটা চিন্তা করলেই হিন্দু নেতাদের এড়িয়ে যাওয়ার কারণ অনুভব করা যায়। কিন্তু তাদের বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন, ধর্মেতরবাদীদের এ ধরনের ক্রোধ ও চিৎকার-চেঁচামেচি সহ্য করা হিন্দু সমাজের মারাত্মক শত্রু সম্বন্ধে সম্পর্কে সত্য (আত্ম)উপলব্ধির চেয়ে কম অস্বস্তিকর কিনা।

ইউরোপীয় মানবতাবাদীরা, যাঁরা খ্রীষ্টধর্মের ক্ষমতার আসনকে আক্রমণ করেছিল, তাঁদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তা ছিলেন, তাঁরা : Ecrasez l'Infame! (দুর্নীতি, অর্থাৎ চার্চকে ধ্বংস করো) বলতেন। বহু উদারনৈতিক এবং সমাজতান্ত্রিক দল খ্রীষ্টধর্মের বিরোধিতা সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা। তাঁরা বলতেন খ্রীষ্টধর্ম "জনগণের আফিম।" লক্ষ্য করার বিষয় যে তাঁরা জানতেন না যে ধর্ম কখনও অযৌক্তিক পয়গম্বরী একেশ্বরবাদের চেয়ে ভাল হতে পারে)। ধর্ম যে একটি প্রাগৈতিহাসিক কুসংস্কার--এ বিষয়ে কমিউনিস্টরা আজ পর্যন্ত অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা। তারা ধর্মের হাত থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করতে বদ্ধ পরিকর।

এমনকি খ্রীষ্টবিরোধী উদারনৈতিক ও সমাজতন্ত্রীরা যখন খ্রীষ্টান-গণতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে সমঝোতা করলো, তখনও তারা নিজেদের বক্তব্য থেকে এক চুলও বিচ্যুত হলোনা। সুতরাং হিন্দু আন্দোলন যদি স্পষ্টভাষায় বলে, তারা ইসলামকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ধ্বংসাত্মক তত্ত্ব বলে মনে করে, তবে তারা নতুন কিছু করবে না।

আর.এস. এস এবং বিজেপি মুসলমানদের বন্ধু হতে চাইছে। তারা গর্বের সঙ্গে বলবে তাদের দলে কিছু মুসলমান আছে--এমনকি নেতৃত্বেও। এর ফলে তাদের পক্ষে ইসলামকে সমালোচনা করা শক্ত। একজন সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতা বলেছেন কোনও সংস্থায় মুসলমান থাকা লাভজনক। কারণ, এর ফলে ঐ সংস্থাকে ইসলামবিরোধী সংগ্রাম থেকে বিরত করা যায়। এমনকি বিজেপীর মধ্যে সবচেয়ে হিন্দুমনা মুসলমানও মরণফাঁদ ছাড়া কিছু নয়। কারণ, তার ভূমিকা অন্তর্ঘাতীর। তার সামনে কেউ ইসলাম সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করবে না। মুসলমানের সামনে কোনও হিন্দু (বিশেষতঃ নেহরুবাদী সমাজে যার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা আছে) খোলাখুলিভাবে ইসলামের সমালোচনা করতে পারেনা।

এটা বলছি না যে বিজেপী কোনও মুসলমানকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করবে না। দলটি অবশ্যই প্রমাণ করবে মুসলমানদের বিশ্বস্ততা শুধুমাত্র ইসলামী প্রতিষ্ঠানের প্রতিই নয়। বুখারী আর সাহাবুদ্দিনরা সমস্ত মুসলমানদের ইজারা নিয়ে নেয়নি। কিন্তু দল কখনও তার হিন্দু পরিপ্রেক্ষিত ভুলে যাবেনা। দল স্বীকার করবে ইসলাম বর্তমানে হিন্দু সমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু।অবশ্য দল কিছুটা নরম ভাষা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু বক্তব্যের বিষয়বস্তু যেন অবিকৃত থাকে। ইসলাম সম্পর্কে হিন্দু আন্দোলনের বক্তব্য পরিস্কার হওয়ার পরে মুসলিমজাত ভারতীয়দের দলের দিকে আকর্ষিত করা যেতে পারে "ইসলাম মহান ধর্ম" বলে প্রশংসা করে নয়, সেরা হিন্দু দর্শন ঐকান্তিক মানবতাবাদের সদর্থক ও অসাম্প্রদায়িক দর্শন দ্বারা, 'হিন্দু' তকমার উপর অহেতুক জোর না দিয়ে। গান্ধীবাদী পরিপ্রেক্ষিতে সনাতন ধর্ম কোনও ধ্বজা নয়, ব্যক্তি ও সমাজের চরম লক্ষ্য উপলব্ধি করার পন্থা মাত্র। এর কেন্দ্রীয় উপাদান হচ্ছে সত্য। ভয়েস অফ ইন্ডিয়া এই সনাতন ধর্মকেই বাস্তবায়িত করতে চাইছে। মহাত্মা গান্ধীর কাছে যেমন, ভয়েস অফ ইন্ডিয়ার কাছেও তেমন, সত্য লক্ষে উপনীত হবার উপায়। "মানুষের মনের এই যুদ্ধে সত্যই একমাত্র অস্ত্র। সত্য বলতেই হবে,

হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যেমন, বিদেশী তত্ত্বগুলি সম্বন্ধেও তেমন--যে বিদেশী তত্ত্বগুলি হিন্দু সমাজ ও ধর্মের বৈরী হয়েছে হিন্দু মাতৃভূমির অধিকারের সময় থেকেই।'' যেসব রাজনৈতিক নেতারা হিন্দু সমাজের বিশ্বস্ত বলে নিজেদের দাবী করেন তাঁরা উপরোক্ত বাক্যগুলি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের অস্পষ্ট মনোভাবের ব্যাপারে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করতে পারেন। ইসলাম সম্পর্কে সত্যের মুখামুখি না হওয়াটা গাঁধীর সময়ে গুরুতর ভুল হয়েছিল। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের যুগে এই সত্য অনুধাবন না করা ভবিষ্যতের পক্ষে মারাত্মক ভুল বলে প্রতিপন্ন হতে পারে।

হিন্দু মন্দিরগুলির কী হলো?

ইসলাম যে সমস্ত স্থান জয় করেছে সেখানে স্থানীয় উপাসনার স্থলগুলিকে প্রতিস্থাপিত করেছে মসজিদ দ্বারা। ইরাণে কোনও জরথুস্ত্রবাদী বা মানিকীবাদীদের উপাসনাস্থল নেই। মধ্য এশিয়ায় নেই কোনও বুদ্ধ মন্দির। একইরকম ভাবে ভারতে (সুদূর দক্ষিণ ছাড়া--যেখানে ইসলাম প্রবেশ করছে অনেক দেরীতে) মুসলিম যুগ থেকে অক্ষত আছে এমন কোনও মন্দির নেই। কিন্তু হিন্দু মন্দিরের ভিত্তির উপর গঠিত হাজার হাজার মসজিদ আছে-বহুসময় ধ্বংসীকৃত মন্দিরের মাল মশলা দিয়েই নির্মিত। ইসলামী প্রতিমাধ্বংসবাদের বহুবৎসরব্যাপী কাহিনী শোনাবার জন্য সেই সব মসজিদের নৃতাত্ত্বিক অবশেষ রয়েছে মূক সাক্ষী হিসাবে।

ভয়েস অফ ইন্ডিয়ার হিন্দু মন্দির নামধারী পুস্তকের প্রথম খন্ডের উপনাম প্রাথমিক সমীক্ষা। পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯০ অব্দের বসন্তকালে। এর মধ্যে আছে ২০০০ ভারতীয় মন্দিরের কথা যেগুলি বলপ্রয়োগ করে মসজিদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। এই তালিকা অসম্পূর্ণ। কারণ, এই তালিকাতে পাকিস্তান বা অন্য দেশের কথা নেই, যেখানে বলপ্রয়োগ করে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া, এই দু হাজার মসজিদ নির্মাণ করতে ধ্বংস করা হয়েছিল দু হাজারের অনেক বেশী মন্দির। দিল্লীর কুয়াত-ইল-ইসলাম মসজিদের কথা ধরা যাক। ঐ মসজিদের প্রবেশপথের উপর একটি প্রস্তরলিপি সগর্বে ঘোষণা করছে, এটা তৈরী করতে ২৭ টি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। এই ২০০০ মসজিদ ভাসমান হিমশৈলের সামান্য চূড়া মাত্র। হিন্দু মন্দিরের প্রথম খন্ড ১৯৮৯ অব্দের নভেম্বরে অযোধ্যার রাম মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের প্রতিবাদে বাঙলাদেশে ধ্বংসীকৃত ২০০ মন্দিরের একটি তালিকাও দিয়েছে। মুসলমানরা বাবরী মসজিদের (যে মসজিদ তারা গত কয়েক দশক ব্যবহার করেনি) প্রস্তাবিত ধ্বংসের জন্য চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু বহুলোক অনুধাবন করেনা সংখ্যালঘুদের উপাসনাস্থল ধ্বংস করা ইসলামী দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

এই পুস্তকে নিবন্ধ লিখেছেন রাম স্বরূপ, জয় দুবাসী, অধ্যাপক হর্ষ নারায়ণ, এবং অরুণ শৌরী। সম্পাদক সীতারাম গোয়েলের মত রাম স্বরূপও ইসলামী অসহনীয়তা ও প্রতিমাধ্বংসের জন্য কোরান ও হাদিশের পরাকরণমনস্কতাকে দায়ী করেছেন। সাম্প্রতিক অপলাপবাদের জন্য মার্ক্সবাদীদের ভূমিকারও সমালোচনা করেছেন তিনি। লিখেছেন: মার্ক্সবাদীরা ভারতের ইতিহাস বৃহদাকারে পুনর্লিখন আরম্ভ করেছে এবং এ ব্যাপারে সুপরিকল্পিতভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। ভারতের প্রতি মার্ক্সবাদীদের ঘৃণা, বিশেষ করে ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রতি বৈরীতা অত্যন্ত গভীর এবং তাত্ত্বিকভাবে শক্তিকৃত। এই ঘৃণা অতীতের চরম সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণাকেও ছাপিয়ে গেছে।.....মার্ক্স ভারতের স্বায়ত্বশাসনের দাবী বাতিল করে দিয়েছিলেন।......ভারতের মার্ক্সবাদীরা তুর্কীদের ভারত বিজয়ের প্রশংসাকারী। মার্ক্সবাদীরা পুরাতন সাম্রাজ্যবাদকে আদর্শ করে নতুন এক সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী। এর মূল হচ্ছে গভীর আত্মবিচ্ছিন্নতা

এবং এর সবচেয়ে বড় বন্ধু হচ্ছে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক অশিক্ষা। ...মার্ক্সবাদীদের দর্শন, আদর্শ ও প্রভাবকে বিরোধিতা না করে ভারতের যথার্থ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়।" ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতিবিদ জয় দুবাসী রাম মন্দিরের প্রথম ইঁটটি গাঁথার সঙ্গে বার্লিন প্রাচীর ভাঙ্গার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন--দুটি ঘটনা একই দিনে ঘটেছিল। তিনি লিখেছেন, "অযোধ্যায় যখন মন্দির উঠছে তখন ৫০০০ মাইল দূরে ইউরোপে ভাঙছে কমিউনিস্টদের মন্দির। দুটি ঘটনা....একদিকে ভারতে নেহরু-উত্তর যুগের অবসান ঘোষণা করছে, আরম্ভ হচ্ছে সত্যকারের জাতীয়তাবাদের যুগ; অন্যদিকে ইউরোপে সূচনা হচ্ছে সত্যকারের গণতান্ত্রিক যুগের। ইতিহাস ভারতে নেহরু যুগকে বাতিল করছে, ইউরোপ বাতিল করছে কমিউনিজমকে।

খন্ডতাবাদী তত্ত্ব, যা মানুষকে শুধুমাত্র মাল উৎপাদন কারী বা উপভোগকারী হিসাবে দেখে, তার যুগের অবসান ঘটেছে। মানুষের মানসিক দিগন্তের আকাশ এখন পরিষ্কার। সেই আকাশে সনাতন ধর্মের যুগপ্রাচীন আদর্শের উত্তরসুরী ঐকান্তিক মানবতাবাদের সূর্য উদীয়মান।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন ঐতিহাসিক অধ্যাপক হর্ষ নারায়ণ। তিনি ব্রিটীশ প্রভাবের বহির্ভূত স্থানীয় মুসলিমদের রচিত উনবিংশ শতাব্দীর চারটি কাহিনী উল্লেখ করে বলেছিলেন, একটি রাম মন্দিরের স্থলে বাবরী মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এরমধ্যে একটি কাহিনী লোকেরা ভুলে যায়নি: এটা হচ্ছে একটি পুঁথির অংশ যা সম্প্রতি একটি মুসলিম প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে, অসুবিধাজনক অংশটি বাদ দিয়েই। ভাগ্যক্রমে লেখকের এক বংশধর বিতর্কিত অংশটি নিজের খরচে মুদ্রিত করেছেন।

একই ধরনের কাহিনী একটু বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করেছেন অরুণ শৌরী। এই বিদ্বান ব্যক্তিটি ইন্ডিয়ান একসপ্রেসের সম্পাদকের পদ থেকে ছাঁটাই হয়েছেন ভি. পি. সিং এর সঙ্গে ইমাম বুখারীর 'বন্ধুত্ব' নিয়ে সংবাদ প্রকাশের দায়ে। উল্লিখিত মন্দিরের স্থলে মসজিদের চারটি কাহিনীর একটি কাহিনী সরলভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল একটি পুস্তকে। কিন্তু সম্প্রতি এই পুস্তকের প্রতিটি কপি ফেরত পাবার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, যাতে কাফেররা এই পুস্তকের কথা না জানতে পারে। অপলাপবাদী ঐতিহাসিকদের বা ধর্মেতরবাদী ঐতিহাসিকদের কেউই এই ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য নষ্ট করার প্রচেষ্টার নিন্দা করেননি। তাঁরা হিন্দুদের বক্তব্য দুর্বল হয়ে যায় এরকম অপকর্ম সর্বদাই মার্জনা করে থাকেন। হিন্দু অযোধ্যা আন্দোলনের নেতারা যত ভুলই করুন না কেন, হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা বৌদ্ধিক পর্যায়ে সত্য ও সততার জন্য সংগ্রাম করেন, সংগ্রাম করেন ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে--সে বিকৃতি ছোট বড় যাই হোক না কেন।

অন্যদিকে এই বিতর্কে অপলাপবাদী ঐতিহাসিকদের অবস্থান নিয়ে ভবিষ্যতে যখন মার্ক্সবাদীদের কৃত ইতিহাস বিকৃতি নিয়ে গবেষণা হবে তখন ইতিহাস-বিকৃতির একটি স্মরণীয় উদাহরণ হয়ে থাকবে এই ঘটনা।

১৯৯০ অব্দের নভেম্বরে লোকসভা ও উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় Hindu Temples : What Happened to Them পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাব ওঠে। বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, সম্ভবতঃ অপলাপবাদীরা ভেবেছিল বাজেয়াপ্ত করার ফল উল্টো হবে। মানুষের দৃষ্টি যাবে মন্দির ধ্বংস করে নির্মিত বিতর্কিত মসজিদগুলির দিকে। কিন্তু কোনও অপলাপবাদীই এগিয়ে এসে বলেননি শ্রীযুক্ত গোয়েলের প্রদত্ত তালিকার এই এই ভুল দেখা যাচ্ছে। The Telegraph পত্রিকায় পুস্তক সমালোচক মানিনী চট্টোপাধ্যায় পুস্তকটিকে শুধুমাত্র 'খুব খারাপ বই' বললেন। অপলাপবাদীদের পক্ষে খুব খারাপ তো বটেই!

The Islamic Evidence উপনামযুক্ত সীতারাম গোয়েলের পুস্তকের দ্বিতীয় খন্ডটি

প্রকাশিত হয় ১৯৯১ অব্দের মে মাসে। ঐ পুস্তকে হিন্দুধর্ম ধ্বংস করার জন্য ইসলামী জেহাদের আরও উদাহরণ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ঐ পুস্তকের মধ্যে আছে অপলাপবাদীদের উপর সোজাসুজি আক্রমণ। ভূমিকায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে মথুরার কৃষ্ণ-জন্মভূমি মন্দির ও সিধপুরের রুদ্র মহালয় মন্দিরাবলী নিয়ে--যেগুলি বলপূর্বক দখল করে তার স্থলে মসজিদ নির্মিত হয়েছে।এইভাবে উন্মোচন করা হয়েছে অপলাপবাদীদের তথ্য গোপন ও বিকৃত করার অভিসন্ধি। ঘোড়ার মুখের খবর অধ্যায়ে পুরো ১৭৪ পৃষ্ঠা ব্যয় করা হয়েছে মুসলিম দলিল থেকে উদ্ধৃতি প্রদানে, যাতে হিন্দু মন্দির ধ্বংসের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট মহিমাত্মক ভাবে। এটা একটা তালিকা মাত্র এবং যথেষ্ট মর্মস্পর্শী হলেও ভাসমান হিমশৈলের চূড়া মাত্র।

পুস্তকটি যতটা প্রচার পাওয়া উচিত ততোটা প্রচার যদি পায়, তবে অপলাপবাদীদের মুখ দেখাবার অবস্থা থাকবে না। তাদের মুখোস খুলে গেছে, এখন তাদের পিঠ বাঁচাতে পারে শুধু মাত্র প্রচার মাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণের দ্বারা। প্রচার মাধ্যম বহুবৎসরব্যাপী ইতিহাস বিকৃতির সংবাদকে চেপে দিয়ে মুখ বাঁচাতে পারে তাদের।

পুস্তকটির পরিশেষে সীতারাম গোয়েল অপলাপবাদী ঐতিহাসিকদের কাছে তাদের দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্র অর্থাৎ হিন্দুধর্ম বৌদ্ধ, জৈন ও প্রকৃতিবাদীদের বহু ধর্মস্থান অধিকার বা ধ্বংস করেছে এই সম্পর্কে একটি প্রশ্নমালা রেখেছেন। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছি অপলাপবাদীরা প্রচার করছে যে হিন্দুরা বৌদ্ধদের তাড়িত করেছে এবং বৌদ্ধ ধর্মকে ধ্বংস করেছে। গোয়েল এখন অপলাপবাদীদের রণ-আহ্বান জানিয়ে বলছেন এগিয়ে এসে প্রমাণ দাখিল করতে :

- বৌদ্ধ বা অন্য ধর্মের মন্দির প্রতিস্থাপিত করে যে সব মন্দির স্থাপিত হয়েছে তার একটি তালিকা দিতে।
- এইসব মন্দির ধ্বংস সংক্রান্ত শিলালেখ বা অন্য লেখের তালিকা।
- এইসমস্ত মন্দির ধ্বংসের লিখিত বিবরণের তালিকা।
- হিন্দুদের লেখা পুস্তকে এইসব অহিন্দুদের মন্দির ধ্বংস সংক্রান্ত মহিমাত্মক বা নিষেধাত্মক বর্ণনার তালিকা।

স্বভাবতই অপলাপবাদী ঐতিহাসিকরা এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে আসেন নি। তাদের একমাত্র উত্তর সম্ভবতঃ তাদের পূর্ব-উল্লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধেই দেওয়া হয়ে গেছে। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত পুস্তকগুলির কথা আমরা আগেই জেনেছি। সেগুলি গোয়েলের প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে অভিযোগ প্রমাণ করতে।

অন্য ধর্মের প্রতি অন্ধভাবে বিদ্বিষ্ট নয় এমন ধর্মের অস্তিত্ব আছে এবং তারা অল্প-স্বল্প বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বাস করছে। যদিও এসব সত্যে বিশ্বাস করা প্রতিমাধ্বংসী ধর্মের পক্ষে সম্ভব নয়।

হজরত মুহাম্মদের আদর্শের মুখোমুখি

দ্বিতীয় খন্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ১৪৫ পৃষ্ঠার প্রতিমা ধ্বংসের ইসলামী তত্ত্ব সংক্রান্ত অধ্যায়টি। নাম, প্রতিমা ধ্বংসের ইসলামী তত্ত্ব (অর্থাৎ, অন্যলোকেরা যাকে পবিত্র বলে মনে করে সেইসব মন্দির বা অন্য স্থান অপবিত্র করা এবং ধ্বংস করার তত্ত্ব)। এই অধ্যায়ে পাঠকের দৃষ্টি ভারত থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আরবে। ভারতে ইসলামী ধ্বংসলীলা পয়গম্বর মুহাম্মদের কৃত আদর্শ কর্মের সুদূরবর্তী অনুকরণ--যেটা আবার কোরানেরও বিধান। ইসলামের অন্যতম

অবিস্মরণীয় মুহূর্ত মক্কায় পৌত্তলিকদের তীর্থক্ষেত্র কাবা দখল ও তার ৩৬০ টি দেবদেবীর মূর্ত্তি মুহাম্মদ ও তাঁর জামাতা আলি কর্তৃক ধ্বংস-সাধন। যেহেতু কোরান ও পয়গম্বরের কৃত কর্মাবলী ইসলামে বিধান বলে ধরে নেওয়া হয়, সেহেতু অন্য ধর্মের প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস ও অপবিত্র করা ইসলামের অন্তর্নিহিত উপাদান বলে আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে অন্য ধর্মের মন্দির দখলের জন্য ইসলাম যে সমস্ত ভঙ্গুর যুক্তি প্রদান করে সেগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। অযোধ্যা বিতর্কের মুসলিম পক্ষ রাম যে সত্যই ঐ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ দাবী করে। যদি কোনও স্থানের পবিত্রতার জন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োজন হয় তা হলে মুসলমানদের কাবা এবং পর্বত মন্দির (Temple Mount) দুটিই হারাতে হয়। কাবা মুসলমানরা দখল করেছিল আরবের পৌত্তলিকদের কাছ থেকে। কিন্তু তারা দাবী করে ঐ মন্দির তৈরী করেছিল আদম এবং ইব্রাহিম সেই মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন (এবং এই তথ্য ইহুদীরা ঈশ্বরের বাক্য গোপন করার জন্য চক্রান্ত করে ওল্ড টেস্টামেন্টে লেখেনি) পরে পৌত্তলিকরা এই মন্দির ছিনিয়ে নেয়। টেম্পল মাউন্ট বা পর্বত মন্দির সম্বন্ধে তারা বলে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে স্বর্গভ্রমণ করার পরে মুহাম্মদ এই পর্বতে নেমেছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত হাস্যকর দাবী ঐতিহাসিক সত্য বলে গ্রহণ করা যায়না। পর্বত মন্দির মুসলমানরা ইহুদীদের কাছ থেকে নিয়ে ছিল ইহুদী পয়গম্বরদের সঙ্গে মুহাম্মদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

সীতারাম গোয়েল পয়গম্বর ও অবিশ্বাসীদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। একজন পৌত্তলিক হিন্দু হিসাবে তিনি আরবী পৌত্তলিকদের অবস্থান বিচারে উৎসাহী। এই বিচারে গোয়েলের পুস্তক ধর্মবিজ্ঞান চর্চায় এক দিকদর্শী। আজ পর্যন্ত ইসলাম চর্চা হয়েছে হয় খ্রীষ্টীয় দৃষ্টিকোণে, যে দৃষ্টিকোণে মুহাম্মদের প্রতিমাপূজকদের ধ্বংসের তত্ত্ব উচ্চকিতভাবে সমর্থন করা হয়, কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করা হয় তাঁর পয়গম্বরত্বে; নয় আধুনিকতাবাদীদের ইসলামকে 'ভালভাবে বোঝার' প্রচেষ্টায়। এই 'ভালভাবে বোঝার প্রচেষ্টা' মানে মহাম্মদের যাবতীয় সমালোচনাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে প্রচার করে সত্য গোপন করা। সুতরাং একজন পৌত্তলিক এখানে পৌত্তলিকদের দৃষ্টি কোণ উপস্থাপিত করছেন।

কেবলমাত্রই একজন হিন্দুই আরবী পৌত্তলিকদের দৃষ্টিকোণ হৃদয়াঙ্গম করতে সক্ষম এবং সক্ষম তাদের পক্ষ সমর্থন করতে। কারণ, হিন্দুধর্মই একমাত্র পৌত্তলিক সংস্কৃতি যা এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে বেঁচে আছে। এবং হিন্দু ও আরবী পৌত্তলিকদের সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হুবহু এক। ইসলাম পূর্ব যুগে ভারতীয় ও আরব পৌত্তলিকদের মধ্যে শুধু যে বাণিজ্যিক আদান প্রদান ছিল তাই নয়, দুটি পৌত্তলিক জাতির মধ্যে তীর্থযাত্রাও চলতো। আরবে গিয়ে হিন্দু তীর্থযাত্রীরা আরবী তীর্থস্থানে পূজা দিত ; কাবার বিখ্যাত কালো পাথরটিকে তারা পূজা করতো শিবলিঙ্গ জ্ঞানে। আরবেরা গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে আসতো পূজা দিতে। মুসলমানেরা বিশ্বাস করতো যে আরবী দেবী অল লাত এবং মানাত সোমনাথে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সেই জন্যই গজনীর মাহমুদ সোমনাথ আক্রমণ করে মন্দির ধ্বংস করেছিলেন।

ইসলামের প্রতি 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টি দিতে উৎসাহী আধুনিক বহুসংস্কৃতিবাদীরা কিন্তু পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে ইসলামী অভিযোগগুলিরই পুনরাবৃত্তি করেন। কিন্তু তাদের সেই অভিযোগের উত্তর দিতে কোনও পৌত্তলিক আর সেখানে উপস্থিত নেই। এই সমস্ত ইসলামপন্থীদের বক্তব্য পৌত্তলিকতা আরববাসীদের সন্তুষ্ট করতে পারছিল না, সেই জন্য তারা অত্যাচারী পৌত্তলিক নেতাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ইসলামকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। ঐ সময় মুসলমানরা পৌত্তলিকদের তাড়নার সন্মুখীন হয়েছিল এবং পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের লড়াই ছিল মূলতঃ আত্মরক্ষামূলক। ইসলামে নারীর অবস্থান নীচু হলেও ইসলামপূর্ব যুগ থেকে অনেক প্রগতিশীল। পৌত্তলিকরা

মুহাম্মদকে বাধা দিয়েছিল। কারণ, মুহাম্মদ তাদের অন্যায় ক্ষমতার বিরোধিতা করেছিলেন এবং তারা কাবার কুসংস্কারপূর্ণ পুতুলপূজা থেকে অন্যায়ভাবে আয় করতো। এই ধরনের অবান্তর কথাবার্তা অপলাপবাদীরা ভারতে ইসলামের অগ্রগতি সম্বন্ধেও বলে থাকে।

ইউরোপে প্রকাশিত ইসলাম সম্পর্কে যাবতীয় পুস্তকে ইসলামী পক্ষের যাবতীয় বক্তব্য দাঁড়ি কমা সমেত পুনরাবৃত্তি করা হয়। কেবলমাত্র কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মুহাম্মদের সম্পর্ক নিয়ে মৃদু সমালোচনা করা হয়েছে। মুহাম্মদ যদি কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে থাকেন, তার কারণ তিনি যে একেশ্বরবাদ নিজেদের লোকের উপর চাপিয়েছিলেন, সেই একেশ্বরবাদ ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের কাছে থেকেই ধার করা এবং তিনি এই দুই ধর্মাবলম্বীদের কাছে থেকে তাঁর পয়গম্বরত্বের স্বীকৃতিও প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু পৌত্তলিকদের জন্য কোনও রকম কৃপাও তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিলনা (অবশ্য এক দুর্বল মুহূর্তে তিনি পৌত্তলিকদের তিন দেবীকে কিছুটা সম্মান দিয়ে ফেলেছিলেন, পরে তিনি অবশ্য নিজের ভুল শুধরে নেন) যাঁরা আন্তঃ-সাংস্কৃতিক কুসংস্কার ও ভুল ধারণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চান তাঁরা সেই আরব পৌত্তলিকদের লুপ্ত সংস্কৃতির প্রতি মরণোত্তর সম্মান প্রদর্শন করবেন, যাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাক্ষ্যসমূহ নষ্ট করা হয়ে গেছে এবং এখন কেবল ইসলামী ধর্মগ্রন্থের পাতা থেকে পরোক্ষভাবে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপকে জানা যায়। সচেতন ঐতিহাসিকরা স্মরণে রাখবেন, সবচেয়ে বড় শত্রু পৌত্তলিকদের সম্পর্কে ইসলামী বক্তব্য স্বভাবতই প্রচন্ডভাবে একপেশে হবে। হাদিশে সাহিত্যে কাফেরদের সম্পর্কে বক্তব্য এবং এখন যারা ইসলামকে 'ভালভাবে বুঝতে চায়' তাদের বক্তব্য যে উদ্দেশ্য সাধন করে এবং ইহুদী বিরোধী চলচ্চিত্র The dirty Jew Suss, বা জালিয়াতী করা Protocal of the Sages of Zions যে উদ্দেশ্য সাধন করে, তা মূলতঃ একই ধরনের। তারা একটি ধর্ম ও একটি জাতিকে বিনষ্ট করার ঘটনাকে বৈধ বলে প্রদর্শন করতে চায় (মুহাম্মদ মুসলমানদের একটি জাতিতে পরিণত করেছিলেন এবং কাফেরদের আখ্যাত করেছিলেন বিরুদ্ধ জাতিরূপে)। ইসলামের ইতিহাসের ইসলামী ভাষ্যের মূল নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক, কিন্তু কোরানে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ ছাড়াও কোরান অভ্যুদয় ও হাদিশ সাহিত্য রচনার মধ্যকার দুই শতাব্দীতে আসল ঘটনার বহু বিকৃতিসাধন করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, হাদিশে বলা হয়েছে মদিনায় মুহাম্মদ রাজ্য স্থাপন করার আগে মুসলমানরা মক্কায় নানা রকম তাড়নার সম্মুখীন হচ্ছিল। কিন্তু এই বক্তব্য কোরানের অধিকতর নির্ভরযোগ্য বক্তব্য দ্বারা সমর্থিত নয়। কোরান মুহাম্মদের ধর্মপ্রচারের পৌত্তলিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছে। নতুন ধর্ম সম্বন্ধে কী কী প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল তারা এবং সেই সব প্রশ্নের কী কী উত্তর তারা দিয়েছে। কিন্তু কোরানের মধ্যে তাড়নার কথা নেই। সংঘর্ষের আরম্ভ হলো যখন মুহাম্মদ মদিনায় নেতৃরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং মরুভূমির মধ্যে লুট করতে আরম্ভ করেছেন মক্কা ও অন্যান্য স্থানের পৌত্তলিকদের বাণিজ্যগামী দল। এমনকি ইসলামী কাহিনী আমাদের জানিয়ে দেয় কারা ছিল সেই সব সংঘর্ষের আক্রমণকারী। ইবন ইসাক কৃত মুহাম্মদের জীবনীতে পাই ইসলামী ইতিহাসে প্রথম রক্ত ঝরে যখন মক্কায় নতুন উপাসক সম্প্রদায়ের প্রার্থনা দেখার সময় এক মক্কাবাসী হেসে ফেলে। তাকে বেদম প্রহার করা হয় (হাসি ব্যাপারটা এখনও ইসলামী তত্ত্বে ভাল চোখে দেখা হয়না)। একদিন হঠাৎ মুহাম্মদ কাবার মধ্যে ঘোষণা করলেন, যাঁর হাতে আমার নিজের জীবন ধরা আছে তিনি তোমাদের ধ্বংস কামনা করছেন। কোনও রকম প্ররোচনা ব্যতিরেকে তিনি পৌত্তলিকদের উৎসব ভন্ডুল করতেন এবং মক্কাবাসীর ধর্মকে অপমান করতেন।

পৌত্তলিকরা কখনই অসহিষ্ণু ছিলনা। তারা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের নিরাপদে মক্কায় বাস করতে

দিয়েছিল--যদিও কয়েক দশক আগে এই সব জাতিরাই পৌত্তলিকদের তাড়না করেছিল। মুহাম্মদই নিজে বাঁচো এবং অন্যকে বাঁচতে দাও নীতি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বিশেষতঃ তাঁর কাকা আবু তালিবের মৃত্যু শয্যায়, যখন আরব পৌত্তলিকরা ঐ নীতি প্রস্তাব করেছিল। যেসব সরলমনা মানুষ দাবী করে কোরানের বাক্য *'তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে (প্রিয়)'* ইসলামী সহনশীলতার বক্তব্য, তাদের জানা প্রয়োজন যে ঐ প্রস্তাব আরবী পৌত্তলিকরাই মুহাম্মদের কাকা আবু তালিবের মৃত্যুশয্যায় দিয়েছিল এবং মুহাম্মদ যথারীতি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ঐ প্রস্তাব। তিনি দাবী করেছিলেন পৌত্তলিকদের ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া রেহাই নেই। কোরানের ঐ অধ্যায়ের বক্তব্য, দুটি ধর্মের মধ্যে কোনও সমঝোতা সম্ভব নয়। ভারতের তথাকথিত ধর্মেতরবাদীরা, যাঁরা ইসলামের সঙ্গে দেশজ সংস্কৃতি মিশ্রিত করে মিশ্র সংস্কৃতির স্বপ্নে বিভোর, তাঁদের জানা উচিত প্রত্যেকটি কোরান-বিশ্বাসী মুসলমান মনে করে ইসলামের সঙ্গে অন্য কোনও কিছুর মিশ্রণ নিষিদ্ধ ও ধর্মদ্রোহীতার নামান্তর।

মক্কাবাসীরা তাঁর পয়গম্বরত্ব অস্বীকার করেছিল, এব্যাপারটা মুহাম্মদ মেনে নিতে পারেননি। তিনি সকল অবিশ্বাসীদের নরকস্থ করার ভয় দেখিয়েছিলেন। যদি সভ্য ও সহিষ্ণু মক্কাবাসীরা মুহাম্মদের উচ্চকিত অসহিষ্ণুতা চিরকাল সহ্য না করে থাকে, তার কারণ সহজেই অনুমেয়। এতৎসত্ত্বেও তাদের সহিষ্ণুতার মাত্রা আধুনিক ইসলাম সমর্থকরা আমাদের যতটা বিশ্বাস করতে বলেন, তার থেকে অনেক বেশী। যে ধর্ম যুদ্ধ করতে শেখায় সেই ধর্মেই শহীদ-তত্ত্ব বিকশিত হয়। বৌদ্ধধর্ম ও তাওবাদে শহীদ শব্দটি অজানা। হাদিশ সাহিত্য গোটা ব্যাপারটার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত পৌত্তলিক সমাজকে দায়ী করেছে, প্রথম যুগের মুসলমানদের দিয়েছে বীরত্বপূর্ণ শহীদত্ব। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ঘটনাবলীর পৌত্তলিকদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা লোপাট করে দেওয়া হয়েছে, মুসলিমদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা নয়। এতেই বোঝা যাচ্ছে কে আক্রমণকারী আর কে আক্রান্ত।

সীতারাম গোয়েলই প্রথম ঐতিহাসিক যিনি একদর্শী মুসলিম বক্তব্য থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেছেন। তিনি পৌত্তলিকদের সংস্কৃতি ও ধর্মের বিচিত্রতা সম্পর্কে নানা খোদিতলিপি, গ্রীক, রোমক ও মেসোপটেমিয়ার প্রাক-ইসলামী সাহিত্য এবং পরোক্ষভাবে ইসলামী সাহিত্য বিষয়ানুগভাবে পর্যালোচনা করে তার সারাংশ রচনা করেছেন। প্রাক-ইসলামী আরবী দেবদেবীর উপাসনা যাবতীয় ধ্যানধারণা সমেত গ্রীক বা হিন্দু দেবদেবীর উপাসনার সঙ্গে তুলনীয়। সেই ভিত্তিতে সীতারাম গোয়েল একেশ্বরবাদীদের ভাষ্য "আরবী পৌত্তলিকরা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে মরতো" বাতিল করে দিয়েছেন। শেষে শ্রী গোয়েল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, "আরবী পৌত্তলিকরা বর্বর এবং ধর্ম ও সংস্কৃতিহীন, এটা নিতান্তই বদনাম ছাড়া কিছু নয়--যদি না আমরা ধর্ম ও সংস্কৃতির ইসলামী সংজ্ঞা গ্রহণ করি।"

দোষের মধ্যে আরব পৌত্তলিকরা হেরে গিয়েছিল। তারা মুহাম্মদের পন্থা বুঝতে পারেনি এবং তার সঙ্গে যুঝতে পারেনি, এটা তাদের ত্রুটি হিসাবে বিবেচনা করা সঙ্গত নয়। একটা গণতান্ত্রিক সমাজ অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্রের কাছে পরাজিত হয়েছে, এটাই তার প্রথম বা শেষ উদাহরণ নয়। আমাদের সময়ে কীভাবে লেনিন, হিটলার বা মাও-সে-তুং সাফল্যলাভ করেছেন তা আমরা দেখেছি।

আধুনিক ইসলাম সমর্থনকারীরা এবং মুসলমানদের পশ্চিমী বন্ধুরা একটি মিথ্যা ধারণা প্রচার করে যে মক্কাবাসীরা তাদের ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাত না, তারা কাবার বার্ষিক তীর্থযাত্রা থেকে উদ্ভূত আয় নিয়েই মাথা ঘামাত। এর উদাহরণ হচ্ছে কোরানের ওলন্দাজ অনুবাদে জে. এইচ. ক্রেমারের ভূমিকা: ঐ ভূমিকায় ক্রেমার লিখেছেন, 'মুহাম্মদের সময়ে হজের ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেটা হয়ে গিয়েছিল টাকা-পয়সার একটা বিরাট বাজার। সেখানে ভক্তির চেয়ে

ব্যবসাই প্রাধ্যান্য পেত। আরবী ধর্ম ছিল প্রাগৈতিহাসিক বহুদেবতাবাদ--সত্যকারের ধর্মবিহীন।"

কিন্তু বাস্তবপক্ষে কাবা ইসলামী তীর্থ হওয়ার পরে মক্কার রাজস্ব প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। মুসলমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেহাদের দ্বারা সংগৃহিত ধনের অংশীদার হয় মক্কাবাসীরা এবং তাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। ঐতিহাসিকদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে ইসলামী সূত্রসমূহ মক্কাবাসীদের সম্পর্কে এ ধরনের আর্থিক লাভ-ক্ষতির কথা বলে না। তারা মক্কাবাসীরা যে পৌত্তলিক ছিল এবং মুহাম্মদের পয়গম্বরত্ব অস্বীকার করেছিল, এই তথ্যের উপরই জোর দেয়। তারা বড় জোর 'অবিচার' ও 'ধন সঞ্চয়ের' বদনাম দিয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে ইসলামের যুদ্ধের উদ্দেশ্য তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনের উন্নতিসাধন নয়, বরং তাদের ধর্মের পরিবর্তন-- যদিও ইসলামায়নের ফলে অনবরত জেহাদের মালের ভাগ পাওয়ার ফলে এবং ইসলামী রাষ্ট্র বিশাল আকার নেওয়ায় তাদের যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক উন্নতি ঘটে।

মক্কার পৌত্তলিকদের ইসলামায়নের যে মিথ্যা ঐহিক কারণ প্রদর্শন করা হয় সেগুলি সত্য সত্যই মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। মক্কাবাসীরা ছিল বণিক, আধুনিক ইসলামপন্থীদের দাবী অনুযায়ী হয়তো সুদখোরও। কিন্তু মুহাম্মদ শান্তিপ্রিয় বাণিজ্যগামী দলের উপর ৮০ টি আক্রমণ করেছিলেন তার মধ্যে ২৬ টিতে মুহাম্মদ স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন। কোরানে বলা হয়েছে পৌত্তলিকদের উপর আক্রমণ থেকে সংগ্রহ করা লুটের মাল এবং পৌত্তলিকদের দেশ আক্রমণ করা বৈধ (৮.৬৯)। দাস সমেত লুটের মালের এক পঞ্চমাংশ পয়গম্বরের নিজস্ব প্রাপ্য। যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে সমস্ত মালই আল্লাহ্ এবং তাঁর পয়গম্বরের।

অপলাপবাদের চূড়ান্ত উদাহরণ পাওয়া যায় বিপান চন্দ্রের 'আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতা' পুস্তকে। এই পুস্তকে লেখক বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা' ইসলামের অসহিষ্ণু রূপ সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ হিসাবে তিনি উৎকলিত করেছেন হিন্দু মহাসভা নেতা স্বতন্ত্রবীর সাভারকরের ১৯২৩ অব্দের একটি রচনা: "ধর্ম হচ্ছে শক্তিশালী গতিপ্রদায়ক। লুটতরাজও তাই। কিন্তু যেখানে লুটতরাজের দ্বারা ধর্ম প্রণোদিত হয় এবং লুটতরাজ ধর্মের হাতের যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় তখন দুটির সমবেত উৎসারিত শক্তির কেবলমাত্র তুলনা করা যেতে পারে তাদের আগ্রাসনের পর মানুষের দুর্দশা ও ধ্বংসের বহরের সঙ্গে। প্রচুর ধনী ও প্রচুর দরিদ্র সবারই এক অবস্থা--এমনই দুর্দম সেই শক্তি; ভীষণ ক্ষিপ্ত! সেই শক্তি আকস্মিক ভাবে ভারতকে গ্রাস করেছিল যখন গজনীর মাহমুদ সিন্ধু নদী অতিক্রম করে আক্রমণ করেছিল ভারত।"

অবশ্য বিপান চন্দ্র এই বক্তব্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নি। তিনি এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছেন যে এই ধরনের বক্তব্য হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের 'মিথ্যা চেতনার' উদ্ভাবন ছাড়া কিছু নয়।

সাভারকরের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা চিন্তা যাই হোক না কেন, ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য অনিন্দ্য। এটা যে শুধু ভারতে ইসলামের ইতিহাসে প্রতিফলিত তাই নয়, কোরান ও হাদিশের দ্বারা বিশদভাবে সমর্থিত। এইসব শাস্ত্র আমাদের মনে কোনও রকম সন্দেহ রাখেনা যে পয়গম্বর নিজেই লুটতরাজের সঙ্গে বিনা দ্বিধায় ধর্মকে মিশিয়েছিলেন।

লুটের মালের নিজের অংশ যুক্তিসম্মত করতে গিয়ে মুহাম্মদ বিধান দেন যে লুট ও প্রত্যেকটি মুসলমানের দেয় দাতব্যকর জাকাত থেকে প্রাপ্য তাঁর অংশ দাতব্যকর্মে ব্যবহৃত হবে। এটা হচ্ছে গিয়ে ইসলাম সমর্থকদের হাতের আর একটা হাতিয়ার: মুহাম্মদ লোভী ও স্বার্থপর পৌত্তলিকদের দাতব্যকর্ম শিখিয়েছিলেন। ঘটনা হচ্ছে জাকাত আদতে পৌত্তলিকদের প্রথা। এটাকে মুহাম্মদ জাতীয়করণ করেছিলেন মুসলিম রাষ্ট্রে। আর সত্যকারের দাতব্য কর্মের চেয়ে এই ধন বেশী ব্যবহৃত হয়েছে নতুন নতুন সমরাস্ত্র কিনে বৃহত্তর যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য। কোরানে বিধান দেওয়া হয়েছে

এই ধন ব্যবহৃত হবে "যাদের মনকে (ইসলামের প্রতি) অনুরাগী করা আবশ্যক তাদের জন্য," এবং "আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী"দের জন্য। যার সোজা অর্থ, জেহাদের জন্য ও উৎকোচ দিয়ে মানুষকে ইসলামায়িত করার জন্য। সুতরাং মুসলিম রাষ্ট্রের নানা উপায়ে সংগৃহিত রাজস্ব ব্যবহৃত হবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রসারণ ও ইসলামী রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য। গরীবদের দাতব্য করে খুশী রাখা এই প্রকল্পের একটা উপাদান হলেও তা গৌণ উপাদান। উদ্দেশ্য ব্যবহৃত পথকে সমর্থন করে, লুটের মালের অবিরাম সরবরাহ মদিনার যুদ্ধ ভান্ডার ও ইসলামী সৈন্যদের উৎসাহকে অনবরত সহায়তা করে গেছে। যাঁরা পৌত্তলিক এবং মুসলমানদের বিরোধের কারণরূপে পৌত্তলিকদের অর্থলুব্ধতাকে চিহ্নিত করতে চান তাঁরা বরং মুহাম্মদের দিকে লক্ষ্য দিন।

মুহাম্মদের ঈশ্বরবাণীকে কেন পৌত্তলিকরা প্রত্যাখান করেছিল তার উত্তর কোরানের মধ্যেই নিহিত আছে। এটা কোনও জাগতিক লোভের ব্যাপার নয়; কারণ, ঐ সময়ে, বিশেষতঃ মুহাম্মদ মদিনাতে রাজ্য বিস্তার করার পর মুহাম্মদের ধর্মে যোগদান করার অর্থ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া ও বহু ক্রীতদাসের মালিকানা অর্জন করা। আসল কারণ মুহাম্মদের সঙ্গে আলোচনা কালে মক্কাবাসীরা যা প্রকাশ করেছিলেন তা হলোঃ

তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষের ধর্মতে আস্থাবান। এটা কোনও নির্বোধ আসক্তিবাদ নয়; ধর্ম চিরন্তন সত্য, এই মূল ধারণার যুক্তিযুক্ত অনুসরণ। আমাদের সেই পুরাতন ধর্ম পালন করতে দাওঃ যা আমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষে মঙ্গলকর ছিল, আমাদের পক্ষেও যথেষ্ট মঙ্গলকর। মক্কাবাসীরা আন্তরিকভাবে বিতৃষ্ণ হলেন যখন মুহম্মদ নিজের মাতা সমেত পূর্বপুরুষদের নরকের আগুনের ব্যবস্থা করলেন, কারণ তারা ইসলামপূর্ব অজ্ঞানতার যুগে (জাহিলিয়া) বাস করতেন। প্রজ্ঞাবান মানুষেরা গোটা মানবসম্পদকে স্বর্গগামী মুসলমান এবং নরকগামী পৌত্তলিকদের মধ্যে বিভক্ত করাটা নিছক ছেলেমানুষী এবং মুহাম্মদের পক্ষে অহঙ্কারসূচক বলে মনে করেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, মক্কাবাসীরা যিনি দৈববাণী শুনতে পান এবং নিজেকে ঈশ্বরের দূত বলে মনে করেন, তাঁকে সঠিক ভাবেই চিনেছিলেন। পৌত্তলিকরা যখন বলতেন মুহাম্মদের ভর হয়েছে, তখন কোরান নির্দেশ দিত তাঁকে কী বলতে হবে। পৌত্তলিকরা ভাবতেন মুহাম্মদের মাথার গন্ড গোল হয়েছে। এটা মধ্যযুগের নিছক ইসলামের বিরুদ্ধতাজনিত বক্তব্য নয়, বরং বহু সমসাময়িক মানুষের উপলব্ধি। মুহাম্মদের রক্ষণশীল ইসলামী জীবনী ও হাদিশ সাহিত্য পরোক্ষভাবে একরকম স্নায়ুমানসিক রোগের ইঙ্গিত দেয়। শৈশবাবস্থায় মুহাম্মদের মাঝে মাঝে পড়ে যাওয়া (ঈশ্বরের দ্বারা, কিন্তু সম্ভবতঃ মৃগী রোগের ফলে) অভিভাবকদের চিন্তিত করে তুলতো। যখন কোরানের বাক্যের অভ্যুদয় ঘটতো তখন তিনি ঠান্ডা হয়ে যেতেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতো। কোরানের বাক্যের প্রথম অভ্যুদয় যখন ঘটলো তখন তিনি প্রচন্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেই বিস্মিত হয়ে চিন্তা করেছিলেন তিনি পাগল হয়ে গেছেন কিনা (যদিও তাঁর শান্ত স্বভাব ও স্ত্রী খদিজার সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার তাঁকে আত্মস্থ করেছিল)।

যখন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছে যে মক্কাবাসীরা মুহাম্মদের বিরোধিতা করেছিল কারণ তারা মুহাম্মদকে বিশ্বাস করতো না এবং তারা এক 'পাগল কবির' কথায় পূর্বপুরুষদের বহুকাল প্রচলিত ধর্ম বিসর্জন দিতে রাজী ছিলনা, তখন এই তথ্যকে অবজ্ঞা করে মনগড়া সিদ্ধান্ত যে মক্কাবাসীরা নিতান্তই আর্থিক লোভের বশবর্তী হয়ে তাদের ধর্মকে সমর্থন করেছিল, এমত প্রচার করা পদ্ধতিগত ভাবে অসমর্থনীয়। মক্কাবাসীরা যে মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন আপনিও সেই মঞ্চে দাঁড়ানঃ কল্পনা করুন, এক অপরিচিত ব্যক্তি আপনার বাড়ীতে ঢুকে বলছে তাঁর একটি নিজস্ব টেলিফোন লাইন আছে সেটার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা যায়। তিনি একাই সেই সুবিধা ভোগ

করেন এবং তাঁর পরে কেউ সেই সুবিধা পেতে পারেন না। শেষ বিচারের দিনে তিনি ভগবানের কাছে আপনার জন্য সুপারিশ করবেন। আপনি তাঁর কথায় যদি বিশ্বাস করেন তাহলে আপনি স্বর্গে যাবেন। অবিশ্বাস করলে পতন হবে নরকে। এখন আপনার চিন্তা কী হবে?

ইসলামের প্রকৃতি

মনবৈজ্ঞানিক কারণে মুহাম্মদ উৎসাহের সঙ্গে ঈশ্বরের দূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে তত্ত্বের পৃষ্ঠপোষণা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে মুসলিম যাজকেরা যার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন তা আদতে ইহুদী ও খ্রীষ্ট ধর্মের পুরাতন একেশ্বরবাদের অনুবর্তন। সেই গুলি থেকে মুহাম্মদ সংগ্রহ করেছিলেন কয়েকটি বাইবেলের গল্প এবং কিছু তাত্ত্বিক ধারণা ও পয়গম্বরতত্ত্ব। ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে পৌত্তলিকতা ও বহুদেবতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। মুসা তাঁর স্বউৎভাবিত যিহোভা উপাসনার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালের পয়গম্বররা বহুদেবতাবাদের বিরুদ্ধে একদিকে যেমন ব্যবহার করেছিলেন কুৎসিততম ভাষা, অন্যদিকে তাকে নিকেশ করার জন্য অবলম্বন করেছিলেন হীনতম উপায়। আধুনিক খ্রীষ্টপন্থীদের লেখায় এক দেবতা ও বহুদেবতাদের সংগ্রামকে যথার্থ দৈব আরাধনার সঙ্গে অর্থ, ক্ষমতা, উপভোগ, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি ঐহিক অধর্মীয় দোষাবলীর আরাধনার তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু এগুলি মোটেই সেই পৌত্তলিকতাবাদের সঙ্গে পয়গম্বরদের ভয়ানক ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কারণ নয়। দুটি যুযুধান পক্ষ মোটেই নৈতিক পার্থক্যযুক্ত নয়। পয়গম্বর মুসাকে প্রদত্ত ঈশ্বর যিহোভার দশটি প্রত্যাদেশের মধ্যে প্রথম দুটিই (অন্য কোনও দেবতা নেই, ঈশ্বরের কোনও আকার নেই) দুটি মতাদর্শের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে। সেই পার্থক্য কখনও ভয়ানক বনাম শান্তিপূর্ণ, লম্পট বনাম সৎ (পয়গম্বরদের ভাষায় পৌত্তলিকতাবাদের আর এক নাম সতীত্বনাশ), ভাল বনাম মন্দ, বা ধার্মিক বনাম অধার্মিকের মত পার্থক্যযুক্ত নয়। পৌত্তলিকদেরও একটি সংস্কৃতি ছিল, ছিল নৈতিকতার বিধান; আচার, উৎসব, মরমী অভিজ্ঞতা ও মতবাদ সমেত একটি ধর্ম--যা ছিল একেশ্বরবাদীদেরও; কিন্তু অন্য একটি দেবতার ছত্রতলে। সেই দেবতা ভয়ানক এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ আল্লাহ্ / যিহোভা। মুসা সোনার গোবৎসকে সহ্য করতে পারেননি, তার কারণ ঐ গোবৎস দামী ধাতুর তৈরী বলে নয় (যেমন আধুনিক নীতিবাদী খ্রীষ্টানরা দাবী করেন)। যাঁরা দেবতার পূজা করেন তাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক যে পূজনীয় দেবতার গৌরবের জন্য তারা তাদের ধনের কিছু অংশ ব্যয় করবে। মুসার অনুসারী পৌত্তলিকদের শৃঙ্গযুক্ত দেবতা মুসার কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল, তার কারণ ঐ বৃষদেবতা সুবর্ণনির্মিত বলে নয়, বরং ঐ দেবতা যিহোভার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে।

সীতারাম গোয়েল তাঁর পুস্তকের প্রতিমাধ্বংসবাদের আলোচনায় ঐ মতবাদের উৎস রূপে ওল্ড টেস্টামেন্টকে চিহ্নিত করেছেন এবং সন্নিবিষ্ট করেছেন পৌত্তলিকতাবাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মৌখিক এবং শারীরিক বলপ্রয়োগের যাবতীয় উদাহরণ। সেই তথ্য থেকে ইসলাম সমর্থনকারীরা বলতে পারেন, দেখুন, ইসলাম সম্পর্কে আপনি যা বলছেন ইহুদীধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্ম তার থেকে ভাল কিছু নয়। কথাটা সত্য---আপনি যদি ইহুদী ধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের প্রথম দিকটা বিবেচনা করেন। কিন্তু এটা একটা আশাব্যঞ্জক ব্যাপার যে এই দুটি ধর্ম ধর্মান্ধ মুসা থেকে অনেক পা এগিয়ে এসেছে। ইহুদীদের বহুবছর ধরে কোনও রাষ্ট্র ছিলনা। এবং তারা 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও' এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী বিকশিত করেছে। তাদের বিশ্বজয়ের কোনও তত্ত্ব ছিলনা এবং তাদের প্রতিশ্রুতভূমি' ছিল সীমিত অঞ্চলের। আজকের ইস্রায়েলের ইহুদী অধিকর্তারা খ্রীষ্টান, ইসলাম ও বাহাই ধর্মাবলম্বীদের

ধর্মীয় অধিকারকে সম্মান দেন ও তাদের তীর্থস্থানগুলিকে রক্ষা করেন। খ্রীষ্টধর্মের ক্ষেত্রে তাদের পৌত্তলিক ও অবিশ্বাসীদের তাড়না করার দিনগুলি যদিও খুব অতীতের ব্যাপার নয় এবং ধর্মান্ধতার পরিমার্জিত সংস্করণ এখনও তাদের মধ্যে দেখা যায়। তবুও দ্বিতীয় ভ্যাটিক্যান পরিষদ অন্য ধর্মের স্বাধীনতার কথা স্বীকার করেছে এবং অন্য ধর্মের সঙ্গে 'আলোচনা' করার ব্যাপারটা একেবারে ভন্ডামী নয়।

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে অমানবিক খ্রীষ্টধর্মের মানবিকীকরণ ঘটছে। উদাহরণস্বরূপ খ্রীষ্টান জাতিসমূহ আঠারো শতাব্দীর পুরাণো ক্রীতদাসপ্রথার অবসান করেছে। এটা কোনও বহিঃশক্তির চাপের ফলে নয়, খ্রীষ্টান যাজক ও চিন্তাবিদরা সেই রেনেশাঁর কাল থেকে নৈতিকতার বিচারে দাসপ্রথাকে বাতিল করেছেন। উইলিয়াম উইলবারফোর্সের (১৭৫৯-১৮৩৩) উদাহরণ প্রদর্শন করে যে এই প্রথা রদে খ্রীষ্টান মৌলবাদীরাও অংশগ্রহণ করেছিল। বিপরীতপক্ষে ইসলামী দেশসমূহে দাস প্রথা রদ হয় পশ্চিমী সংস্কৃতির চাপে। এখনও পর্যন্ত সুদান ও মরিট্যানিয়াতে কালো ক্রীতদাস কেনা-বেচা হয়। ইসলামী ক্রীতদাসত্ব মুসলিম-কাফের দ্বন্দ্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত: পৌত্তলিকরা কখনও মুসলমান ক্রীতদাস রাখতে পারেনা, কিন্তু মুসলমানরা পৌত্তলিকদের ক্রীতদাস রাখতে পারে, এবং ধরে ধরে ক্রীতদাস বানাতে পারে পৌত্তলিকদের। যার জন্য ইউরোপীয় লোককথায় সান্তাক্লজের সহকারীরূপে আছে 'কালো পিট' নামে এক মুসলমান। কালো পিট দুষ্টু ছেলেদের ধরে ঝোলায় পুরে নিয়ে যায়। তারপর তাদের লাঠি দিয়ে প্রহার করে। আবার দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদের নাম *কাফ্রির* উৎপত্তি আরবী কাফের বা বিধর্মী থেকে। আরবী সমাজে কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসী ক্রীতদাসরা কাফের বলেই চিহ্নিত হতো। আজকাল অবশ্য কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসী ও আমেরিকাবাসীদের নিকট ইসলামকে দাসবিরোধী বলে প্রচার করা হচ্ছে। এটা অপলাপবাদের আর একটি কুৎসিত উদাহরণ।

খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের পার্থক্যের আর একটি উদাহরণ হলো, যেসব খ্রীষ্টান মিশনারীরা আমেরিকার নতুন পৃথিবী দখল করেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল মানবিকতাবোধ সম্পন্ন। তারা তাদেরই হাতে আমেরিকার আদিজাতিদের দুর্দশা দেখে করুণা বোধ করতো এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতো। এদের মধ্যে কিছু লোক আবার ঐসব আদিজাতিদের জীবন ও স্বাধীনতা (কিন্তু কদাচ ধর্ম নয়) রক্ষা করার চেষ্টা করতো। মুসলমানদের আগ্রাসন ও ভারত জয়ের এতো ইতিহাসের মধ্যে কোথাও এ ধরনের কোনও বিবেচনার কথা দেখা যায়নি। খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে অন্ততঃ বিভিন্ন ধর্মীয় সীমান্তের প্রাচীর ভেদ করে সর্বজনীন বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও নৈতিকতার একটা বীজ উপ্ত রয়েছে। যদিও বহুদিন ধরে একেশ্বরবাদী ও যাজকীয় পরাকরণবাদের দ্বারা তা ছায়াবৃত হয়েছিল (ধর্মমন্ডলীর বাইরে মানুষের মুক্তি নেই)। ইসলামের মধ্যে এই বিশ্বজনীনতার ঝলক কেবলমাত্র কয়েকটি শরিয়ৎবোধহীন (বেশরা) সুফির মধ্যে আবদ্ধ। এইসব সুফীরা ইসলামী কর্তৃপক্ষের কাছে ধর্মদ্রোহী বলে পরিচিত। যাইহোক, এইসব বেশরা সুফিদের রচনা কেবলমাত্র কিছু মুক্ত বুদ্ধিজীবিদের নিকট আদরনীয়, কিন্তু আদি ইসলাম সর্বদাই শিশুদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সারা বিশ্বজুড়ে অগণিত বিদ্যালয়-মাদ্রাসার মাধ্যমে। একজন দলছাড়া উদার মুসলমানের কোরানকে উপেক্ষা করার শক্তি নেই। পৃথিবীর কোনও ইসলামী মতধারার ক্ষমতা নেই যে বলে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার ব্যাপারটা রহিত করে দেওয়া হলো। পৃথিবীর মানবসম্পদকে মুসলিম ও অমুসলিমে বিভক্ত করার ব্যাপারটা ইসলামী তত্ত্বে এমনই মূলগত যে ইসলামকে উদার ধমর্মতে পরিবর্তন করার কথা কেউ চিন্তাও করতে পারেনা।

মুসার কল্পিত একেশ্বরাবাদকে খ্রীষ্টধর্ম কিছুটা অতিক্রম করতে পারে। কারণ, তা ছাড়াও গ্রীক

পৌত্তলিকদের দর্শন থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছে খ্রীষ্টধর্ম। সুতরাং এই ধর্ম তার ইতিহাসের অংশবিশেষ বাতিল করতে পারে তার পুরো সত্তাকে বিসর্জন না দিয়ে এবং ধর্মটিকে পুরোপুরি বাতিল না করে। ইহুদীধর্ম তার ব্যাখ্যা তালমুদের মধ্যে বহুত্ববাদী সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। ফলে বিশ্বজয়ী ধর্মাবলীর ধর্মান্ধতার বিরোধী হয়ে উঠেছে তা। কিন্তু ইসলাম কোরান ও ব্যক্তি মুহাম্মদের সঙ্গে একেবারে আবদ্ধ। নিজেকে ভেঙ্গে না দিয়ে তা এই দুটি উপাদানকে অস্বীকার করতে পারেনা। নিজের ভাষায় ইসলাম একটি সেলাইহীন পোষাক। এই পোষাক থেকে একটি সূতা টেনে বের করে নিলে গোটা পোষাকটাই খুলে পড়বে। যেহেতু ধর্মান্ধতা এবং কাফের তাড়না কোরানের মূলগত এবং গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সেহেতু কোনও উদার ইসলামের উদয় হওয়ার সম্ভবনা কদাচ নেই।

সীতারাম গোয়েলের কঠোর ইসলাম সমালোচনাকে কোন মতেই আরব-বিরোধী জেহাদ বলা যাবেনা (যদিও ইউরোপে এই ধরনের সমালোচনাকে আরব-বিরোধী জাতিবাদ বলেই চিহ্নিত করা হয়)। আরবদের কাছে ইসলাম (সাধারণভাবে একেশ্বরবাদ) বিদেশী এবং মানসিক পীড়াযুক্ত খেয়াল বলে প্রতিভাত হয়েছিল। মুহাম্মদ জোর করে তাদের উপর সেই একেশ্বরবাদ চাপিয়ে দিয়েছিলেন। সীতারাম গোয়েল ব্যাখ্যা করেছেন ইসলাম সবপ্রথম আরবদেরই সংস্কৃতি অপহরণ করেছিল। পারসিক, মিশরীয় ইত্যাদি বহুজাতির মত ইসলাম অপহরণ করেছিল আরবদেরও ইতিহাস। আরবদের ইসলাম-পূর্ব ইতিহাস 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' বলে তাদের যথার্থ পূর্বপুরুষদের প্রতিস্থাপিত করেছিল কল্পিত ইব্রাহিম ও ইসমাইলের দ্বারা। এমনকি মুহাম্মদের অধীনে আরবরা যে বৃহদাকার অপরাধ করেছে তার জন্য আরবদের দায়ী করা যাবেনা, দায়ী করতে হবে ইসলামকে। ইসলাম-পূর্ব আরবের ভাবমূর্তি আর ইসলাম-উত্তর আরবদের ভাবমূর্তি এক নয়। কারণ, ইসলামই আরবদের বর্বর করেছে। ইসলামের সমালোচনা করার অর্থ কোনও জাতি বা ব্যক্তিকে আক্রমণ নয়। এটা একটা তত্ত্বের সমালোচনা এবং পয়গম্বরবাদের মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা। সমস্ত অপরাধের জন্য মুসলমানদের দায়ী না করে এই সমালোচক বহু মুসলমানজাত ব্যক্তিবিশেষকে অব্যহতি দিতে চান সব দোষ থেকে। দোষটা যার প্রাপ্য দিতে চান ঠিক তাকেই: এই ধর্মান্ধতার তাত্ত্বিক চালিকাশক্তি হচ্ছে ইসলাম।

ইউরোপে আর কোনও ভলটেয়ার জন্মাবে না, যে তাঁর বইএর নাম দেবেন Mahomat ou le Fanatisme (মুহাম্মদ বা ধর্মান্ধতা, ধর্মান্ধতাকে সমালোচনা করে একটি নাটক, যাতে দেখানো হয়েছে মুহাম্মদ তাঁর এক সমালোচককে হত্যা করছে)। এমনকি রুশদীর ঘটনাও ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবিদের টনক নড়াতে পারেনি--যাতে তাঁরা ইসলামী ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে জনসাধারণকে জানাবেন, মুহাম্মদ নিজে এক কবিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে তাঁর সমালোচনা করেছিল। এখন আর কোনও সোপেনহাউয়ার নেই যিনি খোলাখুলিভাবে ইসলামী বর্বরতার সঙ্গে প্রতিতুলনা করবেন দক্ষিণ এবং পূর্ব এশিয়ার মানবিক দর্শনের।

ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবিরা ইসলামের সমালোচনার ক্ষেত্রে একটা অলিখিত নিষেধাজ্ঞা মানেন। আমি জানি, এটা একটা সাময়িক ব্যাপার। তাহলেও এটা একটা বাস্তব ঘটনা। ইতিহাস চর্চার যাবতীয় আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে এখন ভারতে ইসলামের সমালোচনা করা হবে। এই প্রচেষ্টায় শক্তিশালী অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করছেন সীতারাম গোয়েল। ইসলাম সম্পর্কে ইসলামপন্থী, ভারতীয় 'ধর্মেতরবাদী' এবং ইউরোপীয় বহুসংস্কৃতিবাদীদের পবিত্র দাবীর কুৎসিত মুখোস উন্মোচনের পর বুদ্ধিজীবিদের পরবর্তী কর্ম হচ্ছে মুসলিম জনগণকে মানবতাবাদী সংস্কৃতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, ইসলামের মানসিক ও সামাজিক শিকল থেকে তাদের মুক্ত করা। মুসলিম জনগণকে শিক্ষিত করতে হবে আমাদের। বোঝাতে হবে তাদের, হাতে দুটি বিকল্প আছে: পশ্চাৎগামী ও ধর্মান্ধ

একটি ধর্মের মধ্যে তাঁরা থাকবেন, বা, থাকবেন না। ইসলাম সম্পর্কে জনসাধারণকে জ্ঞান দেবার ভারটা আমরা রক্ষণশীল মোল্লা বা অপলাপবাদী ঐতিহাসিকদের উপর ছেড়ে দেবনা।

ইসলাম মানুষের জন্মগত গুণ নয় যে তা অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নিয়ে মানুষকে তার মধ্যেই বাস করতে শিখতে হবে। মুসলমানরা মানুষ ছাড়া কিছুই নয়। তারা সেই সব মানুষের উত্তরপুরুষ যারা চাপে পড়ে, প্রলোভনে পড়ে বা প্রতারণার ফলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা আজ মুক্ত চিন্তা বা মানবতাবাদী সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হবেন না, এমন কথা বিশ্বাস করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু ইসলামের সোজাসুজি সমালোচনা বহু সাধারণ মুসলিম ও মুসলমান যাজককে ক্ষিপ্ত করতে পারে। সেজন্য ইসলামের মুষ্ঠি শিথিল করার জন্য আমাদের শান্তভাবে এবং কাউকে আঘাত না দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এর জন্য আমাদের নিজেদের সৎ হতে হবে, ইসলামকে রং চড়িয়ে প্রশংসা বন্ধ করতে হবে। যারাই অপলাপবাদীদের সংস্পর্শে আসবেন, তাদের কর্তব্য এই বৌদ্ধিক অপরাধের মুখোস উন্মোচিত করা। কারও ধর্মের ভয়াবহ ইতিহাসের জন্য কোনও মানুষকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। আমরা সব কিছুই ক্ষমা করতে রাজী। কিন্তু দোষীদের ক্ষমা করা তখনই যায় যখন সে দোষ স্বীকার করে। সুতরাং ইসলাম ভারতে এবং অন্যত্র মানবিকতার বিরুদ্ধে যা করেছে তা গোপন করার মধ্যে কোনও সদগুণ নেই। সামাজিক সম্প্রীতির জন্য সত্যের মুখোমুখি হওয়া ভাল। স্বাভাবিক ভাবেই শেষপর্যন্ত মুসলমানদেরই বিবেচনা করতে হবে তাদের ধর্মের ত্রুটির কথা। ধর্মের সংস্কার করতে হবে এমন ভাবে যাতে তারা অন্য ধর্মের মানুষদের সঙ্গে সদ্ভাবের সঙ্গে বাস করতে পারে। বাইরের জগতের ইসলাম সমালোচনা কখনও মুসলিম জগতের অভ্যন্তরীণ সমালোচনার স্থান নিতে পারেনা। কিন্তু যতক্ষণ মুসলিমরা হিংস্র মৌলবাদ বা স্বৈরাচারী পুরোহিত-তন্ত্রের দ্বারা অবরুদ্ধ থাকবে এবং স্বাধীন ভাবে কথা বলতে পারবে না, ততক্ষণ বাইরের পৃথিবীর লোকদের তাদের হয়ে কথা বলতে হবে। কীভাবে খ্রীষ্টীয় পুরোহিত তন্ত্র এবং কমিউনিস্ট একচ্ছত্রবাদের শেষপর্যন্ত ভাঙ্গন ঘটেছিল তার ইতিহাস এ বিষয়ে পথ দেখায়। দুটি ক্ষেত্রেই বাইরের পৃথিবীর সমালোচনা ভাঙ্গনের অনুঘটকের কাজ করেছিল। যুক্তি ও মানবতাবাদের বাণী ধর্মের মোটা দেওয়াল ও সবচেয়ে শক্ত লোহার পর্দাকেও ভেদ করতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুদের অবস্থান তুলনাহীন। তারা তেরোশো বছর ধরে ইসলামী সাম্রাজ্যবাদের শিকার। তাদের মাতৃভূমি, সংস্কৃতি ও সমাজের কী ক্ষতিকরেছে ইসলাম, তা তারা হাড়ে হাড়েবোঝে। তাদের এখন মুসলমানদের আচার আচরণ সম্বন্ধে অভিযোগ বন্ধ করতে হবে। সবকিছুর সূত্র যে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ, তা বুঝতে হবে। এটা বুঝলেই তারা এক উদ্যম পাবে যা এত বছর ধরে ইসলামের সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা পায়নি। একবার যখন তারা ইসলামের সঠিক চরিত্র অনুধাবন করবে তখন তারা মুসলমান দেশবাসীদের শিক্ষিত করতে সক্ষম হবে, যাদের বেশীভাগই নিজের ধর্ম সম্পর্কে খুব অল্পই জানে। এটা শুদ্ধি আন্দোলনের মত কিছু নয়, এটা কেবল মুসলমানদের একটা আবদ্ধ জগত থেকে মুক্ত করা।

চতুর্থ অধ্যায়

কিছু প্রশ্ন ও সমালোচনার উত্তর

ঘটনার অন্য দিক

সমালোচনা : বারাণসীতে যেসব হিন্দুদের সঙ্গে আপনি বাস করতেন, তাদের দ্বারা আপনি প্রভাবিত হয়ে গেছেন। ঘটনার অন্য দিকটা আপনি দেখেননি।

উত্তর: ঘটনার অন্য দিকটা আমার অজানা নয়; সেটা আমার প্রবন্ধের মধ্যে দীর্ঘ আলোচিত। জনগণই ইসলামের বর্ণময় চিত্র দ্বারা মোহিত হয়েছে, তারা দেখেছে ঘটনার একটি দিকই। তাঁদের যখন ঘটনার অন্য দিকটা দেখানো হলো তখন দেখা যাচ্ছে এই দিকটা জানতে রাজী নয় তারা। সর্বোপরি ইসলামের দ্বারা মোহিত অসংখ্য ক্রমবর্ধমান আক্রমণশীল মানুষের সম্মুখীন হওয়া ভয়প্রদ ব্যাপার। ইসলামী ধর্মোন্মাদনার ভয় থেকে মুক্ত পৃথিবীতে কে না বাস করতে চায়? কিন্তু আমাদের আত্মপ্রতারণা করলে চলবে না যে আমরা ইতিমধ্যেই এই ধরনের বিশ্বে বাস করেছি।

আমি কি কারুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঘটনার এই দিকটা দেখছি? ঘটনা হচ্ছে আমি বারাণসীতে প্রথম দিকটা কাটিয়েছি 'হিন্দু মৌলবাদীদের' দৃষ্টিকোণ না জেনেই। আমি বিদেশী, হিন্দু দৃষ্টিকোণ আমার ভাল লাগবেনা, এই বিবেচনায় অনেকেই আমাকে কিছু জানায়নি--কিন্তু পরে আমি তাঁদের কাছ থেকে অনেক তথ্য পেয়েছি। তারপর আমি যখন নিজেই হিন্দু দৃষ্টিকোণ জানলাম তখন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পথপ্রদর্শক তার হাতের সব তথ্য আমার কাছে মেলে ধরলেন। তথাকথিত 'ধর্মেতরবাদী' দৃষ্টিকোণ এতই প্রবল যে হিন্দুদের বক্তব্যের সঙ্গে বিদেশীদের জড়াতে চায়না মানুষ।

একজন অন্যজনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু লিখেছে, এটা এক ধরনের ভ্রান্ত সমালোচনা। যথার্থ সমালোচনা করা সম্ভব না হলেই এই ধরনের কথা উচ্চারণ করা হয়। মানুষের সঙ্গে নকশাল বা আর.এস.এস তকমা লাগিয়ে তার বক্তব্যকে নস্যাৎ করা একটা খারাপ অভ্যাস, যেন ঐ তকমা লাগালেই তার বক্তব্যের সত্যতা নষ্ট হয়ে যায়। এটা একটা মানসিক স্থিতিজাড্যের লক্ষণ। তত্ত্বসমূহের বিচার করতে হবে তার গুণাগুণের ভিত্তিতে--জাত বিচার করে নয়।

আমার বক্তব্য নিয়ে আলোচনা না করে শুধুমাত্র গালিগালাজ দিয়ে আমার সিদ্ধান্ত বাতিল করার চেষ্টা করা হয়েছে সর্বপল্লী গোপালের অযোধ্যা সংক্রান্ত Anatomy of Confrontation পুস্তকের মুখবন্ধে। তাঁর গোটা পুস্তকটির মধ্যে আমার রাম জন্মভূমি বনাম বাবরী মসজিদ পুস্তকের যুক্তিযুক্ত বক্তব্যের কোনও উত্তর নেই। তার পরিবর্তে তিনি আমাকে বললেন, ''ক্যাথলিক তর্কযুদ্ধ ব্যবসায়ী,'' যে ''সর্বত্র ধর্মযুদ্ধ করে, এখন করছে ভারতে।'' ভাবলেন, আমাকে গালিগালাজ করেই মামলা জিতে গেছেন। কমিউনিস্টদের কাছে খিস্তি অত্যন্ত সস্তা। সুতরাং মহামান্য খিস্তিবাজকে আমি তাঁর বস্তাপচা খেলা খেলতে দিলাম। আমার যুক্তিযুক্ত বক্তব্য অস্বীকার করার জন্য তাঁর সাফাই যথেষ্ট লক্ষ্যনীয়--''একজন লেখক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে খবরের কাগজের প্রতিবেদন থেকে এবং যে ভারতের মুসলিম শাসনের দিনগুলিকে ''রক্তস্নাত প্রলয়'' বলে, তার কথা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা অসম্ভব।''

কিন্তু একজন বিজ্ঞান মনস্কের কাছে ঘটনা কোথায় প্রকাশিত হয়েছে, বা লেখকের নাম, বা প্রকাশের অন্য কোনও সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনার বিষয় নয়, বিবেচনার বিষয় বক্তব্যের সত্যতা। কেবলমাত্র পার্টিবাজ ঐতিহাসিকরা ঘটনার সত্যতার চেয়ে পার্টির বক্তব্যকে বেশী গুরুত্ব দেয়। তারা মনে করে সত্য মিথ্যা বলার হকদার একমাত্র তারাই। সুতরাং আমার পুস্তকে যদি

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার চিঠিপত্র কলমে প্রকাশিত বিভিন্ন মতামতকে ছাপি, তাতে যুক্তিযুক্ত বক্তব্যের মূল্য কমে যায়না। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী দামী অধ্যাপক রামশরণ শর্মা বা আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ারদের লেখা সুদৃশ্য মলাটের পুস্তকে অধ্যাপক এ. আর খান, অধ্যাপক হর্ষনারায়ণ বা এ.কে চ্যাটার্জীদের দাখিল করা নানা দলিল, সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং বক্তব্য অগ্রাহ্য করা হয়েছে বলে আমি কলম বন্ধ করে বসে থাকবো না। অধ্যাপক গোপালের মত চকচকে কাগজে মিথ্যা কথা ছাপার চেয়ে সস্তা কাগজে সত্য কথা ছাপা শ্রেয়।

যে বলে ভারতের মুসলিম অধিকারের যুগ রক্তস্নাত প্রলয় তার কথা কী সত্যই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার যোগ্য নয়? এটা নির্ভর করছে ভারতের মুসলিম যুগ সত্য সত্যই 'রক্তস্নাত প্রলয়' কিনা তার উপর। ইউরোপীয় অপলাপবাদীরা হিটলারের রাজত্বকে প্রশংসা করে এবং সেই ভয়াল দিনগুলিকে অস্বীকার করে। ভারতীয় অপলাপবাদীরা ইসলামী রাজত্বের প্রশংসা করে এবং সেই দিনগুলিতে ভারতের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে যে ধ্বংসের বন্যা নেমে এসেছিল তাকে অস্বীকার করে। কিন্তু কি ইউরোপের ক্ষেত্রে কি ভারতের ক্ষেত্রে ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্য কথা বলে। নিঃসন্দেহে সেই জন্যই অপলাপবাদীরা ইসলামকৃতধ্বংসের বন্যার যথার্থ ঐতিহাসিক সাক্ষ্যকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে রাজী নন।

ভারতীয় ইসলামের সমস্যা নিয়ে আমার প্রথম বই অপলাপবাদী মহলে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল সেই নিয়ে আলোচনায় যখন আমরা ব্যস্ত তখন ঐ পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হলো দি টেলিগ্রাফ পত্রিকায়। সমালোচিকা মানিনি চ্যাটার্জী মনে করেছেন আমার 'খুব খারাপ বই' মার খেয়ে গেছে 'হতে পারে,' 'সম্ভবতঃ' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু পার্টি লাইনের ইতিহাসে এই ধরনের শব্দ অবশ্যই ত্রুটি। পার্টি যখন ঠিক করে দিল ইতিহাসে কী বলা হবে, তখন ঐতিহাসিককে আর কোনও বিতর্কিত সাক্ষ্যের সম্মুখীন হতে হবেনা। তখন কোনও 'সম্ভবনা' থাকবেনা, কোনও 'সুনিশ্চিত করে বলা যাচ্ছেনা' থাকবে না—যে কোনও যথার্থ ইতিহাস গবেষণায় যেটা থাকে। অযোধ্যা বিতর্কে অংশগ্রহণকারী মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকরা নিজেদের বক্তব্যে এতই সুনিশ্চিত যে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই, তাঁদের নিজেদের গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত থেকে নড়িয়ে দেবার ক্ষমতা কোনও রকম অসুবিধাজনক সাক্ষ্যেরই নেই। ঘটনাক্রমে শ্রীমতী চ্যাটার্জী আমার লেখার বিষয়বস্তু ও ভঙ্গী Hindu Temples, What Happened to Them পুস্তকের লেখকের ভঙ্গী ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত দেখলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে শ্রীমতী চ্যাটার্জীই প্রথম নন, এর আগেই অনেকে মনে করেছেন আমার অস্তিত্ব নেই এবং কোনরাড এলস্ট কোনও 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকেরই' ছদ্মনাম। শ্রীমতী চ্যাটার্জীর এখন জানা উচিত একজন অহিন্দুর পক্ষে হিন্দু বিদ্বান হর্ষনারায়ণ, রাম স্বরূপ, সীতারাম গোয়েল, জয় দুবাসী এবং অরুণ শৌরী যে সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন, সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবই সম্ভব। ভারত থেকে বাইরের জগতে রপ্তানী হওয়া তথ্যাবলী যদি অপলাপবাদীদের হাত হয়ে পশ্চিমে না পৌঁছতো, তবে আরও বহু পশ্চিমী বিদ্বানেরা একই মত পোষণ করতেন।

ইসলাম বনাম মুসলিম

"কিন্তু আমি কয়েকজন মুসলমানকে জানি, যারা মোটেই ধর্মোন্মাদ নয়।" "আমি তুরস্কে ছিলাম, ওখানকার মানুষেরা খুব বন্ধুভাবাপন্ন এবং অতিথিপরায়ণ। তাদের সঙ্গে ধর্মীয় উন্মাদনার কোনও সম্বন্ধ নেই। আপনি মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে মুষ্টিমেয় ধর্মোন্মাদদের গুলিয়ে ফেলছেন।" "ইন্দোনেশিয়াতে ইসলাম অন্য রকম। আপনি পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধংদেহি মানসিকতার সঙ্গে ইসলামের মূলতত্ত্বের সম্পর্ক গুলিয়ে ফেলছেন।"

উত্তর: আমিও কয়েকজন মুসলমানকে জানি, যাঁরা মোটেই ধর্মোন্মাদ নয়। এবং পাকিস্তান থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মুসলিম দেশে অনেকদিন থেকেছি। কিন্তু তা থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিতে

পারিনি যে ইসলাম একটি উপকারী এবং সহনশীল ধর্ম। আপাতদৃষ্টিতে ভদ্রলোক, যাঁরা সামাজিক মানুষ হিসাবে খুবই সুরুচির এবং পারতপক্ষে কারুর বিরুদ্ধাচারণ করেন না এরকম মুসলমান দেখার জন্য মুসলিম দেশে যেতে হয়না। কিন্তু এঁরাই হঠাৎ ধর্মোন্মাদ হয়ে যান ইসলাম সামান্য অসুবিধায় পড়লেই। যাঁরা রাস্তায় রুশদীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান, রুশদীর মৃত্যু দাবী করেন এবং সাক্ষাৎকারে বলেন, "ওর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, আমরা শয়তানটাকে খুন করবো," তাদের সঙ্গে কফি বসে হাউসে কথা বলে দেখবেন, মনে হবে খুউব ভাল লোক। রুশদীর জাপানী অনুবাদককে যখন ১৯৯১ অব্দে খুন করা হয় তখন জাপানের মুসলিম সম্প্রদায়ের মুখপাত্র বলেন, "মুসলমান বা অমুসলমান, যেই খুন করে থাকুক না কেন, এটা আল্লাহ্ দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি।" কিন্তু, জাপানী মুসলমানরা অন্য জাপানীদের চেয়ে কম সভ্য, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না।

এটা সত্য যে মুসলিম দেশের বহু মানুষের মধ্যে বহু সৎগুণ আছে। আধুনিক ভোগবাদের দ্বারা নষ্ট হয়নি এমন দেশের মানুষের পক্ষে অতিথিপরায়ণ এবং বন্ধুবৎসল হওয়াটা স্বাভাবিক--এর জন্য ইসলামের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক নয়। তুর্করা যেমন কয়েক শতাব্দী আগে যাযাবর ছিল, সেরকম যাযাবর জাতিদের পক্ষে অতিথিপরায়ণতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই পরম্পরা ইসলামায়নের পরেও থেকে গেছে। বস্তুতঃপক্ষে মুহাম্মদের নিজস্ব পরিমন্ডলে যাযাবরী পরম্পরা প্রভূত পরিমাণে উপস্থিত ছিল, অতিথিপরায়ণতাকে ইসলামে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হয়। তবে এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে নয়, মুহাম্মদ এছাড়া অন্য কিছু জানতেন না বলে। বন্ধু-বৎসলতা ও অতিথিপরায়ণতা ইসলামের কাছে ঋণী নয়, বরং বেশীভাগ প্রাচীন সংস্কৃতির লালিত মূল্যবোধের নিকট ঋণী।

এটা প্রমাণ করে এক চিরন্তন সত্য: মুসলমান হওয়ার পরেও মানুষ মানুষই থাকে। মানুষ তার ধর্মীয় মতবাদে দীক্ষিত হওয়ার পরেও কতকগুলি মূল্যবোধকে লালিত করতে থাকে। সর্বোপরি ইসলামী মতবাদ নিজেই কতকগুলি ইসলাম-পূর্ব মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে, যেগুলি সে নতুন প্রজন্মের কাছে এখনও বিতরণ করে যাচ্ছে। এটা অন্য ধর্মের থেকে তুলনামূলকভাবে ভাল হওয়ার ব্যাপার নয়, কিন্তু এটা বড় শহরে নতুন প্রজন্মের মানুষদের বিকৃতমতি হওয়ার চেয়ে ভাল। বিশেষ করে আমেরিকার শহরগুলিতে কালো মানুষদের ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকার প্রশংসা করছে সে দেশের নীতি প্রণয়নকারীরা। আধুনিক পৃথিবীতে পৈত্রিক ধর্মের বিকল্প অন্য একটি ধর্ম নয়, বরং চরম নাস্তিকতা ও নৈতিক নৈরাজ্যবাদ। যে কোনও ধর্মই আত্মা হারানো মানুষকে নতুন দিশা দেখাতে পারে, যদি সেই ধর্মের বন্ধ্যা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী তত্ত্বের উপর জোর না দিয়ে মৌলিক নৈতিকতাবোধের উপর জোর দেওয়া হয়।

নঞার্থক দিক দিয়েও ইসলাম মনুষ্য প্রকৃতির কোনও অজানা ব্যাপার নয়। স্বয়ংসত্যবোধ, সংকীর্ণমনস্কতা, লুটের মালের প্রতি লোভ, অন্যের শৈল্পিক ও ধর্মীয় বোধের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রভৃতি ইসলামের দোষগুলি যে কোনও মানুষের মধ্যেই দেখা যেতে পারে। ব্যাপারটা হচ্ছে, মানুষের এই ধরনের নঞার্থক প্রবণতাগুলিকে ইসলাম নিয়মতান্ত্রিকভাবে সমর্থন দেয়--যখন ক্রিয়াটা অমুসলমানদের ক্ষেত্রে ঘটানো হয়। ইহুদী পুরাণ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করলেও ইসলাম এই ধরনের অন্যায় কাজগুলিকে মান্যতা দান করেছে। এটি ইসলাম-পূর্ব আরবী সমাজ থেকে গৃহিত নয়। অধিবিদ্যাগত ও আচার-আচরণগত পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নৈতিক ভালমন্দ ব্যাপারে কিছু সাদৃশ্য থাকে। রিপুদমন, মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার, সত্যবাদিতা ইত্যাদিকে সব ধর্মেই মূল্য দেওয়া হয়। ইসলাম এই ধরনের কিছু মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে। সাধারণ মুসলমানরা তাঁদের ধর্মকে সমর্থনের জন্য এই ধরনের কিছু ব্যাপারের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করবেন। কিন্তু ইসলাম বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত এই ধরনের মূল্যবোধের বিপরীত কিছু কর্মকেও ধর্মীয় কর্তব্য বলে নির্দেশ

দিয়েছে।

ইসলামী তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, মুসলমানদের সম্পর্কে আমাদের মনোভাব অনুরূপ নয়। আমার অনুমান, কোনও মুসলমানকে যদি আপনি বলেন, আপনাদের সম্পর্কে আমার কোনও অভিযোগ নেই, আমি শুধু আপনাদের ধর্ম সম্পর্কে অভিযোগ করছি, তাহলে সে খুশী হবেনা। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এই ধরনের উচ্চারণ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু এটাই সঠিক উচ্চারণ। একজন মানুষ যে মুসলমান হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে, এতে তার কিছু করার নেই। শিশু বয়সে তার মনে ইসলামী প্রতীক, নাম, প্রার্থনা ইত্যাদি প্রবিষ্ট করা হয়েছে, এতেও তার কিছু করার নেই। তাদের ধর্মীয় পুস্তক ও ধর্মপ্রবর্তক সম্বন্ধে তার অনুরাগ জন্মেছে, এতেও তার কোনও হাত নেই। এতৎসত্ত্বেও অনেক মুসলমান বহু মানবিক ধ্যানধারণা পোষণ করেন এবং তাদের ধর্মীয় তত্ত্বাবলী থেকে শুধুমাত্র কতকগুলি সর্বজনীন ধ্যানধারণা ও কিছু সর্বজনীন জীবনবোধ আহরণ করেন, সন্তর্পণে সরিয়ে রেখে দেন স্ব-ধর্মের মানবতার পক্ষে ক্ষতিকর উপাদান সমূহ। তাঁদের কার্যকরী ধর্ম ঠিক ইসলাম নয়, বরং কতকগুলি মানবিক উপাদান যা, মুহাম্মদের অনুসরণকারীরা বিশ্বজনীন ধর্মবোধ থেকে আহরণ করেছিলেন।

কিন্তু তুরস্কের সাধারণ মুসলমানদের মানবিকতাবোধ যাই হোক না কেন, সেই সব মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশ খ্রীষ্টান সংখ্যালঘুদের সন্ত্রস্ত করতো। এমনকি যখন মুস্তাফা কামাল সেখানে ধর্মেতরবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন এবং কতকগুলি পুরাতন গীর্জাকে নতুন জীবন দান করলেন তখনও সাধারণ মুসলমানরা খ্রীষ্টানদের নিগৃহিত করতে থাকলো।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে তুরস্কের জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল খ্রীষ্টান। শোনা যায়, খোদ ইস্তানবুল শহরে তারা ছিল সংখ্যাগুরু। ১৯১৫-১৮ অব্দে আর্মেনীয়দের গণহত্যা করা হয়। ১৯২২ অব্দে তুরস্কের গ্রীক অধ্যুসিত পশ্চিম উপকূল অঞ্চলকে যখন স্বাধীন করতে যায় গ্রীস, তখন হয় হত্যা করা হয় বা তাড়িয়ে দেওয়া হয় ঐ অঞ্চলের সমস্ত গ্রীকদের। তখন থেকে অনবরত তাড়না চলছে শুধু যে আর্মেনীয় বা গ্রীক অর্থোডক্সদের তাই নয়, একইভাবে তাড়না করা হচ্ছে কলডীয় ও অ্যাসেরীয় খ্রীষ্টানদেরও। এখন তুরস্কে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা শতকরা এক ভাগেরও কম। হাজার হাজার খ্রীষ্টান বিদেশে পালিয়ে গেছে। যারা আছে তারা ইস্তানবুল শহরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে বাস করে। তারা কেমন আছে, একথা জিগেস করলে উত্তর দিতে ভয় ও লজ্জা পায় তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্য কথা বেরিয়ে আসে তাদের কাছ থেকে, "আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।"

খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে ইসলামী সন্ত্রাসের আর একটা দিক হলো, এটি রাষ্ট্রের ধর্মেতরায়নের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়নি। খলিফার রাজত্বে ইসলাম নিরাপদে ক্ষমতায় ছিল এবং সেই অবস্থানে থেকে তা কিছু ঔদার্য দেখাতে পারতো। জিম্মি হিসাবে খ্রীষ্টানদের নিরাপত্তা দিতে পারতো (অবশ্যই খলিফা ঘোষিত জেহাদের সময় ব্যতিরেকে)। কিন্তু এই ঔদার্য ও নিরাপত্তার ব্যাপারটা বলকান প্রদেশের ক্ষেত্রে ততোটা কার্যকরী ছিলনা। সেখানে খ্রীষ্টানরা অবিরত ভীতির মধ্যে থাকতো। তারা ছিল অবিরাম সন্ত্রাসের শিকার--কখনও তাদের মেয়েদের তুলে নিয়ে যেত মুসলমানরা। কখনও ধরে নিয়ে যেত ছেলেদের। আগে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষেরা দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে বাস করতো। তারপর নানারকম যানবাহন আবিস্কারের ফলে দুর্গম স্থান বলতে যখন আর কিছু রইলো না, তখন মুসলিমদের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর অত্যাচারের জোয়ার নেমে এলো। ধর্মেতরবাদী সরকারের প্রদত্ত যাবতীয় রক্ষাকবচ ব্যর্থ করে দিল মুসলিম জনগণেরা।

এসবের জন্য রাষ্ট্রশক্তি ও পোষাকধারী শান্তিরক্ষকদের সহজেই দোষ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু

ইসলামী সন্ত্রাসের উৎস রাষ্ট্র বা পোষাক থেকে নয়, মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে। সেজন্য অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মত মানবাধিকার রক্ষা সংস্থার নথিতে এ ধরনের ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকেনা। এক পাকিস্তানী বন্ধু অনুযোগ করলেন যে তাঁর মাতৃভূমিতে অ্যামনেস্টি কোনও ইসলামী সন্ত্রাসের মামলা নথিবদ্ধ করেনা, যদিও এই ব্যাপারে পাকিস্তানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ব্যাপারটা হচ্ছে এই ধরনের সন্ত্রাসের ঘটনা রাষ্ট্র দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হয়না--সে কারণে ঘটনাগুলি অ্যামনেস্টির নজর এড়িয়ে যায়। ঘটনাগুলি ঘটে ইসলামী তত্ত্বপুষ্ট মুসলিম জনগণের একাংশের স্বতঃস্ফুর্ত মনোভাব দ্বারা।

ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম জনমানসের মধ্যে ততোটা ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারেনি সত্য, তবে তা কট্টরদের আগমার্কা ইসলামী ব্যবহার দেখাতে বাধাও দেয়নি। পশ্চিম নিউগিনির পাপুয়া আদিবাসীরা জাভা থেকে আগত অভিবাসী মুসলমানদের দ্বারা বলপূর্বক ইসলামায়িত হচ্ছে। একদা পর্তুগীজ উপনিবেশ পরে ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক বলপূর্বক অধিকৃত পূর্ব তিমোরে মুসলিম অভিবাসী ও সৈনিকদের দ্বারা খ্রীষ্টান ও আদিম সর্বাস্তিবাদীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে চলেছে (বর্তমানে পূর্ব তিমোর স্বাধীন হয়ে গেছে-সঃ)। এতৎসত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়ার অমুসলিমদের অবস্থা বাংলাদেশের থেকে ভাল এবং সেখানে অমুসলমানরা মুসলমানদের সঙ্গে মোটামুটি শান্তিতে পাশাপাশি বাস করছে।

ইসলামী তত্ত্বের প্রভাব সব দেশের মুসলমানদের উপর সমভাবে পড়েনি। বহু মুসলমান অমুসলমানদের উপর কোরান অনুযায়ী জুলুম করেনা। কিছু মুসলমান অত্যাচার করার জন্য কোরানের দ্বারস্থ নয়। তার অর্থ এই নয় যে জুলুমের জন্য ইসলাম কোনও মতেই দায়ী নয়। কিছু লোক মদ খেয়েও নিরাপদে গাড়ী চালাতে পারে। আবার লোক মদ না খেয়েও বিপজ্জনক ভাবে গাড়ী চালায়। এর অর্থ এই নয় যে মত্ত হয়ে গাড়ী চালানোর সঙ্গে পথ দুর্ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা সম্পর্কে কোরানের নির্দেশ

"কিন্তু কোরান অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয় (২/২৫৬, ১০/৯৯, ১০৯/৬) এবং অন্য ধর্মকে স্বীকৃতি দেয় (১৩/৭, ১৬/৩৬)।"

উত্তর: এটা সত্য নয় যে কোরান অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। কোরান বলে, সমস্ত মানুষকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে হবে। বলে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ। এবং বলে মুহাম্মদই শেষ পয়গম্বর। কোরান শিক্ষা দেয় মুসলমানরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে ঘৃণা এবং শত্রুতার মধ্যে বাস করবে, যতদিন না এইসব অবিশ্বাসীরা নিঃশেষ হয়--ধর্মান্তকরণ বা হত্যার দ্বারা। কোরানের প্রত্যাদেশগুলি নিষ্ঠভাবে পাঠ করলে জানা যায় যেসব বাক্যগুলির দ্বারা ইসলামী সহিষ্ণুতা দাবী করা হয় সেগুলি আসলে বহন করে অন্য ধর্মের প্রতি চরম অসহিষ্ণুতার বাণী ।

'তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার কাছে (প্রিয়)'(কোরান--১০৯/৬), যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ করলে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানা যায় বাক্যটির অর্থ আমি তোমাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ কামনা করি, কারণ আমাদের মধ্যে কোনও বোঝাপড়া সম্ভব নয়। এই বাক্য পৌত্তলিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ার যাবতীয় ব্যর্থতাই ঘোষণা করছে। অধ্যাপক হর্ষনারায়ণ তাঁর Myth of Composite Culture and Equality of Religion পুস্তকে বহু ইসলামী তত্ত্ববিদের বাক্য উৎকলিত করে দেখিয়েছেন, এই বাক্যটি ইসলাম ও পৌত্তলিকতাবাদের মধ্যকার মৌলিক অসামঞ্জস্য সূচিত করে। ইসলামী তত্ত্ববাদীরা এই বাক্যটিই উৎকলিত করেছিলেন আকবরের সর্বধর্মসমন্বয়ের ও সর্বধর্মের সঙ্গে সহাবস্থানের নীতিকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার জন্য। এর থেকে একটা সাধারণ ধারণা করা যেতে পারে : যেসব বাক্যকে ইসলামের সহিষ্ণুতা প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহার করা হয়, হুবহু সেই বাক্যগুলিই ইসলামী তত্ত্ববিদরা ব্যবহার করেন ইসলামী অসহিষ্ণুতা প্রদর্শনের জন্য।

"ধর্মের জন্য কোনও জবরদস্তি নেই", কোরানের ২/২৫৬ প্রত্যাদেশ বাক্যের এই খন্ডাংশটি অনেকে ব্যবহার করেন ইসলামী সহিষ্ণুতার উদাহরণ-বাক্য হিসাবে। আসলে এই বাক্যটি ইসলামী নিয়তিবাদের বাক্য: কে মুসলমান হয়ে পূণ্য অর্জন করবে আর কে বিধর্মী থেকে নরকস্থ হবে তা আল্লাহ্র দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তুমি ইসলামায়িত হয়ে স্বর্গবাস করবে, নতুবা তুমি কাফের থেকে নরকবাস করবে। নরকের বীভৎস বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান যে আল্লাহ্ এব নিষ্ঠুর অস্তিত্ব। ঠিকভাবে বিচার করলে বোঝা যায় এই বাক্য জোর জবরদস্তি করে ইসলামায়নের প্রত্যাদেশ। তোমাকে যদি তরবারী দেখিয়ে ইসলামায়িত করা হয়, তবে আল্লাহ্ তা ইচ্ছা করেছেন বলে ধরে নিতে হবে। কারণ, তাতে তুমি নরক যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাবে। এ সমস্তই আল্লাহ্র বিধান। তোমার ভাল করার জন্য আল্লাহ্ জবরদস্তির আশ্রয় নিয়েছেন।ধর্মে কোনও জবরদস্তি নেই কথাটির অর্থ এই নয় যে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম সমান। কারণ, ঐ আয়াতের পরের আয়াতে বলা হয়েছে, *"আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যান। আর যারা সত্য প্রত্যাখান করে বিভ্রান্তকারীরা তাদের অভিভাবক। এরা তাদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাবে।"* অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলিম নেতা শাহ্ ওয়ালিউল্লা এই প্রত্যাদেশটিকে বলপূর্বক ইসলামায়নের নির্দেশবাক্য বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

কোরানের ১০/৯৯ থেকে পরবর্তী প্রত্যাদেশগুলি হলো: *তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই বিশ্বাস করতো। তবে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে? ১০০/ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত বিশ্বাস করা কারও সাধ্য নেই এবং যারা অনুধাবন করেনা আল্লাহ্ তাদের কলুষলিপ্ত করেন। ১০১/ বল, 'আকাশমন্ডলীও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য কর।' নিদর্শনাবলী ও ভীতিপ্রদর্শন অবিশ্বাসী মানুষদের উপকারে আসেনা। ১০২/ ওরা ওদের পূর্বে যা ঘটেছে তার অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে। বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।' ১০৩/ পরিশেষে আমি তোমাদের রসুলদের উদ্ধার করি এবং এভাবে বিশ্বাসীদের উদ্ধার করি। আমার দায়িত্ব বিশ্বাসীদের উদ্ধার করা। ১০৪/ বল, 'হে মানুষ! তোমরা যদি আমার ধর্মের প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে (জেনে রাখ), তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যার উপাসনা কর আমি তার উপাসনা করিনা, পরন্তু আমি উপাসনা করি আল্লাহ্র যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং আমি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।*

ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় অবতীর্ণ এই বাক্যগুলিতে ইসলামী নিয়তিবাদের এক রূপ দেখা যাচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে মুহাম্মদ যখন দেখছেন অল্প লোককেই তাঁর মতে আনতে পারছেন তখন এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছেন যে ধর্মান্তর করার ব্যাপারটা আল্লাহ্ নিজেই দেখবেন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ধর্মান্তরিত করবেন। পরে ইহুদী পয়গম্বর জোনার কথা বলা হয়েছে। জোনা নিজে একসময় নিজের কর্ম সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছিলেন। তখন তিনি এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিয়েছিলেন যে, তিনি ঈশ্বর যিহোভার দ্বারাই কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সুতরাং সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করছে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরই। এরপর ১০৪ নং বাক্যতে ইসলামী নিয়তিবাদ সংযুক্ত হয়েছে বিধর্মীদের নরকস্থ করার সঙ্গে। এখানে মনে রাখতে হবে মক্কায় প্রথম যুগে মুহাম্মদের জোর করে ধর্মান্তরিত করার সামর্থ ছিলনা। জোর করে ধর্মান্তরকরণ আরম্ভ হয় মদিনা পর্যায় থেকে। সুতরাং এইসব বাক্যাবলী কখনও ইসলামী সহিষ্ণুতার পরিচয় নয়।

আল্লাহ্র উপাসনা করার ও অসৎ (বিশৃঙ্খলা) বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল পাঠিয়েছি। অতঃপর ওদের কিছুকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওদের কতকের সংগতভাবেই পথভ্রান্তি হয়েছিল (১৬/৩৬)।

এই প্রত্যাদেশবাক্য কখনই বলেনি যে যাজ্ঞবল্ক, জরথুস্ত্র, নুমা পম্পিলিয়াস, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর, লাওৎসে, মনি, শংকরাচার্য, নানক, দয়ানন্দ সরস্বতী এবং সমস্ত ধর্মসংস্কারকরা যথার্থ আল্লাহ্‌র দূত। বাক্যের দ্বিতীয় অংশ সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করছে এই বাক্যের বক্তব্য সে রকম কিছু নয়। এই দৈববাণী সমস্ত মানুষকে বলছে, *"আল্লাহ্‌র সেবা কর এবং তাগুৎ (পৌত্তলিকদের এক দেবতা) কে অস্বীকার কর।"* ইব্রাহিমের বংশধর ছাড়া অন্য কোনও ধর্মীয় নেতা এ ধরনের কথা বলেননি। এই বাক্য কখনও বলেনি, ধর্মীয় চরিত্র মাত্রই আল্লাহ্‌র দূত। এমনকি ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মীয় চরিত্রও নয়। কারণ, আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসই সব কথা নয়। মুহাম্মদের পয়গম্বরত্বও স্বীকার করা চাই।

বাক্যের দ্বিতীয় অংশে আবার সেই ইসলামী নিয়তিবাদের কথা বলা হয়েছে। কিছু জাতির ধর্ম মিথ্যা। কারণ, তাও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। তিনিই কিছু জাতির ধর্মকে মিথ্যা তৈরী করেছেন, যাতে তারা পরিত্রাণ না পায়, নরকস্থ হয়।

এছাড়া অমুসলমান সম্প্রদায়সমূহ কখনও দাবী করতে পারবে না যে তারা কখনই আল্লাহ্‌র নাম শোনেনি। তাদের ঐতিহাসিক ধর্মীয় চরিত্র সমূহ একদিকে যেমন মিথ্যা পয়গম্বর, এই বাক্যটি বলছে তাদের প্রতি সত্য পয়গম্বর পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের প্রত্যাখান করেছে। আরবের পৌত্তলিকদের প্রতি যেমন ইব্রাহিমকে পয়গম্বর করে পাঠানো হয়েছিল, তেমনই পয়গম্বর পাঠানো হয়েছিল সবার জন্যই। এখনও যদি তারা পুতুল পূজা করে, তবে তার জন্য তারাই দায়ী। এই বাক্যের বক্তব্য সেই কাল্পনিক গল্পের বক্তব্যের মত--আরবরা ইসমাইলের মাধ্যমে ইব্রাহিমের বংশধর এবং তাদের কাবা বহুদিন আগে এক একেশ্বরবাদী উপাসক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিল। এই বাক্যের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যঃ পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী প্রেরণ করা হয়েছিল কিন্তু তারা তা অস্বীকার করেছে। মুহাম্মদের ধর্মই বিশ্বজনীন ধর্ম, বাকী সবই বিকৃতি।

কিন্তু ইতিহাস বলেনা যে প্রত্যেকটি জাতির কাছে আল্লাহ্‌র দূত উপস্থিত হয়েছিলেন। কিছু কিছু পাগল ভাবে সেই স্বাভাবিক মানুষ; অন্য সবাই পাগল--এই তুলনা আমি না দিয়ে পারছি না।

আমরা নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্ত নিতে পারি, সারা কোরানে একটাও বাক্য নেই যাতে অন্য ধর্মের মানুষদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য বা ধর্মীয় সহিষ্ণুতার জন্য কোনও বাণী আছে। সমস্ত পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে দেখা যাচ্ছে যে বাক্যগুলিকে সহিষ্ণুতার বাণী বলা হচ্ছে সেগুলি আসলে বলপূর্বক ইসলামায়নের বাণী।

তাছাড়া, আমরা যদি ধরেও নিই ঐ বাক্যগুলি সহিষ্ণুতার বাণী, তাহলেও সেগুলি ইসলামী আইন অনুসারে সহিষ্ণুতার বাণী হিসাবে নেওয়া যাবেনা। কারণ, বাতিলের নিয়ম অনুসারে যদি কোরানের দুটি বাক্য পরস্পর বিরোধী হয়, তাহলে পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হওয়া বাক্য পূর্ববর্তী বাক্যকে বাতিল করে। উল্লিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কিছু মক্কায় অবতীর্ণ, কিছু অবতীর্ণ মদিনায় প্রথম যুগে, যখন মুহাম্মদ তেমন শক্তি সঞ্চয় করেননি। যাই হোক, যদি সেগুলি সহিষ্ণুতার বাক্য হয়ও, পরে সেগুলি বাতিল হয়ে গেছে জেহাদী বাক্যগুলির দ্বারা। যেমনঃ *অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা (অনুতাপ) করে, যথাযথ নামাজ পড়ে ও জাকাত দেয় (দান করে) তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯/৫)।*

আমার মনে হয় পরিপ্রেক্ষিতটা আরও বৃহত্তর ভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন--শুধু বাক্য অবতীর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত চিন্তা না করে সাধারণ সমাজ-রাজনৈতিক ও মুহাম্মদের সমকালীন সামরিক

পরিপ্রেক্ষিত চিন্তা করার প্রয়োজন। প্রথমতঃ মুহাম্মদ নিজেই আক্রমণকারী--তিনি মক্কার ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তিনি নিজেই মক্কাবাসীদের বাণিজ্যবাহী উটের সারি আক্রমণ করেছেন, নির্বাসিত করেছেন ইহুদীদের, এবং তাদের এক গোষ্ঠিকে গণহত্যা করেছেন--কারণ, তারা তাঁকে পয়গম্বর বলে মানতে চায়নি। মুহাম্মদের উত্তরসুরীরা ব্যাপক আগ্রাসনের মাধ্যমেই ইসলামের প্রসারণ ঘটিয়েছেন।

এছাড়া ইসলামী মতে পরিপ্রেক্ষিতের বিচার শুধু অপ্রাসঙ্গিকই নয়, অপবিত্রকর। কারণ, কোরান আল্লাহ্‌র নিজের কথা। চিরন্তন সত্য। কোরানের কোনও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত নেই। কোনও রকম অস্পষ্টতা ও রহস্য নেই সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র বাণীর মধ্যে। কারণ, কোরানের বাণী শুধু আরবের মুসলমানদের জন্য নয়, সর্ব যুগের সমগ্র মানবজাতির জন্য। সেজন্য কোরান যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে থাকে, তবে সর্বযুগের সমস্ত মুসলমানদের কর্তব্য এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।

কোরানের পুনর্ব্যাখ্যাও সম্ভব নয়। কারণ, কোরানের বক্তব্য সুনির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে এবং তা সুনির্দিষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাবে মানুষকে বিধান দিচ্ছে। কোরান যেহেতু আল্লাহ্‌র শেষ বিধান, আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সমন্বিত করে তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। আল্লাহ্ যা বলেছেন তার বিপরীত করে কোরানের বাক্যের ব্যাখ্যা করা নিষ্ফল অকাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। নিঃসন্দেহে কিছু মুসলমান আছেন, যাঁরা পরমতসহিষ্ণু। কিন্তু তাঁরা কোরান সম্পর্কে যে পবিত্র মিথ্যার জল্পনা করছেন তা অন্য মুসলমানদের কোরান পড়া ও তার থেকে বিধর্মীদের প্রতি বলপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ করায় কোনও বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। পরমতসহিষ্ণু শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা যদি তাঁর শিশুদের বলেন কোরান আল্লাহ্‌র নিজস্ব বক্তব্য তবে তার ফল কী হবে সেটা বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাঁরা নিজেরা ব্যাখ্যা করতে পারেন যে ধর্মে কোনও জবরদস্তি নেই এবং কোরানের বল প্রয়োগের বাক্যগুলি অগ্রাহ্য করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের সন্তানরা যখন কোরান পড়বে তখন তারা যথার্থ আক্ষরিক অর্থে কোরান পড়ে দেখবে যে তাতে পরমতসহিষ্ণুতা বলতে কিছুই নেই। বহু ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পরমতসহিষ্ণু সুফি মরমীয়া।

অন্যদিকে বহু ইসলামপন্থীরা নিজেদের প্রতারণা না করে অমুসলমানদের প্রতারণা করে বলে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ইসলামী মূল্যবোধ। এইভাবে সন্ত্রাসের বাক্যগুলি গোপন করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন হয় ইসলাম তার যথার্থ মুখ দেখাতে প্রস্তুত নয়। তার একমাত্র প্রচেষ্টা কী করে নিজের ভয়াল রূপ গোপন করে সহিষ্ণুরূপ দেখানো যায়।

ইসলামের সেই মহান সংস্কৃতি!

"কিন্তু আপনি কি ইসলামের মহান সংস্কৃতিকে অস্বীকার করেছেন না? হারুন অল রশিদের ইসলামী সাম্রাজ্যে সংস্কৃতির প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছিল, যখন সম্রাট শার্লম্যান সবে লিখতে পড়তে শিখছিলেন। ইসলামী দার্শনিক আবিসেন্না ও আভারিওর কাছে ইউরোপ প্রভূতভাবে ঋণী। আর বীজগণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও আরবী সংখ্যা ইসলামী সংস্কৃতির অবদান"

উত্তর: শার্লম্যানের বহু আগেই ইউরোপ লিখতে পড়তে শিখেছিল। শার্লম্যানের এক হাজার বছর আগেই ইউরোপের লোকেরা রুনিক লিপি ব্যবহার করতো। তারও কয়েক শতাব্দী আগেই গ্রীকরা শিক্ষিত ছিল। বস্তুতঃ পক্ষে বলক্যান প্রদেশের নব-আবিস্কৃত এক শিলালিপি থেকে জানা যাচ্ছে তা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের। অর্থাৎ, তা সুমেরিয় সভ্যতা থেকেও প্রাচীন। ঠিক আছে, আপনি যদি ইউরোপের সবচেয়ে কম উন্নত অংশের সঙ্গে আব্বাসীয় খেলাফতের সবচেয়ে উন্নত অংশের সঙ্গে তুলনা করতে চান, তাহলে বলবো পরেরটি অবশ্যই বেশী সংস্কৃতিবান ছিল।

তবে মধ্যযুগের ইসলামী সাম্রাজ্যের সংস্কৃতির উন্নতির জন্য ইসলামের কোনও অবদান নেই।

পশ্চিম এসিয়াকে লিখতে পড়তে ইসলাম কোনও সাহায্য করেনি। ইসলামের অভ্যুদয়ের এক থেকে চার শতাব্দী আগেই মেসোপটেমিয়া, মিশর, গ্রীস, রোমের মানুষরা, এমনকি আরবের পৌত্তলিক--যাদের সংস্কৃতি মুহাম্মদ ধ্বংস করেছিলেন, তারাও শিক্ষিত ছিল। ইসলামী সংস্কৃতি বলে এখন যা প্রচারিত হচ্ছে তা আসলে ভারতীয় ও গ্রীক সংস্কৃতি মিশ্রিত পারসিক সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির মিশ্রণও ইসলামের অবদান নয়। ইসলামের অভ্যুদয়ের বহু আগে থাকতেই ভ্রমণরত বণিক ও ছাত্রদের দ্বারা এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে বহন পৃথিবী জুড়ে চলেছে। চলেছে সংস্কৃতির সংশ্লেষণও। ইসলামের অভ্যুদয়ের বহু আগেই গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা ভারতে বাহিত হয়ে এসেছে। চীনে আবিস্কৃত কম্পাস বা ভারতে আবিস্কৃত শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বদলে বাইজ্যান্টাইনীয় বা সাসানীয় সাম্রাজ্য থাকলেও আরবে চলে যেত।

আরবীয় সংখ্যা বলে এখন যা প্রচারিত তা আসলে ভারতীয়। আরবরা সেগুলিকে বলে হিন্দসা। এটা সত্য যে গ্রীস ও ভারত থেকে গ্রহণ করা গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা কিছু কিছু মুসলমান বিজ্ঞানীর দ্বারা বিকাশলাভ করেছিল। (যেমন অল-খাওয়ারিজমী, যার নামের সঙ্গে অ্যালগারিদম কথাটি যুক্ত)। কিন্তু এইসব বিজ্ঞানীরা ইসলাম দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি। আরবী চিকিৎসা বিদ্যা গ্রীক চিকিৎসা বিদ্যারই অনুবর্তন, ইউনানী টিব্ব নাম থেকেই তা স্পষ্ট। ইউনান কথাটির অর্থ গ্রীক। শব্দটি এসেছে আইওনিয়া শব্দ থেকে। এসিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলকে বলা হতো আইওনিয়া। ১৯২২ অব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চল গ্রীক অধ্যুসিত ছিল। ঐ সময়ে জেহাদ করে গ্রীকদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়।

আভ্যারিও বা ইবন রশিদ এবং আভিসেনা বা ইবন সেনার ইউরোপীয় দর্শনে প্রচুর অবদান আছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু এর মধ্যে ইসলামের কোনও অবদান নেই। কারণ তাঁরা শুধুমাত্র ইসলাম-পূর্ব যুক্তিবাদী এবং পরীক্ষাবাদী গ্রীক দর্শনের রক্ষণ ও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। এই ধরনের অ-ইসলামী চিন্তার জন্য তাঁরা দুজনেই ত্রাস ও বিতাড়নের সন্মুখীন হয়েছিলেন। দর্শনে তাঁদের অবদানের জন্য ইসলামের কোনও কৃতিত্ব নেই, বরঞ্চ ইসলাম তাঁদের বাধা দিয়েছিল। ইসলামে মুক্ত চিন্তার কোনও স্থান নেই। সংস্কৃতিতে ইসলামী প্রভাবের একমাত্র নজির নানারকম জ্যামিতিযুক্ত শিল্প। কারণ, মুসলমান শিল্পীদের শিল্প-বুভুক্ষা মেটাতে হয়েছিল নানা রকম প্রাণহীন আকার এঁকে বা নির্মাণ করে--ইসলামে কোনও প্রাণীর চিত্র আঁকা বা নির্মাণ করা নিষেধ। মুসলমানরা যে সমস্ত দেশ অধিকার করেছে সেইসব দেশের বৈজ্ঞানিক, প্রায়োগিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তাদের অবদান সামান্যই। কিন্তু তারা যা ধ্বংস করেছে তা অমুল্য। মহান পারসিক সংস্কৃতি থেকে শুধুমাত্র বস্তুগত সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। ধ্বংস করেছে সমস্ত অ-ইসলামী শিল্পদ্রব্য ও রচনাবলী। ইসলামপূর্ব ইতিহাস হয় নষ্ট করা হয়েছে, না হয় বিকৃত করা হয়েছে এবং রচনা করা হয়েছে মিথ্যা বংশতালিকা। আজও বহু দেশে ইতিহাস আরম্ভ হয় মুহাম্মদ থেকে--ইসলামপূর্ব সভ্যতাকে বর্ণনা করা হয় 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' বলে।

ভারতের ক্ষেত্রে ইসলামের সাংস্কৃতিক অবদান বলতে যা বলা হয় তা মিথ্যা। বিখ্যাত মুঘল চিত্রকলার জন্য ভারত অন্ততঃ ইসলামের কাছে ঋণী নয়। মনুষ্য বা জীবজন্তুর চিত্র আঁকা ইসলামে নিষিদ্ধ। এই বিখ্যাত চিত্রধারার জনক সম্রাট আকবর--তাঁকে সাধারণভাবে ধর্মদ্রোহী বলেই বর্ণনা করা হয়। এই ধারার চিত্রকররা ছিলেন হিন্দু আর এই ধারার মৃত্যু ঘটেছিল শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের দ্বারা।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছিল আকবরের রাজসভার সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারা, এটাও এক হাস্যকর দাবী। তবে আকবর উন্মাদ মোল্লাদের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষণা করেছিলেন,

এটা সত্য। হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের বহু গায়কই মুসলমান। তার কারণ, হিন্দু শিল্পীরাই পরবর্তীকালে মুসলমান হয়ে যায়। এই সমস্ত শিল্পীরা পাক্কা মুসলমান নয়। কারণ, হাদিশ অনুযায়ী পয়গম্বর মুহাম্মদ সঙ্গীত পছন্দ করতেন না। সঙ্গীতকে ইসলামে মোটেই ভাল চোখে দেখা হয়না।

ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে এমন কিছুই নেই যা ইসলামের আগমন না হলে সম্ভব হতো না। পরন্তু ইসলাম ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক কিছুই ধ্বংস করেছে, ইসলাম না এলে তা বেঁচে থাকতো।

কমিউনিস্টরা, ধর্মেতরবাদীরা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীরা

"আপনি কি কমিউনিস্টদের প্রতি অবিচার করছেন না? তাদের মধ্যে অনেকে নিষ্ঠভাবে সামাজিক অগ্রগতির জন্য কাজ করেন। ভারতে তাঁরা কোনও গণহত্যা করেন নি, কোনও ভারতীয় স্টালিন বা পল পট নেই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তাঁরা এক ধরনের সততার পরিচয় দেন।"

উত্তর : আমার পুস্তক সম্বন্ধে প্রথমেই বলে রাখি যদিও এর কিছু কিছু অংশ বিতর্কমূলক, তবুও এটি কোনও মানুষের বিরুদ্ধে লেখা নয়। লেখা কিছু তত্ত্বের বিরুদ্ধে। সময় সময় আমার বক্তব্য কিছু কিছু মানুষের বিরুদ্ধে হয়তো চলে গেছে, আমি তার জন্য দুঃখিত। আশা করি একদিন আমি নিজেকে এমনভাবে তৈরী করতে পারবো যখন মানুষ বাদ দিয়ে শুধু মাত্র নীতিকে আঘাত করতে পারবো, কারুকে দুঃখ না দিয়েই।

আমার ভারতীয় কমিউনিস্ট বন্ধুদের প্রসঙ্গে বলি, আমি জানি যে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সমাজের ও সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য সততার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বামপন্থী হিন্দী লেখক অধ্যাপক কাশীনাথ সিং এর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। এবং তাঁর সম্বন্ধে আমার ভাল ছাড়া মন্দ বলার কিছু নেই। কিছু কিছু মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবিদের আমি শ্রদ্ধা করি, যদিও তাঁদের রাজনৈতিক বক্তব্য আমি মানি না। কিন্তু এই পুস্তকের বিষয় ইতিহাসের বিকৃতিসাধন--এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট নেতাদের ভূমিকা প্রতিবাদযোগ্য এবং তা লঘু করার ব্যাপার নয়। এটা সত্য যে ভারতীয় কমিউনিস্টরা কোনও দিন বিপ্লবাত্মক সন্ত্রাসের পর্যায়ে পৌছায়নি। কিন্তু কমিউনিজম হচ্ছে ক্ষমতা দখল করার একটি পদ্ধতি যা বিশ্ব ইতিহাসে অভিনব। রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য কমিউনিজম সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কাজ করে এবং গোটা পরিকল্পনাটি কার্যকরী করে ধাপে ধাপে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়া শক্তির সঙ্গে দীর্ঘদিনের যুক্তফ্রন্ট গঠন করা এবং যাবতীয় আন্দোলন ও সংস্থার মধ্যে নিঃশব্দে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে দেওয়া। কমিউনিজমের শত্রুরা প্রলেতারীয় বিপ্লবের ফলে নিশ্চিহ্ন হবে--যে বিপ্লবের জন্য দীর্ঘদিন ধরে তাদেরই সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় কমিউনিস্টরা তাদের তত্ত্ব অনুযায়ীই কাজ করে চলেছে। তারা আপাতদৃষ্টিতে অন্য যে কোনও দলের মত গণতান্ত্রিক। কেরালার উচ্চ সাক্ষরতার মত কিছু কিছু কাজের জন্য আমি তাদের বাহবা দেব।

কিন্তু সেই দেশভাগের সময় থেকে ইসলামী সাম্রাজবাদীদের সঙ্গে তাদের জোটবন্ধন অস্বীকার করার ব্যাপার নয়। এটা একটা সুবিধাবাদী জোটবন্ধন, কারণ, তাদের মধ্যে এমন বিষয়ানুগ বিরোধ আছে যে তারা শেষ পর্যন্ত শত্রুতে পরিণত হয়। কমিউনিস্টরা ইসলামকে দমন করেছে, যদিও খ্রীষ্টধর্ম বা বৌদ্ধধর্মকে যত নিষ্ঠুরভাবে দমন করছে ততো নিষ্ঠুরভাবে নয়। ইরাণের ইসলামী সরকার কমিউনিস্টদের আগা গোড়া তাড়িত করে এসেছে। বিপরীতপক্ষে এই ইসলাম-কমিউনিস্ট সহযোগিতা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত লাভ করেছে। জার্মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কমিউনিস্ট এবং ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের সন্ত্রাসবাদে তালিম দিত। পালেস্টাইনের ব্যাপারে সোভিয়েট ও মুসলমানদের মধ্যে একটা অক্ষশক্তি তৈরী হয়েছিল। ভারতে এক হিন্দুত্ববিরোধী 'ধর্মেতরবাদী' ফ্রন্ট তৈরী হয়েছে। ভারতে ইসলামী মৌলবাদীরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে একজোট হয়ে ইসলামী দাবীগুলিকে 'ধর্মেতরবাদী'

বলে অভিক্ষেপিত করে। এটি হচ্ছে বিভিন্ন অভিজ্ঞার বিকৃতিসাধনের উদাহরণ, যা কমিউনিস্টরা হামেশাই করে থাকে। এখানে এটি ইসলামী সাম্রাজ্যবাদের সেবায় লাগছে।

ধর্মেতরবাদে কমিউনিস্টদের অবদান প্রসঙ্গে অবশ্যই বলতে হয় তারা রামজন্মভূমি প্রশ্নে ইসলামী বক্তব্য সমর্থন করে, সমর্থন করে মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির ও কাশী বিশ্বনাথ মন্দির মুসলমানদের দখলে রাখা, ভারতে বাঙলাদেশী অনুপ্রবেশের ও উর্দুকে বিশেষ সুবিধা দানেরও সমর্থক তারা। কিন্তু আমি স্বীকার করি কংগ্রেস ও জনতা দল যেখানে ইসলামী ঔদ্ধত্যের কাছে লজ্জাজনকভাবে আত্মসমর্পণ করে কমিউনিস্টরা সেখানে কিছুটা বিচার-বিবেচনার পরিচয় দেয়।

আমি আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করার জন্য দুজন প্রবীণ ধর্মেতরবাদীর বক্তব্যের তুলনা করবো। এঁদের মধ্যে একজন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র, অন্যজন সাংবাদিক-লেখক খুশবন্ত সিং। সেজন্য আমাদের শিখ সাম্প্রদায়িকতা নিয়েও আলোচনা করতে হবে, যা মোটেই আমাদের এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয় নয়, কিন্তু তা আমাদের ভারতবর্ষের ভন্ড ধর্মেতরবাদের চরিত্রটা প্রকট করে দিতে সমর্থ। শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদেরও নিজস্ব অপলাপবাদ আছে, যার উদ্দেশ্য ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে শিখ সম্প্রদায়ের পৃথক ধর্মীয় সত্তা সৃষ্টি করা।

১৯৯০ অব্দের প্রথম দিকে আমি একদা বিপান চন্দ্রের সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলেছিলাম, যখন ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার ব্যাপারে আমার নিজস্ব উপলব্ধি সৃষ্টি হচ্ছিল। তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে ভাল ধারণাই সৃষ্টি হয়েছিল, এবং আমার ধারণা তিনি তাঁর রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান। খুশবন্ত সিংএর সঙ্গে আমার কোনওদিন সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু তাঁর লেখা থেকে আমি ঐ ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। সাম্প্রদায়িকতার নানা মুখ পুস্তিকা থেকে দুজনের মধ্যকার পার্থক্যটি সহজেই ধরা পড়ে। ১৯৮৪ অব্দে দুজনের পঠিত নানা নিবন্ধের সংকলন পুস্তিকাটি।

বিপান চন্দ্র বলেন, "আমাদের বড় যুদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে।" কারণ, "ফ্যাসীবাদী শাসনের সত্যকারের ভয় সংখ্যালঘিষ্ঠদের সাম্প্রদায়িকতা থেকে নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাম্প্রদায়িকতা থেকে।" কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে পরিস্কার যে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা আছে: "শিখ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধ করতে হবে। কারণ এটা শুধু জাতীয়তাবিরোধী ও হিন্দুবিরোধী নয়, শিখ সাম্প্রদায়িকতার অর্থ শিখ ফ্যাসীবাদ। দ্বিতীয়তঃ সংখ্যালঘিষ্ঠদের সাম্প্রদায়িকতাকে যদি দমন করা না হয়, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাম্প্রদায়িকতাকে দমন করা অত্যন্ত কঠিন হবে....হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব হবে যদি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা হয়......শেষতঃ, আমরা যদি সংখ্যালঘিষ্ঠদের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নরম অবস্থান নিই তবে আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ করতে ব্যর্থ হবো।

"হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার" বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য যারা "মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা" কে তোল্লা দেন তাদের বিরুদ্ধে এই বিশ্লেষণ যথেষ্ট পরুষ।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে বিপান চন্দ্র ধর্মকে সাম্প্রদায়িকতার অবিসংবাদিত সূত্র বলে ধিক্কার দেননি। মার্ক্সবাদী হিসাবে তিনি ধর্মকে বাতিল করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ধর্মকে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সমীকৃত করেননি। এমনকি ধর্মীয় প্রতীককে সরকারী কাজে ব্যবহার করাকেও তিনি সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সমীকৃত করেন নি। যদিও তিনি এটাকে সঙ্গত মনে করেননি। বলেছেন, "এন. টি. রামারাও গেরুয়া পোষাক পরে সমস্ত ধর্মীয় চিহ্ন সমেত চৈতন্য রথে ঘুরে বেড়ালেন, এব্যাপারে আমি তার কঠোর সমালোচনা করেছি.....কিন্তু এটাকে আমি সাম্প্রদায়িকতা বলবো না।"

একটা থেকে অন্যটার পার্থক্য বিচার করার যে ক্ষমতা বিপান চন্দ্র প্রদর্শন করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত খুশবন্ত সিং এর বক্তৃতাগুলিতে। প্রথমেই লক্ষনীয় যে সর্দার অত্যন্ত ধর্মবিরোধী। বহু পুস্তক ও নিবন্ধে তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে ব্যঙ্গ ও ধিক্কৃত করেছেন। উই ইন্ডিয়ান্স বলে পর্যটকপাঠ্য একটি পুস্তকে তিনি লিখেছেন ধ্যান করার চেয়ে হুইস্কি খেয়ে নেশা করা ভাল। কারণ, ধ্যান করে মানসিক শান্তি আসে, এবং মানসিক শান্তি সৃষ্টিধর্মী মানুষের পক্ষে খারাপ। বিক্ষুব্ধ মন ছাড়া সৃষ্টিধর্মী কিছু করা সম্ভব নয়। ১৯৯১ অব্দে ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় 'ধর্মের ভবিষ্যৎ' বিষয়ে একটি নিবন্ধে দাবী করেছেন, সন্ন্যাস ও অন্যান্য উৎপাদনহীন ধর্মীয় আচারাদি বাতিল করতে হবে। প্রত্যেককেই যতদিন শারীরিকভাবে সমর্থ থাকবে, ততোদিন কাজ করতে হবে। ঐ নিবন্ধে তিনি দাবী করেছিলেন দুটি সন্তানের জন্মের পরে প্রত্যেককেই বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ্যাকরণ করার জন্যও : এটা যদি ফ্যাসীবাদ না হয় তবে এটা নিশ্চয় কোনও ধর্মীয় সমস্যা নয়। বস্তুতঃপক্ষে গোটা নিবন্ধটির মধ্যে কোনও ধর্মীয় বস্তু নেই। এর শীর্ষনাম হওয়া উচিত ছিলঃ আমি যদি স্বৈরাচারী শাসক হতাম তাহলে আমি কী কী করতাম।

সাম্প্রদায়িকতার নানা মুখ পুস্তকে সাম্প্রতিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ নিবন্ধে খুশবন্ত সিং আরম্ভটা ভাল করলেও সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন স্টালিনবাদীঃ শিশুদের গ্রহণক্ষম দিনগুলিতে আপনি তাদের মস্তিষ্ক ধোলাই করবেন না এবং তাদের সুস্থ চিন্তা করার ক্ষমতাকে নষ্ট করবেন না। সেজন্য আমি নিদান দিচ্ছি, বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা একেবারে বাতিল করতে হবে।" এখন ধর্মীয় শিক্ষা যদি মস্তিষ্ক ধোলাই হয়, এবং তা যদি মুক্তচিন্তায় বাধাস্বরূপ হয়, তাহলে নিশ্চয় তাকে বাধা দিতে হবে। তবে খুব কম করে বললেও বলতে হয়, এ হচ্ছে ধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত খারাপ ধারণা। ধর্ম যদি মানুষের আইনসঙ্গত আচরণ হয়, তবে শিশু ও কিশোরদের পক্ষেও তা প্রাসঙ্গিক। ধর্ম ব্যাপারটা কী তা তাদেরও জানা উচিত। তাছাড়া বয়সকালে মানুষ যা শেখে প্রাথমিকভাবে তার গোড়াপত্তন হয় শিশুকালেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ডিফারেন্সিয়াল ইকোয়েসন যুবকেরা শেখে তার গোড়াপত্তন হয়েছিল শিশুকালে যোগ ও গুণ শেখার মধ্যেই। ধর্ম যদি আইনতঃ বৈধ হয় তবে তা শেখা উচিত শিশুকালেই।

মস্তিষ্ক ধোলাই সম্পর্কে যদি কিছু অভিযোগ থাকে তা বিদ্যালয়ে ধর্মীয় পাঠের বিরুদ্ধে না গিয়ে বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর বর্তাবে। মানুষের নিয়তি নিয়ে বুদ্ধের বিশ্লেষণ বা শ্রীকৃষ্ণের হিন্দু দর্শনের ব্যাখ্যা নিরীক্ষা ও যুক্তিভিত্তিক। এগুলিকে ধর্ম না বলে দর্শন বলাই সঙ্গত। বিজ্ঞান যা নিয়ে চর্চা করে এগুলি তাই নিয়ে চর্চা না করলেও চর্চার পদ্ধতি বিজ্ঞান-চর্চার সমতুল। এইসব চর্চা অলৌকিক কিছু শেখায় না, শেখায় জীবনে সুখী হওয়ার পদ্ধতি। তুলনায় পয়গম্বরীয় একেশ্বরবাদ কিছু অপরীক্ষনীয় বিষয়ে বিশ্বাস দাবী করে। যেমন যীশু ঈশ্বরের পুত্র বা মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র শেষ দূত। খুশবন্ত সিংএর লেখার মধ্যে যুক্তিবাদী ও বিশ্বাসবাদী ধর্মের মধ্যে কোনও পার্থক্যের কথা বলা হয়নি, উল্টে তিনি গুলিয়ে ফেলেছেন ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধ্যানের মধ্যে।

খুশবন্ত সিংএর ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পার্থক্য বোঝার ক্ষমতাও নেই এবং তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ধর্মকেই বাতিল করতে চানঃ "আমি আকাশবাণী ও দূরদর্শনে ধর্মীয় বিষয় প্রচার বন্ধ করতাম। কীর্তন, শাবাদ, রামায়ণ, গীতা, মহাভারত এবং কোরান থেকে পাঠ করার জন্য এইসব মাধ্যমের প্রচুর সময় নষ্ট হয় এমন একটা দেশের,. যে দেশের সংবিধান একটা বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছে, এবং যে দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। দেশের পক্ষে এটা দুর্ভাগ্যজনক যে এমন সব নিষ্ফলা ব্যাপারে এতো সময় এবং শক্তির অপচয় ঘটে চলেছে।

খুশবন্ত সিংএর চিন্তাধারা এতই কুযুক্তিতে পরিপূর্ণ যে অন্যকে বিজ্ঞান মনস্ক করার জন্য যথাযথ যুক্তি দিতে তিনি ব্যর্থ। তিনি ধরে নিয়েছেন বিজ্ঞান মনস্কতার বিকাশের জন্য ধর্ম সমেত সবকিছু বাতিল করতে হবে। দেখা যাচ্ছে, তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে এতই অজ্ঞ যে জানেন না বহু বড় বড় বিজ্ঞানী ধার্মিক মানুষ ছিলেন (যদিও প্রথাগত ধর্মমন্ডলীতে অনেকেই বিশ্বাস করতেন না)। যেমন, কোপার্নিকাস, গালিলিও, কেপলার, নিউটন, আইনস্টাইন। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য তাদের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্ম বিন্দুমাত্র বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। সঙ্গীত ইত্যাদি বিনোদনও তাঁদের বিজ্ঞান প্রতিভাকে ম্লান করতে পারেনি। খুশবন্ত সিং তাঁর জীবনের বহু অমূল্য সময় হুইস্কি পান করে এবং অশ্লীল পুস্তকাদি পাঠ করে নষ্ট করেছেন। এইসব নিষ্ফলা ব্যাপারে এতো সময় ও অর্থ নষ্ট করা কী তাঁর উচিত হয়েছে?

পশ্চিমীরা যেভাবে ধর্মকে অযৌক্তিক বিশ্বাসের সঙ্গে একীভূত করে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে, খুশবন্ত সিং সেই একই কাজ করছেন ধর্মকে বিজ্ঞান বিরোধী ক্ষতিকর মস্তিষ্ক ধোলাই বলে বর্ণনা করে। ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষিত ভারতবাসীরা অন্য ধরনের মত পোষণ করে।সে কারণে একজন শিক্ষিত ভারতবাসী হিসাবে সর্দারজী ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে আলোচনা করার ব্যাপারে অনুপযুক্ত।

বিপান চন্দ্র সাম্প্রদায়িকতা ও রাষ্ট্রীয় কর্মে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করেছেন। খুশবন্ত সিং এসব কিছুই করেননি: "ধার্মিকতার অতিরিক্ত প্রদর্শন প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যা করা অনুচিত সে ব্যাপারে আমার বন্ধু জৈল সিং হচ্ছে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পার্লামেন্টে আমি তাঁর মুখের উপর বলেছিলাম, "শিখ মৌলবাদের আপনি হচ্ছেন গুরু...মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনি একটা ধর্ম-রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। প্রতিটি সরকারী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় একটি শিখ আচার দিয়ে...যারা শিখ নয় তারা কি ভাবে তা কী আপনি চিন্তা করেন?

ঘটনা হচ্ছে, শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদের সঙ্গে সরকারী অনুষ্ঠানে শিখ আচারের কোনও সম্বন্ধ নেই। খুশবন্ত সিং মনে করছেন অ-শিখরা এ ব্যাপারে আহত বোধ করে। আমার তা মনে হয়না। তা যদি হয়ও, এর সঙ্গে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদের উৎস শিখরাই-- অ-শিখরা নয়।

১৯৬৩ অব্দে খুশবন্ত সিংএর দুখন্ডে প্রকাশিত শিখদের ইতিহাসে তিনি নিজে ভারতের মধ্যে শিখদের জন্য পৃথক শিখ রাজ্যের দাবী তোলেন--যেদেশে শিখ সংস্কৃতি, শিখ লিপি ও ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে রাষ্ট্র। পরে বিভিন্ন নিবন্ধে তিনি একই অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ অব্দের পূর্ব পর্যন্ত শিখদের দাবী ছিল পাঞ্জাবী সুবা--পাঞ্জাবী ভাষীদের জন্য আলাদা রাজ্য, যে রাজ্যে শিখরা সংখ্যাগরিষ্ট হবে। ঐ সময়কার উদার শিখরা ছিল ধর্মেতরবাদী, কিন্তু খুশবন্ত সিং এটিকে অসৎ ছদ্মবেশ বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং খোলাখুলিভাবে পৃথক শিখ রাষ্ট্রের দাবী জানিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে অবশ্যই একা ছিলেন না তিনি। কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে এর সবথেকে সরব সমর্থক। যদি আমাদের কোনও তকমা দিতে হয়, তবে জৈল সিং নয়, খুশবন্ত সিংকেই দিতে হয় খালিস্তানের পিতৃত্বপদ।

পরে যখন খুশবন্ত সিংএর মানসসন্তান একটি সন্ত্রাসবাদী রূপ পরিগ্রহ করলো, তখন তিনি অবশ্য এটিকে ধিক্কার জানানোর মত শোভনতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ না তিনি শিখদের একটি পৃথক জাতি হিসাবে দেখিয়ে তাদের জন্য পৃথক রাজ্যের দাবী থেকে সরছেন, ততক্ষণ তিনি খালিস্থানের তাত্ত্বিক ভিত্তি জুগিয়ে চলছেন।

বিপান চন্দ্র দেখিয়েছেন বড় বড় 'সাম্প্রদায়িক' নেতারা ধার্মিক মানুষ ছিলেন না। জিন্না ছিলেন শূকরভোজী মদ্যপায়ী। সাভারকর ছিলেন নাস্তিক, যিনি তাঁর নীতির জন্য হিন্দু ধর্মের চেয়ে বেশী দ্বারস্থ ছিলেন পশ্চিমা জাতীয়তাবাদের নিকট। সেই একই কথা বলা যেতে পারে খুশবন্ত সিং সম্পর্কে। তিনি সর্বদা ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেন। কিন্তু সযত্নে ব্যবহার করেন পাগড়ী ও শিখধর্মের অন্যান্য চিহ্নগুলি।

উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতার নানা মুখ পুস্তকে খুশবন্ত সিং কিছু তথ্য উল্লেখ করেছেন যা শিখদের পৃথক জাতিত্বের দাবীকে নস্যাৎ করে। যেমন, "শিখধর্ম গুরু নানক এবং পরবর্তী নয়জন গুরুর পয়গম্বরত্বের উপর নির্ভরশীল। জৈন ধর্ম বা বুদ্ধধর্মের মত শিখধর্ম নিজস্ব কোনও ধর্মতত্ত্বের জন্ম দেয়নি। এই ধর্ম বৈষ্ণবীয় হিন্দুধর্মকে গ্রহণ করে তার উপর নতুন করে জোর দিয়েছে। গুরুদের শিক্ষা বেদান্তের উপরই। সুতরাং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যেভাবে হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে শিখধর্ম সেভাবে হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি। শিখধর্ম হিন্দু ধর্মের আচার-আচরণ, বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্ব, পুরুষার্থ, ধর্মপালনের উদ্দেশ্য, সংসার, জন্মমৃত্যুর তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে।"

গুরু নানক একজন পয়গম্বর, এটা এলোমেলো চিন্তার উদাহরণ। গুরু নানক বা দশ গুরুর কেউই কোনও দিন দাবী করেননি এমন কথা, যে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন গুরুরা একজন ব্যক্তিগত ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর বাণী বহন করে নিয়ে আসেন এবং তা বিতরণ করেন অন্যান্য কম শক্তিযুক্ত মানুষের কাছে। গুরু এবং পয়গম্বর দুটি পৃথক ধরনের ব্যক্তি, ভিন্ন ধরনের ধর্মের ব্যাপার। খুশবন্ত সিং এর ধর্ম সংক্রান্ত লেখালেখি এই ধরনের বিভ্রান্তিতে পূর্ণ। তিন শতাব্দীর 'শিখ ইতিহাস' একটি পৃথক ধর্মের জন্ম দিতে পারেনি। এই ধর্মের সাংগঠনিক বিশেষত্ব কিছু থাকতে পারে, হিন্দু ধর্মের অন্য উপাসক সম্প্রদায়েরও এ ধরনের কিছু কিছু ব্যাপার আছে। "কিন্তু যা স্মরণ রাখা দরকার এই ধরনের ব্যাপারের সঙ্গে, তা হলো এই নতুন সম্প্রদায়, খালসা পন্থ, হিন্দু সামাজিক ও ধর্মীয় তন্ত্রের এক অচ্ছেদ্য অংশ হয়েই রইলো। গুরু তেগবাহাদুরকে যখন দিল্লীতে ডেকে পাঠানো হলো তখন তিনি হিন্দু সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি হয়ে সেখানে গেলেন। ১৬৭৫ অব্দে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর এই আত্ম-বলিদানকে তাঁর পুত্র হিন্দু ধর্মের রক্ষার্থে বলেই বর্ণনা করলেন: "তাঁদের জাতিচিহ্ন এবং পবিত্র উপবীতকে রক্ষণের জন্য তিনি এই চরম আত্মউৎসর্গ করেছিলেন।" গুরু নিজে তাঁর সম্প্রদায়কে হিন্দু সমাজের অচ্ছেদ্য অংশ বলেই গ্রহণ করেছিলেন।

তিন শতাব্দীর শিখধর্মের সারাংশ বর্ণনা করে খুশবন্ত সিং লিখেছেন: "তারা বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে, যেমন নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আবদালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।" কিন্তু এই পর্যায়ে শিখদের সামরিক ক্রিয়াকর্মের মূল শত্রু যে ছিল ইসলাম, তা অস্বীকার করা হয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি অংশ হচ্ছে নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আবদালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। গুরু অর্জুন ও গুরু তেগবাহাদুরের আত্মউৎসর্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু গোপন করা হয়েছে হত্যাকারীদের পরিচয় ও হত্যার উদ্দেশ্য: তা হচ্ছে ইসলাম। শিখ সম্প্রদায় তাদের চির শত্রু মুসলমানদের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হতে চাইছে, সুতরাং গোপন রাখতে হবে এসব তথ্য!

শিখরা ইসলামী সাম্রাজ্যবাদীদের পরাস্ত করেছিল, এটা খুশবন্ত সিং এর কাছে দুঃখের ব্যাপার। কারণ, "শিখরা বিজয়ী হলো, আমরা পেলাম রণজিৎ সিংকে। আপনি মনে করতে পারেন অবশেষে আমরা একজন শিখ সম্রাট পেলাম এবং খালসাপন্থের দিন এলো। সেরকম কিছু ঘটলো না। ইতিহাসের অন্য বহু সম্রাটের চেয়ে রণজিৎ সিং বেশী ধর্মেতরবাদী বলে পরিগণিত হলেন। তিনি

শুধু ধর্মেতরবাদী নন, কুসংস্কারাচ্ছন্নও বটে। আদিম শিখধর্মের পরিবর্তে তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মকে গ্রহণ করলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করতে লাগলেন, নিষিদ্ধ করলেন গোবধ। গুরুদুয়ারা ও হিন্দু মন্দিরকে তিনি সমভাবে শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। তিনি কোহিনূর হীরা নিয়ে কী করলেন? তিনি সেটিকে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে না দিয়ে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে দিলেন। তিনি আফগানদের পরাস্ত করে কাশ্মীর দখল করে নেওয়ার পরে তাদের কাছ থেকে ফেরৎ চাইলেন সোমনাথের মন্দিরের সিংহদুয়ার। এইসব হিন্দু দাবী তাঁকে করতে কে বলেছিল? হিন্দুদের থেকে আমরা যতটা পৃথক হয়েছিলাম, এই সম্রাট তা চল্লিশ বছরে লগ্ন করে দিয়েছিলেন।

আপনি পছন্দ করুন আর নাই করুন, রণজিৎ সিংহ একজন হিন্দু নৃপতি ছিলেন। অন্যান্য বহু হিন্দু নৃপতির মত তিনি বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য করতেন না। তিনি ব্রাহ্মণদের সম্মান করতেন এবং গোরক্ষা করেছিলেন। আজ যদি রণজিৎ সিংহ ফিরে আসেন, তবে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বিচ্ছিন্নতাবাদের শত্রু বলে তাঁকে খুন করবে!

ব্রিটীশের পাঞ্জাব অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে শিখ সত্তা বিলীন হচ্ছিল তার বিবরণ দিয়েছেন খুশবন্ত সিং। এটা যে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার সেটা লক্ষ্য করেননি তিনি। শিখ সত্তা ধর্মীয় নয়, পরন্তু ক্রিয়াকান্ড ঘটিত এবং এটা বিলীন হলো যখন ঐ ব্রিটীশ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধরনের ক্রিয়া কান্ডের প্রাসঙ্গিকতা চলে গেল। কয়েক শতাব্দীর ইসলামী সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে কয়েক শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই হিন্দু সমাজের মধ্য থেকে শিখধর্মের জন্ম হয়েছিল। এখন ব্রিটীশ শাসন সেই যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছে। এটা স্বাভাবিক যে শিখ ধর্ম ধীরে ধীরে লোপ পাবে।

কিন্তু শিখধর্মকে বাঁচালেন সেই ইংরেজই। তাঁরা শিখ রেজিমেন্টের সৃষ্টি করলেন, যে রেজিমেন্টে যোগ দিতে হলে অবশ্যই চুল, দাড়ি, বালা সমেত খালসা হতেই হবে। প্রথমে হিন্দুদের কাছে এটা তেমন সমস্যাই হয়ে দাঁড়ায়নি। সেনাদলে যোগদানকামী হিন্দুরা স্রেফ চুল-দাড়ি কামানো বন্ধ করে দিত। এটা স্বাভাবিক, হিন্দুরা শিখ হওয়াকে ধর্মান্তর বলে মনে করতো না।

খুশবন্ত সিং স্বীকার করেছেন ইংরেজরাই শিখ সত্তাকে রক্ষা করেছে। এই সময়, ১৮৭০ নাগাদ হিন্দুরা এক মহাভুল করলো। স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ বেদোত্তর 'ব্রাহ্মণ্যবাদ' জাতিভেদ, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম, পৌত্তলিকতা বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে শিখধর্মেরও বিরোধিতা করলো।

খুশবন্ত সিং লিখেছেন, "....স্বামী দয়ানন্দ 'ভন্ড' অভিধা দিলেন গুরু নানককে।......স্বামী দয়ানন্দের আন্দোলনের বিপরীতে শিখরা স্থাপন করলো *সিংহ সভা,* পত্তন করলো *খালসা দিউয়ানের* পদ।...... নাভার কহান সিং প্রকাশ করলেন হম হিন্দু নহি নামক একটি পুস্তক।..... হিন্দু ধর্ম থেকে শিখদের তাড়ানোর কৃতিত্ব আর্য সমাজ দাবী করতে পারে।"

এরপর সিংজী বর্ণনা করেছেন কীভাবে দেশভাগ ও রাষ্ট্রের ধর্মেতরবাদী চরিত্র শিখদের দরিদ্র করে তুলেছে। পশ্চিম পাঞ্জাবে সমৃদ্ধ ক্ষেত-কামার ফেলে এ দেশে এসে শিখরা পেল কেবল মুসলমানদের ফেলে যাওয়া ছোটখাটো জমি--যা তাদের ক্ষতি কোনও ভাবেই পুরণ করতে পারলো না। "স্বাধীনতা হিন্দুদের দিল হিন্দুস্থান, মুসলমানদের দিল পাকিস্থান, আমরা কী পেলাম ? লবডঙ্কা! আমরা পেলাম দারিদ্র।"

সংশোধন: হিন্দুরা কোনও হিন্দুস্থান পায়নি, রাষ্ট্র হয়েছে ধর্মেতরবাদী। ১৯৪৭ সালে শিখদের দ্বিতীয় যে ক্ষতি হয়েছে তা হলো তাদের সংখ্যালঘু অভিধা বিলীন হয়েছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু হয়ে তারা নানারকম অন্যায় সুবিধা ভোগ করছিল, ধর্মেতরবাদী রাষ্ট্রে তা সম্ভব নয়।

এই সমস্ত তথ্য শিখদের সমস্যাকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু তাদের পৃথক ধর্মীয় সত্তা

প্রতিষ্ঠায় কোনও সাহায্য করতে পারে না। খুশবন্ত সিং বোঝাতে চেয়েছেন, শিখ বলে নিজেকে দাবী করার অর্থ ধর্মেতর সুবিধা লাভ: "নবীন প্রজন্ম বুঝতে চায়না কেন তারা দাড়ি রাখবে, যদি তারা এর থেকে কোনও রকম আর্থিক সুবিধা না পায়....একজন শিখ পিতাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, চুলদাড়ি রেখে আমার কী সুবিধা? তখন তিনি আর বলতে পারেনা না, রাখলে তুমি সেনা বাহিনীতে চাকরী পাবে।"

পরিস্থিতির বাস্তবতা কৃত্রিমভাবে শিখ জাতি তৈরীর পথে বাধা দিল। "খালসা আন্দোলনের বিদেশী খুঁটি তলিয়ে গেল। নেতারা বুঝলেন তাদের গোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং যে করেই হোক তাদের গোষ্ঠিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শিখ নেতারা বুঝলেন কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাই তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।" এখন খুশবন্ত সিং তাঁর শিখ ইতিহাস দিয়ে এই আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করলেন। দু বছর পরে পাঞ্জাবী সুবার দাবী স্বীকৃত হলো, এবং আমার ধারণা খুশবন্ত সিং নিজেও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এতে। তেমনই অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য অকালী নেতারাও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছিলেন আন্দোলন।

এসব ঘটনার দ্বারা এটা বোঝা গেল শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু তাতে পৃথক শিখ ধর্মের ব্যাপারটা খুশবন্ত সিং প্রমাণ করতে পারলেন না। প্রথমে তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন শিখরা পৃথক সম্প্রদায়। শিখদের পৃথক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আছে। "তৃতীয় গুরু অমর সিং নতুন আচার-অনুষ্ঠান, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের নতুন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রচলিত করলেন।" এখানে খুশবন্ত সিং গোপন করছেন যে মূল অনুষ্ঠানগুলি হিন্দুধর্ম অনুসারেই ছিল এবং বিবাহের পৃথক অনুষ্ঠান (আনন্দ বিবাহ আইন,১৯০৯) বিংশ শতাব্দীতে চালু হয় *হম হিন্দু নহী* আন্দোলনের অংশ হিসাবে।

ঠিক আছে, শিখদের কিছু আচার-অনুষ্ঠান পৃথক, যেমন আচার-অনুষ্ঠানের পার্থক্য আছে ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে, উত্তর আর দক্ষিণের হিন্দুদের মধ্যে। কিন্তু এতে পৃথক ধর্মত্ব প্রমাণ হয়না।

শিখদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ, পবিত্র নগর, মন্দির ও পুরোহিততন্ত্র আছে। তাতে কী? অনেক উপাসক সম্প্রদায়েরই এই ধরনের জিনিষ আছে। কাশী শৈবদের নগর, বৃন্দাবন বৈষ্ণবদের, অযোধ্যা রাম উপাসকদের--এরা সবই হিন্দুদের বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়। কবির, চৈতন্যদেব, রবিদাস প্রতিষ্ঠিত উপাসক সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ আছে। কিন্তু সেগুলিই তাদের একমাত্র গ্রন্থ নয়। গ্রন্থ সাহেবের মধ্যে অশিখ ভক্ত কবিদের রচনা আছে। আছে রাম, বেদ, ওঁ কার, অমৃত প্রভৃতি বহু হিন্দু ধারণার কথা। শিখেদের নামকরণ হিন্দু উপাদানে পূর্ণ--কৃষ্ণ ও তাঁর অন্যান্য নাম--হরকিষণ, হরগোবিন্দ; অর্জুন, বৈদিক দেবতা ইন্দ্র-যোগ-ইন্দর, সুর-ইন্দর, ইত্যাদি। অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের নাম হরিমন্দির। সুতরাং, বড় জোর বলা যেতে পারে শিখেরা বাকী হিন্দু সমাজ থেকে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দ্বারা পৃথকীকৃত একটি সম্প্রদায়--ধর্মের নিরিখে নয়। কিন্তু এইভাবে একবার পৃথকীকৃত হয়ে কিছু সুবিধা পেলে মানুষের মনে পৃথক হয়ে থাকার প্রবণতা থেকেই যায়। একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের সাধারণ একজন হওয়ার চেয়ে একটি ছোট সম্প্রদায়ের নেতা হওয়া গৌরবজনক। যাই হোক, একটি সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য হওয়ার দরুণ শিখরা বহুজনসমাজের ভারতবর্ষের অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ের একটি মাত্র। খুশবন্ত সিং প্রাণপণে প্রমাণ করতে চান যে শিখধর্ম একটি পৃথক একটি ধর্ম। অনেক উপাদানে দুটি ধর্ম এক হলেও তিনি মূল পার্থক্য নির্দেশ করতে চান এইভাবে: "শিখধর্মের বিদ্রোহ হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে। শিখধর্ম হিন্দু ধর্ম থেকে পৃথক দুটি নিরিখে--ঈশ্বরের

একত্ব ও নিরাকারত্বে। সেজন্য শিখধর্ম প্রতিমাপূজা ও জাতিভেদের বিরোধী। শিখধর্ম ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানুষের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী।" তিনি বললেন শিখধর্ম "একেশ্বরবাদী"।

আবার সেই এলো মেলো চিন্তা! ঈশ্বরের নিরাকারত্ব ও পিতৃত্ব দুটি বিপরীত ধারণা। যখনই ঈশ্বরকে পিতা বলা হলো তখনই তাঁকে আকার দেওয়া হলো। তখন তিনি আর পরম থাকলেন না। তাঁর সৃষ্ট প্রাণীদের সঙ্গে তাঁকে সম্বন্ধযুক্ত করা হলো। আর শিখ ধর্মকে আলাদা করে "একেশ্বরবাদী" তকমা দিয়ে তাকে সনাতনধর্ম মহাসঙ্ঘ থেকে কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন করে এক নব শিখ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা হলো--যে ধর্ম সনাতন ধর্ম থেকে পৃথক এবং পৃথিবীর অন্যান্য একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের পর্যায়ভুক্ত।

এই হচ্ছে ধর্মেতরবাদী খুশবন্ত সিং ব্যাখ্যাত শিখ ইতিহাস!

কোনরাড এলস্টের জন্ম ১৯৫৯ অব্দের ৭ ই আগস্ট, বেলজিয়ামের লুভেনে, একটি ওলন্দাজভাষী ক্যাথলিক পরিবারে। শিক্ষা-দীক্ষা লুভেনের ক্যাথলিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, দর্শন, চীনা ও ইন্দো-ইরাণীয় বিষয়ে। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যাবলী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি রচনা করেন অযোধ্যা বিতর্ক বিষয়ে তাঁর প্রথম পুস্তকটি। এরপর বিভিন্ন বেলজিয়ান ও ভারতীয় পত্রিকায় কলম লিখতে থাকেন তিনি এবং পাশাপাশি ভারতে এসে এখানকার জাতি-ধর্ম-রাজনীতি বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান আহরণ করেন। হিন্দু পুনর্জাগরণ বিষয়ে গবেষণা করে ১৯৯৮ অব্দে তিনি লুভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। বিভিন্ন ভারতীয় বিষয়ে তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ আছে এবং তাঁর রচিত পুস্তক তালিকা ক্রমবর্ধমান।